শিশুশিক্ষা

সম্পাদনা
আশিস খাস্তগীর

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৮২

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস
দি মুদ্রণী
১৮ মনুজেন্দ্র দত্ত রোড
কলকাতা ৭০০০২৮
এবং
সফটেক ডি টি পি সেন্টার
মধ্যমগ্রাম, কলকাতা ৭০০১২:

মুদ্রক
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

আমার প্রথম শিক্ষাগুরু
মা-কে

বিন্যাস সূচি

সংকেত সূচি

(বিস্তৃত পবিচয় ' নির্বাচিত গ্রন্থ্ পঞ্জি' অংশে প্রাপ্তব্য)

আকাদেমি	=	আকাদেমি পত্রিকা
ক.সা.বি.	=	করুণাসাগর বিদ্যাসাগর
পু.প্র	=	পুরাতন প্রসঙ্গ
বা.ন.ই	=	বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস
বা.সা.ই	=	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
বি.বা.স	=	বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ
রা.লা	=	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
স.কা.বি	=	সমকালে বিদ্যাসাগর
স.দ.	=	সমাচার দর্পণ
স.বা.চ.	=	সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান
স.সে.ক.	=	সংবাদপত্রে সেকালের কথা - ১,২
সা.বা.স.	=	সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র
সা.সা.চ.	=	সাহিত্য-সাধক চরিতমালা
স্মরণিকা	=	বেথুন স্কুল ও নারী শিক্ষার দেড়শো বছর
U.P.L.V.	=	Unpublished Letters of Vidyasagar

নি বে দ ন

উনিশ শতকের সূচনায় কলকাতার নানা অঞ্চলে ও সম্ভ্রান্ত গৃহে যে সব টোল-চতুষ্পাঠী ছিল, তাতে পড়ার অধিকার ছিল শুধু বালকদের, বালিকাদের নয়। কারণ সেকালের সমাজে প্রকাশ্যে স্ত্রীশিক্ষা ছিল কল্পনাতীত। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। টোল-পাঠশালার যুগ অস্তমিত হল। এল স্কুলের যুগ। প্রতিষ্ঠিত হল 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) ও 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৭)। শিক্ষার সর্বাত্মক সাফল্যের জন্য তাঁরা স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। শুরু হল 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি'র অধীনে কিছু কিছু স্কুলে মেয়েদের শিক্ষালাভ।

সে সময় স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে খ্রিস্টান মিশনারিরাও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যদিও তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাঙালি নারীর ধর্মান্তরকরণ। তবুও স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের ভূমিকাটি উপেক্ষণীয় নয়। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় কয়েকটি ফিমেল সোসাইটি। সেসব সোসাইটির পরিচালনায় স্থাপিত হতে থাকে বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৫০ এর শেষে স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশোর্ধ, ছাত্রীসংখ্যা ১৫০০ এর বেশি। তবে এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিক্ষা জনমানসে বিশেষ কোন সাড়া জাগাতে পারে নি।

স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের এই প্রয়াস ক্রমশ এক আন্দোলনের রূপ নিল। সে আন্দোলনে যোগ দিলেন উনিশ শতকের নব্য ভাবনার পথিক ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী। স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থনে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁদের অজস্র লেখালেখি চলতে থাকল। এর পাশাপাশি বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজেও স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ দেখা দিল। ১৮৪৭ সালে উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতে গৃহস্থ পরিবারের মেয়েদের জন্য একটি স্কুল স্থাপিত হল। বেথুন নাকি এই স্কুল পরিদর্শনে এসে কলকাতায় অনুরূপ একটি স্কুল স্থাপনের অনুপ্রেরণা পান। সমাজের উচ্চবিত্ত রক্ষণশীল অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত এক শ্রেণীর মানুষ স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টাকে সোৎসাহ সমর্থন জানালেন, কিন্তু প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মহিলাদের গমনাগমন মেনে নিলেন না। বেথুনের পাশে এসে দাঁড়ালেন ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী। এছাড়া, সাহায্যের হাত যাঁরা প্রকৃত অর্থে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তিনি তাঁর দুই কন্যাকে বেথুনের স্কুলে ভর্তি করা, বিনা বেতনে ওই স্কুলে পড়ানো, স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থনে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করা - এ সবই করেছেন। এখানেই শেষ নয়। বেথুনের স্কুলের মেয়েদের জন্য লিখলেন পাঠ্যপুস্তক - 'শিশুশিক্ষা' সিরিজের প্রথম তিনটি ভাগ। অবশেষে ২১ জন ছাত্রী নিয়ে ১৮৪৯ এর ৭মে বেথুনের স্বপ্নের স্কুলের যাত্রা শুরু। নাম : 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'। বেথুনের স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঘটেছে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রকৃত সূত্রপাত। সে গৌরবের অন্যতম অংশীদার মদনমোহন তর্কালঙ্কার। মদনমোহন এবং 'শিশুশিক্ষা' সমার্থক দুটি শব্দ, যার ব্যাপ্তি আজও প্রসারিত।

একটি স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে সেকালে অসাধারণ জনপ্রিয়, স্কুলে স্কুলে অবশ্যপাঠ্য এই সিরিজের সার্ধশতবর্ষপূর্তির (১৮১৭) পর আমরা ফিরে দেখতে চাই তার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক গুরুত্বের দিক, অন্যান্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থের তুলনায় তার অভিনবত্ব এবং বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়ে'র সঙ্গে তুলনায় তার উদয়াচল ও অস্তাচলের দিক। এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে একবিংশ শতকের পাঠকের কাছে আমরা 'শিশুশিক্ষা'র প্রথম ভাগের ২য় সংস্করণ ও অবশিষ্ট দু'ভাগের প্রথম সংস্করণের অবিকল প্রতিরূপ কোনরকম সম্পাদনা ব্যতিরেকে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছি। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে মদনমোহন-জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ রচিত মদনমোহনের জীবনী, প্রত্যুত্তরে লিখিত বিদ্যাসাগরের 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' এবং 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত মদনমোহনের প্রবন্ধ 'স্ত্রীশিক্ষা'।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের ফেলোশিপ নিয়ে কালিনগর মহাবিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে এই কাজটি করা হয়েছে। এ-জন্য উভয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যাঁর নিরন্তর পরামর্শ, সহযোগিতা ও বকুনি ছাড়া আমি এ-কাজে এক পা-ও এগোতে পারতাম না — তিনি আমার শিক্ষক ড. স্বপন বসু। তাঁকে প্রণাম জানাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালা ও ভবানী ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশ বিভাগে বারবার যেতে হয়েছে, তাঁরা হাসিমুখে সে অত্যাচার সহ্য করে সাহায্য করেছেন। এটা আমার বড় পাওনা। তাঁরা ধন্যবাদের ঊর্ধ্বে। বিশেষত, জরাজীর্ণ এবং ব্যবহারের অনুপযুক্ত বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ দেখতে যেভাবে শ্রীমতী নূপুর চক্রবর্তী ও শ্রীবিপুল দত্ত সাহায্য করেছেন, তার বোধহয় কোন তুলনাই হয়না। বইয়ে ব্যবহৃত আখ্যাপত্রের ফটোকপি জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে মুদ্রিত।

দুষ্প্রাপ্য বই দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীদীপককুমার বাগল ও ভারতী পুস্তকালয়ের শ্রীঅশোককুমার বারিক। তাঁদের নমস্কার জানাই। বৈজ্ঞানিক তথ্য যুগিয়েছেন অধ্যাপক-বন্ধু দিলীপকুমার পাত্র। ধন্যবাদের অপেক্ষা না করে বইটি প্রকাশে নিরন্তর আগ্রহ দেখিয়েছেন বন্ধুবর সোমেশ ভূঁঞা, চন্দন দত্তগুপ্ত। সাংসারিক কর্তব্য সামলে পাশে দাঁড়িয়েছেন শ্রীমতী কবিতা খাস্তগীর। তাঁর সঙ্গে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক নয়।

অক্ষর বিন্যাসের কাজে 'দি মুদ্রণী'র শান্তনু এবং 'সফটেক ডি. টি. পি. সেন্টারে'র বিশ্বজিত ও অভিজিত খুবই যত্ন নিয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ। আর, আমার মত অনামা অখ্যাত লেখকের বই প্রকাশ করতে এককথায় রাজি হয়েছেন শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা জানা নেই। প্রচ্ছদ এঁকে আমায় বাধিত করেছেন শিল্পী শ্রীসোমনাথ ঘোষ।

ভূমিকা

স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলন : সূচনা ও বিকাশ

'আমাদের বাল্যকালে, অর্থাৎ এখনকার ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে, বাংলায় নারী-সমাজে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না বলিলেই হয়। কলিকাতায় এবং মফস্বলের অনেক শহরে তখন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সকল বিদ্যালয়ে প্রকৃত লেখাপড়া কিছুই হইত না। বালিকাদের অক্ষর-পরিচয় হইত, কোন কোন বালিকা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ পর্য্যন্ত অঙ্ক কষিতে পারিত, কোনরূপে আঁকাবাঁকা অক্ষরে চিঠিপত্রও লিখিতে পারিত, ইহার অধিক আর কোন বালিকাকে অগ্রসর হইতে বড় দেখা যাইত না। সেই সকল বালিকার নিরক্ষরতা দূর হইত মাত্র, শিক্ষা কিছুই হইতে না। যে-সকল স্ত্রীলোক বাল্যকালে ঐরূপ নাম মাত্র শিক্ষা লাভ করিতেন, তাঁহারাই সেকালের নারীসমাজে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতেন। .... অনেকেই বাল্যকালে অধীত বিদ্যা বিবাহের পর বিস্মৃত হইত, মাত্র বর্ণপরিচয়টাই থাকিয়া যাইত। ....

সেকালে অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই জন্য স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়া শেখাটা অনাবশ্যক বিলাসিতা বলিয়া গণ্য ছিল। আবার অনেক বাটীতে পুরুষদিগের মন এত সঙ্কীর্ণ ও নীচ ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলেই পরপুরুষকে প্রেমপত্র লিখিবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। .... অথচ সেকালে যে-স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিতেন, অনেক সময় তাঁহার সমাদরও হইত। সমাদরটা বেশী হইত লিখন-পঠনে অনভিজ্ঞা সমবয়সী তরুণীদিগের মধ্যে। .... শিক্ষিতা মেয়েদের আর এক বিষয়েও সমাদর ছিল। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, কোন কোন বাড়ীতে মধ্যাহ্নে মহিলা-মজলিস বসিত, ... কোন কোন মজলিসে পুস্তক-পাঠও হইত। .... একটি স্ত্রীলোক পুস্তক পাঠ করিতেন, অন্য সকলে অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। ....

লেখাপড়ার চর্চ্চা না থাকাতে সেকালের মহিলা-সমাজ যে কিরূপ অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত ছিল, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। স্বদেশ, বিদেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণাই ছিল না। .... দৈনিক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ-সংক্রান্ত ব্যাপার ব্যতীত স্ত্রীলোকের আলোচ্য অন্য কোন ব্যাপার থাকিতে পারে, ইহা সেকালের নারীরা ধারণা করিতেই পারিতেন না। দেশের বা সমাজের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সভা-সমিতিতে যোগদান করা যে স্ত্রীলোকেরও উচিত, এরূপ কথা কেহ বলিলে লোকে তাহাকে পাগল বলিত।'

এই স্মৃতিচারণা করেছেন যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৬০)।[১] অংশটুকুর প্রকাশকাল ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ। তিনি যে সময়ের কথা বলেছেন (১৮৭০-৮০), সে সময়ের মধ্যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মহিলাদের জন্য বহু স্কুল স্থাপিত হয়েছে, সংবাদ-সাময়িকপত্রে বহু লেখালেখি চলেছে, সভা-সমিতি গঠিত হয়েছে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্যই। অথচ তার সুফল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ পায়নি।

প্রায় সমসাময়িককালে জন্মেছিলেন প্রমথ চৌধুরীর দিদি ও প্রিয়ম্বদা দেবীর মা প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯)। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় যা লিখেছেন একটু দেখা যাক — 'আমরা শৈশবে অনেক সময়ই বালক বেশে কাছারী বাড়ীতে সরকারের নিকট পড়িতে যাইতাম। পিতৃদেব ছুতার মিস্ত্রী দ্বারা বার স্বর ও ছত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ খোদিত করিয়া অক্ষর পরিচয় করাইয়াছিলেন। পাঠশালায় যাইবার রীতি ছিল না। গ্রাম্য কালীবাড়ীর স্কুলে গৃহের বালকগণ পড়িতে যাইত। আমরা কেবলমাত্র প্রাতে একবার তালপত্রে লেখা শিখিতাম ও দাতাকর্ণের উপাখ্যান প্রভৃতি পড়িতাম। তাহার পর সমস্ত সময় গৃহকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত। সর্ব্বাগ্রে শিব গড়ান ও দেবার্চ্চনার আয়োজন সব নির্ভুলভাবে শিখাইতেন। ক্রমে রন্ধন ও পরিবেশন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকার্য্যও শিক্ষা হইত।'

অথচ উনিশ শতকের সূচনাতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ সূচিত হয়েছিল বেশ কিছু মানুষের মনে। ১৮১৭ সালে স্থাপিত ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির আলোচনায় বিষয়টি উত্থাপিত হয়। সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক রাধাকান্ত দেব শুধু সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলেন না, সোসাইটির অধীনস্থ কোন কোন পাঠশালাতে বালকদের সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। এর পর তাঁর বাড়িতে স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের

সময় বালিকারাও উপস্থিত হত। কিছুদিন এভাবে চলার পর মেয়েদের পৃথকভাবে পড়ানোর চিন্তা শুরু হয়। ১৮১৯ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির পক্ষ থেকে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা দেখিয়ে একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়। এগিয়ে এলেন কয়েকজন ইংরেজ মহিলা। সে বছর রেভাঃ পিয়ার্সের সভাপতিত্বে তাঁরা গঠন করলেন 'ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি', যার পুরো নাম The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengali Female Schools। এই সোসাইটি প্রথম স্কুল স্থাপন করে কলকাতার গৌরীবাড়িতে। প্রথম বছরে ছাত্রী সংখ্যা মাত্র ৮ জন হলেও দু'বছরের মধ্যে তা বেড়ে হয় ৩২ জন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' থেকে জানতে পারি ততদিনে হিন্দু মুসলমান মিলিত ছাত্রী সংখ্যা ১৫০-য় দাঁড়িয়েছে। *'১৯ ডিসেম্বর দিবা দশ ঘন্টার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকারদের বিদ্যা পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে অনেক ২ সাহেব লোক ও বিবী লোক ছিলেন তাহারা বাঙ্গালি বালিকারদের পাঠ শ্রবণ করিয়া ও শিল্পকর্ম দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছেন .... । এই পরীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানের বালিকা সর্ব্ব সুদ্ধা প্রায় দেড় শত পরীক্ষা দিয়াছে।'* (স.সে.ক -১; পৃ. ১৪)

গৌরীবাড়ির পর এই সোসাইটি নন্দনবাগান, জানবাজার ও চিৎপুরে আরও তিনটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮২৩-এ স্কুলের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৮-এ। রাধাকান্ত দেব ছিলেন এঁদের প্রধান উৎসাহদাতা। ক্রমশ সোসাইটির কার্যপরিধি বাড়তে থাকে। ১৮২৯-এ মোট স্কুলের সংখ্যা হয় ২০টি। ততদিনে অবশ্য 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' পরিণত হয়েছে 'বেঙ্গল ক্রিশ্চান স্কুল সোসাইটি'র মহিলা বিভাগে। ১৮৩২ থেকে নতুন নামকরণ হয় 'ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি'। সোসাইটির স্কুলগুলি পড়ানোর বিষয়ে প্রশংসা অর্জন করে। এ কারণে আরও স্কুল স্থাপিত হয় বীরভূম, কাটোয়া ইত্যাদি অঞ্চলে। ইতিমধ্যে হুগলির শ্রীরামপুরেও খোলা হয়েছে বেশ কয়েকটি স্কুল। ১৮২৪ সালের 'সমাচার দর্পণ' খবর দিয়েছে — *'৫ এপ্রিল সোমবার দিবা দশ ঘন্টার সময় শহর শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর সম্মুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটীতে শ্রীরামপুরের ও তচ্চতুর্দিকস্থগ্রামের পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেকে আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তেরটা পাঠশালার সর্ব্বসুদ্ধা দুই শত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহারদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শব্দ পাঠ করিল ও পঁয়ত্রিশজন নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ২ পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করিল ও অবশিষ্ট বালিকারা ফলা বানান ইত্যাদি পড়িল।'* (স.সে.ক.-১; পৃ. ১৪)

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ও প্রসারে খ্রিস্টান মিশনারিদের বিপুল আগ্রহের পশ্চাতে সেকালের সাধারণ মানুষ স্বার্থের গন্ধ পেয়েছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্তরকরণের বিষয়টিও প্রসারিত হোক, এই ছিল মিশনারিদের একান্ত বাসনা। তাই উল্লিখিত মিশনারি সোসাইটিগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি মিশনারি সোসাইটি স্কুল খোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও একজন ইংরেজ মহিলার নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি মিস মেরি আন কুক। ইংলন্ড থেকে British and Foreign School Society -র টাকায় এদেশে তিনি এসেছিলেন ১৮২১ সালের নভেম্বর মাসে। এতদিন স্ত্রীশিক্ষার পোষকতা করলেও রাধাকান্ত দেব কুকের আগমনকে সন্দেহের চোখেই দেখলেন। ১০.১২.১৮২১-এ স্কুল সোসাইটির পিয়ার্সকে সরাসরি আপত্তি জানিয়ে লিখলেন — *'they [the respectable Hindoos] may be all convinced of the utility of getting their female children taught at home in Bengalee, by their domestic school matters, as some families do, before such female children are married or arrived at the age of 9 or 10 years at [farthest]. For these reasons, I am humbly of opinion that we need not have a meeting to discuss on the subject of the Education of Hindoo females by [Miss] Cooke, who may render her services, if required, to the schools lately established by the Missionaries for the section of the poor [.......] of native females.'* (দ্র. বা.ন.ই., পৃ. ১৬৮)

কুক স্কুল সোসাইটির সাহায্য পেলেন না। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন চার্চ মিশনারি সোসাইটির সভ্যগণ। এই সোসাইটির সাহায্যে মিস কুক ঠনঠনিয়া, মির্জাপুর, প্রতিবেশী, শোভাবাজার, কৃষ্ণবাজার, শ্যামবাজার, মল্লিকবাজার ও কুমারটুলি এই ৮টি স্কুল স্থাপন করেন। মোট ছাত্রীসংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন 'অল্পদিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ১০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং ন্যূনাধিক ২২৭টি

বালিকা শিক্ষা করিতে লাগিল'। (রা.লা., পৃ. ১৭১) ড. স্বপন বসু জানিয়েছেন '১৮২৩-এ তাঁর পরিচালনাধীন স্কুলের সংখ্যা হয় ২২, ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০০।' (বা.ন.ই., পৃ. ১৬৮) ৮মার্চ, ১৮২৩-এর 'সমাচার দর্পণ' অবশ্য কিছুটা পৃথক সমাচার দিয়েছে — *'কলিকাতা জরনেলে ২৮ ফেব্রুআরি তারিখে পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এক পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিবরণ আছে যে মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকা পাঠশালা ছিল তাহাতে এগার পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমতঃ কয়েকদিন পর্য্যন্ত বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে পর বাঙ্গালি ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করে .... এখন পোনর পাঠশালাতে তিন শত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে'।* (স.সে.ক. - ১, পৃ. ১৪)

তথ্যগত পার্থক্য থাকলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য, মিস কুক স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন তাতে পাঠশালা ও ছাত্রী সংখ্যা দুই'ই বাড়ছিল। ১৮২৪ সালে চার্চ মিশনারি সোসাইটি লেডি আমহার্স্টকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক করে গঠন করলেন 'Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its vicinity" বা 'লেডিস সোসাইটি'। এই সোসাইটির হাতে অর্পিত হল স্কুলগুলি পরিচালনার ভার। এক বছরের মধ্যে স্কুল ও ছাত্রীসংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেল। এ সম্পর্কে সাময়িকপত্রের রিপোর্টটি দেখে নিই — *' In less than three years, 30 Native Female Schools have been formed, and between 5 and 600 girls are now under instruction in the different schools, supported by the Ladies Society for Native Female Education Several of these have made rapid progress in readig the Bible the first classes can all write and many of them can perform interesting specimens in needle-works.'* (দ্র. আকাদেমি -৮, স্বপন বসু, পৃ. ৪৪০)

কিছুদিনের মধ্যে সোসাইটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণে উদ্যোগ নিলেন। সরকার কোন সাহায্য দিলেন না। হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজা বৈদ্যনাথ রায়। ৩১,১২,১৮২৫-এর 'সমাচার দর্পণ' লিখছে — '২৩ *দিসেম্বর শুক্রবার কলিকাতার পুরানো গ্রিজার নিকট কলিকাতার পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে .... অনেক সাহেব লোক এবং শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ছিলেন। বালিকারা উত্তমরূপে পরীক্ষা দিয়াছে ....। পরীক্ষা হইলে পর শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ঐ পাঠশালার ব্যয়ের কারণ বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন তাহাতে সকলে তাঁহার দাতৃত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল .... ।'* (স.সে.ক.-১, পৃ.১৫)

শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন ' ইহাতেই প্রমাণ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন বিষয়ে মহিলাগণ এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' (রা.লা.,পৃ. ১৭২) রাজা বৈদ্যনাথের টাকা হেদুয়ার পুবদিকে সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল স্থাপনে ব্যয় হয়। স্কুলটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৮ মে ১৮২৬ তারিখে এবং ১ এপ্রিল ১৮২৮ তারিখে ৮৫টি (৫৮?) ছাত্রী নিয়ে তার যাত্রা শুরু। প্রথম অধ্যক্ষ মিসেস উইলসন (মিস কুক)। কিছুদিন পর (১৮.৬.১৮২৮) 'সমাচার দর্পণে' স্কুলটি সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেখানে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এত চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফলবতী হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। *'গত মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসপের বাটীতে এতদ্দেশীয় বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাসকরণ বিষয়ের বার্ষিক সম্ভ্রান্ত বিবি সাহেবেরদিগের এক সভা হইয়াছিল .... বিবি জেমেস সভাপতি হইয়া এই সমাচার পাঠ করিলেন যে সেনটেরেল নামে এক পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে এবং এইরূপ আর ২৯টা পাঠশালা যে প্রধান ২ স্থানে আছে ও তাহাতে যত পাঠক বিদ্যাভ্যাস করে তাহা ঐ সভাতে প্রস্তাব করিলেন ...... ঐ কালে একত্র এত সংভ্রান্ত বিবিরদিগের এই সভাতে দেখিয়া এবং ইহারদিগের এইরূপ বিদ্যা বৃদ্ধিকরণ চেষ্টাতে সকলে চমৎকৃত হইয়াছেন ইঁহারা এরূপ পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া এ বহু কালের পতিতা ভূমি চসিয়া বিদ্যারূপ বীজ নিক্ষেপ করিতেছেন কিন্তু ইহাতে শেষ কি ফল ফলিবে তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিতে পারি নাই।'* (স.সে.ক.-১, পৃ.১৬)

এই দু'বছরের মধ্যে কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকায় স্ত্রী-শিক্ষার আরও প্রসার ঘটেছে। ১৮.৭.১৮২৭-এ 'সমাচার দর্পণ' লিখেছে — *'বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষা হেতু যে সকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে*

তাহার তৃতীয় রিপোর্টেতে প্রকাশ পাইয়াছে যে এ সমুদায় বিষয়ে অতি শুভ দেখা যাইতেছে .... এক নূতন ইস্কুল টলিগঞ্জে ও অন্য ২ অন্য স্থানেও তিনটা খোলা গিয়াছে এই কলিকাতাস্থ তাবৎ পাঠশালার পাঠিকা প্রায় ৬০০ হইবেক এবং ইহার মধ্যে ৪০০ প্রতিদিন হাজির হইয়া পাঠ করিতেছে ও শেষ পরীক্ষাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে ইহারদিগের শিক্ষা অতি সৌন্দর্য্যরূপে হইতেছে পরন্তু ইহার মধ্যে এক অন্ধা বালিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছে ও শিক্ষাতে বড় নিপুণা হইয়াছে .... । বাঙ্গালিরা তাঁহারদিগের কন্যারদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত পাঠশালাতে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে বর্দ্ধমানে ১৪/১৫ বর্ষ বয়স্কা বালিকারা পাঠশালাতে পড়িতে আইসে।' (স.সে.ক.-১, পৃ.১৬)

'লেডিস সোসাইটি' দীর্ঘদিন জীবিত ছিল। ১৮৩৪ সালের অ্যাডামস্ রিপোর্টে কলকাতা ছাড়া শ্রীরামপুর বর্ধমান কালনা কাটোয়া কৃষ্ণনগর ঢাকা বাখরগঞ্জ চট্টগ্রাম মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ১৯টি মহিলা বিদ্যালয় ও প্রায় সাড়ে চারশো ছাত্রীর উল্লেখ রয়েছে। সেসব স্কুলের অনেকগুলিই 'লেডিস সোসাইটি' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া 'ক্যালকাটা লেডিস অ্যাসোসিয়েশন' (১৮২৫) নামে আর একটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, যারা এন্টালি, জানবাজার, বেনেটোলা, চাঁপাতলা ইত্যাদি স্থানে মেয়েদের স্কুল স্থাপন করেছিল। ১৮২৫ থেকে ১৮৩৪ পর্যন্ত সেসব স্কুল নাকি জীবিত ছিল।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের নামে যেভাবে একাধিক মিশনারি সোসাইটি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা বেশ চোখে পড়ার মত। শ্রীরামপুর মিশনও পিছিয়ে থাকেনি। কেরি মার্শম্যান-ওয়ার্ড গড়ে তুলেছিলেন 'The Serampore Native Female Education Society'। ১৮২৩ থেকে শুরু করে ১৮৫০ এ পৌঁছে ২৬ টি ডে স্কুল এবং ২৮টি বোর্ডিং স্কুলের মিলিত ছাত্রী সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়েছিল। এত করেও মিশনারিরা এদেশের সাধারণ মানুষের মন পাননি। কারণ, 'এই সকল বালিকা বিদ্যালয়ের অধিকাংশ খ্রীষ্ট্রীয় মহিলাদিগের স্থাপিত ও খ্রীষ্ট্রীয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের অঙ্গীভূত ছিল।'(রা.লা.পৃ. ১৭২) ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যটুকু তাঁরা গোপন করতেন না। স্কুলে স্কুলে বাইবেল ছিল অবশ্যপাঠ্য। স্কুলে আসার জন্যও নাকি নানারকম লোভ দেখানো হত। ফলে একদা যাঁরা ছিলেন তাঁদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, এখন তাঁরাই হয়ে উঠলেন প্রতিপক্ষ। সম্পন্ন ভদ্রঘরের মেয়েরা প্রকাশ্যে পড়তে আসত না। সেকারণে মিশনারিদের নজর ছিল সমাজের নিচুতলার দিকে। 'সমাচার দর্পণ'-এ ৩.৩.১৮৩৮ -এ এক পত্রলেখক জানান, '*........... দুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএকজন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোষিকের নিমিত্ত তাঁহারদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাঁহারদের ঐ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে।'* (স.সে.ক.-২ পৃ. ৯৯ তবুও বলা যায়, সমাজের সর্বস্তরে কার্যকর না হলেও মিশনারিদের প্রষ্টোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মিশনারি ও ধনী মানুষদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়াও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আরও কিছু গোষ্ঠীর অবদান অবশ্যউল্লেখ্য। উনিশ শতকে নবচিন্তার বাহক ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী ছিল স্ত্রীশিক্ষার সক্রিয় সমর্থক। মতিলাল শীল, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ প্রত্যেকেই 'পার্থেনন', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'এনকোয়েরার' এর পৃষ্ঠায় স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে লেখালেখি করছেন। শুধু লেখালেখিতে আটকে না থেকে এঁদের অনেকেই নিজেদের পরিবারে এই আদর্শকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হেয়ারের মৃত্যুর পর স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক উৎকৃষ্ট লেখার জন্য ১৮৪৪ সাল থেকে হেয়ার প্রাইজ বন্ড নামে একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা এঁরা করেন।

সমাজের শিক্ষিত মহলে তখন মহা-সোরগোল। একদিকে একদল মানুষ চাইছেন এগিয়ে যেতে, আর একদল রয়েছেন কূপমণ্ডূক হয়ে। দ্বিতীয় পক্ষের আর্তনাদ দেখা গেল 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর' ইত্যাদি পত্রিকায়। 'প্রভাকর'-এ ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন, '*.................. তবে কি সুদ্ধ স্কুল বুক সোসাইটীর গদ্য পদ্য রচিত পুস্তকের প্রমাণে হিন্দু বিশিষ্ট সন্তানেরা আপন কুলাঙ্গনাদিগের পাঠশালায় পাঠাইয়া যে বারাঙ্গনা করিবেন এমত যেন ভাইলোকেরা মনে করেন না যদি কোন ২ বাবুরা আপন ২ বিবিরদিগকে গুণবতী করণের নিমিত্তে গুরু মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন তথাপি সে সকল বাবুদিগেরও আমরা নিষেধ করি না বরঞ্চ আমরা এমত স্বীকার করি যে যে পাঠশালায় ঐ বিবিরা পাঠার্থে গমন করিবেন আমরাও রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে প্রতিদিন বারেক দুইবার যাইয়া গুণবতীদিগের গুণের পরীক্ষা লইব।'* (স.সে.ক.-২,পৃ.৯২)

প্রতিবাদ এল পাঠকের থেকে 'সমাচার দর্পণ'-এ— 'প্রভাকর প্রকাশক মহাশয়ও কোন প্রমাণ না দিয়া কেবল উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় কতকগুলিন বকিয়াছেন ....। ....উক্ত প্রকাশক লিখেন যে যে পাঠশালায় বিবীরা পড়িবেন তথায় তিনি রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে গুণপরীক্ষার্থ বারেক দুইবার গমন করিবেন। এ কেবল কামুকের উক্তির মত হইয়াছে ইহাতে কি উত্তর দেওয়া যায় কিন্তু এতদ্রূপ পরীক্ষা লওয়াতে শেষে তাঁহার প্রাণহারান আটক নাহি পরঞ্চ দর্পণপ্রকাশক প্রৌঢ়াস্ত্রীকে পাঠশালায় পাঠাইতে লিখেন নাই। যেপর্য্যন্ত বয়স্থা না হয় সেপর্য্যন্ত দোষসম্ভাবনা নাহি এপ্রযুক্ত পাঠশালায় পাঠাইতে লিখিয়াছেন প্রভাকরপ্রকাশক তাহা বুঝিতে না পারিয়া এমত ভ্রান্ত হইয়াছেন বুঝি যুবতী স্ত্রীরা পাঠশালায় যাইবেন ইহা ভাবিয়া মহা উল্লসিত হইয়াছেন কিন্তু এমত কুকর্ম্ম কেহ করিবেন না যে আপন যুবতীকে সাধারণ পাঠশালায় পাঠাইয়া প্রভাকরপ্রকাশকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণা করিবেন তবে যে এ দুরাশা সে তাঁহার আকাশতরু প্রসূনের ন্যায়।

অপর দর্পণপ্রকাশক এমত কুপরামর্শ কখন দেন নাহি যে কুলাঙ্গনাকে বারাঙ্গনা করা তবে যাহার অন্তঃকরণে যে ভাব সে সর্ব্বত্র সেই ভাব দেখিতে পায়। '

এরপর 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় যুক্তিবাদী লেখা দেখা যেতে লাগল স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে। ১৮৩৩-এর ৫ জানুয়ারি লেখা হল — *'এদেশের শাস্ত্রের শাসন কেবল স্ত্রীলোক আর শূদ্রের উপরই অধিক চলে.......। .... কি অন্যায় স্ত্রীলোকেরা কি একই নীচ যে তাহারা অন্ধকারে থাকিয়া পুরুষের দাসীবৃত্তি করিবেক আর শূদ্রেরাই বা কি পাপ করিয়াছিলেন যে তাঁহারাই শাস্ত্র পড়িতে পারিবেন না .... কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে অন্ধকারে রহিয়াছেন ইহা দূর হওনের কোন সুযোগ হঠাৎ দেখা যাইতেছে না কেননা পুরুষের ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা অন্তঃপুরের ভিতরে গৃহ মার্জনাদি কর্ম্মে আবৃত থাকেন সুতরাং জ্ঞানি লোকের সহিত আলাপাদিও হয় না এবং বর্ণ-পরিচয়ও নাই যে শাস্ত্র পড়িয়া মনের অন্ধকার ঘুচাইতে পারেন........ ঘাটের এবং নৌকায় গমনশীল দেশ বিদেশীয় পুরুষেরদের সাক্ষাতে গঙ্গায় সর্ব্বাঙ্গ দেখাইয়া যান গঙ্গাস্নানে যে শত সহস্র পুরুষের সাক্ষাতে স্ত্রীলোকেরা দর্শনাবগাহন করেন তাহাতে এতদ্দেশীয় পুরুষেরদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু বিদ্যাবতী হইতেই নানাপ্রকারে বিবাদী হন এবং এই অবিবেচনীয় ব্যবহারে স্ত্রীলোকেরদের দুঃখ স্মরণ করিতে আমরা খেদিত হই।'*(স.সে.ক. -২, পৃ. ৯৫-৯৭)

পরের বছর 'জ্ঞানান্বেষণে' রীতিমত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হল — *'.............এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের মনে অত্যন্ত ভ্রম চলিতেছে অদ্য পর্য্যন্ত সেই ভ্রম ভ্রম হয় নাই বোধ করিয়া আপনকার সম্বাদপত্রের দ্বারা আমি সকল শাস্ত্রিরদিগকে এইক্ষণে কহিতেছি যাহাতে স্পষ্ট অথবা অর্থাপত্তিক্রমে স্ত্রীরদের লিখন পঠনকরণ নিষেধ ছিল এমত এক বচন তাঁহারা যদি সমর্থ হন তবে তাবদ্ধর্ম্ম শাস্ত্রের কোন গ্রন্থ হইতে বাহির করুন।'* (স.সে.ক. -২, পৃ. ৯৭)

সংবাদ-সাময়িকপত্রে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বাদানুবাদ চলতেই থাকল। কেউ কেউ যুক্তি খুঁজতে থাকলেন এই বলে যে পুরুষের কাছে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা করা অসম্ভব। জনৈক কৈলাসচন্দ্র সেনের চিঠি বেরল 'সমাচার দর্পণ' - এ ১৮৩৮-এ। *'লেখক মহাশয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস না হওয়াতে আন্তরিক খেদিত আছেন। .... হায় কি অপূর্ব্ব কথা অঙ্গনারা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দেশের যে কিসে উপকার দর্শিত তাহা আমার বোধগম্য হয় না যেহেতুক স্ত্রীলোককে সর্ব্বশাস্ত্রেই অবিশ্বাসী ও খল কহিয়াছেন তাহার এক প্রমাণ। .... তিনি কি আশ্চর্য্য দেশহিতৈষী যে দেশের মঙ্গলার্থ স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস অসম্ভবও সম্ভবজ্ঞান করিয়াছেন। আর লেখেন স্ত্রীলোকেরা মূর্খ প্রযুক্তই ঘরেপরে বিবাদ জন্মাইয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ ঘটায়। .... অনেক জমীদারের ঘরে অতি বিদুষী ও বিজ্ঞা আছেন কিন্তু এইক্ষণে সেই সকল ঘরেই অধিকন্তু স্ত্রী বিবাদ উপস্থিতে ....। লেখক আরো লেখেন যে স্ত্রীরা বিদ্যা বুদ্ধিহীন প্রযুক্ত পুরুষেরা তাঁহারদের সংসর্গে সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। হায় লেখব কি গূঢ় কথা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি কি ইহা জানেন না যে স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী শাস্ত্রে কহে। .... উত্তম মধ্যম অধম সর্ব্বপ্রকার লোকেরই সম্ভ্রম স্ত্রীর ব্যবহারানুসারে সর্ব্ব লোকই বালিকারদিগকে স্নানে গমন ইত্যাদি আবশ্যক কর্ম্মে কখন একা ঘর হইতে বাহিরে যাইতে দেন না সর্ব্বদা সংগোপনে সাবধানে রাখেন। এ অবস্থাতে তাহারা কিরূপে নানা লোকের সহিত পদব্রজে পাঠশালায় গিয়া পাঠ করিবে এবং স্ত্রীরা বাহিরে গেলেই তদ্দৃষ্টে*

অশিষ্ট দুষ্ট পুরুষেরদের লোভ জন্মিয়া থাকে এবং সময়ানুসারে কোন কৌশলে ছলে কৌতুকীয় নানা কুবচনও বলিয়া থাকে। .... পাঠশালায় শিক্ষক পুরুষ ব্যতিরেকে স্ত্রী নিযুক্তা হয় না যেহেতু এতদ্দেশে স্ত্রী সুপণ্ডিতা প্রায় নাই.......... । পুরুষের মন অতিমত্ত এবং স্ত্রীরও তাদৃশ .... । অতএব পুরুষের নিকটে স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাস সর্ব্বপ্রকারেই অসম্ভব।' (স.সে.ক.-২, পৃ. ১০০-১০১)

পরের মাসেই 'সমাচার দর্পণে' এর প্রত্যুত্তর বেরল — *'বিচক্ষণ পত্রপ্রেরক (কৈলাসচন্দ্র সেন) লেখেন যে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যোপার্জনে বরং মন্দফলই জন্মে .... । অস্মদ্বিবেচনায় এই বোধ হইতেছে প্রথমতঃ স্থানে ২ পাঠশালা স্থাপন করত তাহাতে এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত শিক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিয়া এই অনুমতি করা যায় যে তাহাতে কেবল এতদ্দেশীয় সামান্য লোকের বালিকারা অর্থাৎ যাহারা স্বচ্ছন্দে বাহিরে গমনাগমন করিয়া থাকে তাহারদিগকে মাত্র শিক্ষা দেওয়া যায় ইহার তত্ত্বাবধারণার্থে কেবল ইংলণ্ডীয় বিবিরা নিযুক্তা থাকেন ঐ বালিকারা যাবৎ বয়স্থা না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত তাহারদিগকে ঐ বিদ্যালয়ে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় যেহেতুক বাল্যকালে কোনরূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাবনা নহে বরং জ্ঞানপ্রাপ্তির অপেক্ষা বটে.......... কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ঐ বালিকারা এই প্রকারে সুশিক্ষিতা হইলে তাহারাই ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়া তাহারদিগের পরিজনকে শিক্ষা দিতে সমর্থা হইবেক .... কিছুকাল এইরূপ হইলে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক সুশিক্ষিতা হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য অজ্ঞানরূপ ঘোর তিমিরাচ্ছন্না অবলারা প্রবোধচন্দ্রোদয়ে জ্ঞানালোকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক .... ।'* (স.সে.ক.-২, পৃ. ১০১-১০৩)

যা ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীর উদ্যোগ এবং মিশনারিদের প্রচেষ্টা, তা ধীরে ধীরে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ধারাবাহিক প্রচার ও শিক্ষিত চেতনার প্রসারের ফলে এক সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের রূপ নিল। এর পাশাপাশি স্মরণে রাখবো, কিছুদিন আগেই (জুলাই ১৮৩২) পাশ হয়েছে সতীদাহ নিরোধ আইন। তখন প্রবলতর হয়ে উঠেছে বিধবাবিবাহ আন্দোলন, অনেক সংগ্রামের পরিণতি ঘটে বেশ কিছুকাল পরে (জুলাই ১৮৫৬)। একই সঙ্গে চলছে কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন। যদিও সে আন্দোলনের সার্থক সমাপ্তি তখন ঘটেনি। নারীজাতির আর এক করুণ দিক বাল্যবিবাহ। সে সম্বন্ধেও তখন চেতনার উন্মেষ দেখা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, উনিশ শতকে নারীমুক্তির জন্য বাংলার শিক্ষিত সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছে এবং তার প্রভাব সমাজের নিচুতলা পর্যন্ত না পৌঁছলেও আন্দোলনের সত্যতা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

জনমত গঠনে ও আন্দোলন গড়ে তুলতে সংবাদ-সাময়িকপত্রের অবদান অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রেও তা-ই ঘটল। স্ত্রী শিক্ষার সুফল সম্বন্ধে লেখালেখি করা ও জনচেতনা জাগ্রত করতে এগিয়ে এল আরও কয়েকটি সংবাদ-সাময়িকপত্র। 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় (সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত) ১৮৪২ এর জুন- জুলাই সংখ্যায় লেখা হল — *'এদেশীয় পুরুষেরা সম্পূর্ণ বিদ্যাধিকারি, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে কি জন্য তাহাতে বঞ্চিত তাহার কোন কারণ প্রত্যক্ষ হয় না। ভাল, স্ত্রীগণের বিদ্যায় অধিকার যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় না হইত, তবে তিনি পশুদিগের জড়বুদ্ধির ন্যায় তাহারদিগের বুদ্ধিরও এ প্রকার নির্দ্দিষ্ট সীমা নির্ণয় করিয়া দিতেন, যে তাহা উল্লঙ্ঘন করা অসাধ্য হইত .... ।*

.... রমণীগণের জ্ঞানবিরহে দেশের কি অসঙখ্য অনিষ্ট ঘটিতেছে, দুষ্কর্ম্ম, কুব্যবহার এবং নির্লজ্জতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা সভা, পাঠশালা, প্রকাশ্য পত্র সংস্থাপন দ্বারা দেশের সুখ, সভ্যতা, সৎকর্ম্ম ও জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তে যত্ন করিতেছি, কিন্তু স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রতি অযত্ন সত্ত্বেও সে অভিপ্রায় কদাপি সুসম্পাদ্য নহে।' (সা.বা.স.-৩, পৃ. ২৪)

দু'এক মাস পরে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করে 'বিদ্যাদর্শন' লিখল — *'যাঁহারা মনে করেন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা হউক, ... তাঁহারা এই সমাচারে তুষ্ট হইবেন, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যার পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। .... কলিকাতা রাজধানীর মধ্যে এক মন্দির হইয়াছে এবং এতদ্দেশীয় বিদ্যাবতীরা সেই মন্দিরে গিয়া নারীগণকে শিক্ষাদান করিতেছেন। .... এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের চক্ষের কেবল আকারমাত্র ছিল, চক্ষুর্দ্দান হয় নাই .... । এইক্ষণে মূলবিদ্যায় বিদ্যাবতী হইয়া কুলবালারা অবলা পরিবাদ হইতে উত্তীর্ণা*

হইবেন, সংসারের কার্য্যসকল বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন, ইহাতে তাঁহারদিগের সৌভাগ্যের সীমা কি, দিবারাত্রি হস্তে পুস্তক থাকিবে, নির্জ্জনস্থানে একাকিনী বসিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন, এবং রাত্রিতে স্বামির সহিত কথোপকথনের জন্য দাসী প্রভৃতি স্ত্রীগণের নিকট যে উপন্যাস শিক্ষা করিতে হইত আর তাহা করিতে হইবেক না।' (সা.বা.স.-৩, পৃ.২৭)

দিন এগিয়ে চলল। নানা আলাপ আলোচনা, উদ্যোগ ইত্যাদির মধ্যে ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের মেয়েদের জন্য ১৮৪৭ সালে উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতে কালীকৃষ্ণ মিত্র, তাঁর ভাই বিখ্যাত ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্র ও 'ফার্স্ট বুক' রচয়িতা প্যারীচরণ সরকারের প্রচেষ্টায় একটি স্কুল স্থাপিত হল। (প্রসঙ্গটি মদনমোহনের জীবনীর প্রাসঙ্গিক সংযোজন অংশে বিশদ আলোচিত) এই স্কুলটি দেখতে এসেই বেথুন কলকাতায় একইরকম একটি স্কুল স্থাপনের প্রেরণা পান। সেই সদিচ্ছার সহযোগী হিসেবে পেলেন রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ মানুষকে। সুচিন্তিতভাবে উদ্বোধনের দিন (৭মে, ১৮৪৯) সমাজের রক্ষণশীল দলের নেতা রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, রাজা রাধাকান্ত দেব, আশুতোষ দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানানো হল না। এব ফল হল মারাত্মক। সামাজিকভাবে তো বটেই, রক্ষণশীল দলের মুখপত্রগুলিতেও ক্রমাগত বিষোদগার করা হতে থাকল। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ভবানীচরণ রীতিমত অশালীন উক্তি করে বসলেন। 'প্রভাকর'-এ তার উত্তর এল — *'চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় .... আমারদের পিতামহ তুল্য পূজ্য, ...। .... তাঁহার উক্তি "বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের শঙ্কা আছে, কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টি পথে পড়িলে অসৎ পুরুষেরা তাহারদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। ...... " হায়, বুড়া সম্পাদকের কি অপূর্ব্ব যুক্তি, এরূপ উক্তি কি প্রকারে করিলেন তাহা তিনিই কহিতে পারেন, পঞ্চম অবধি নবম বর্ষীয়া বালা, যাহারদিগের দৃষ্টিমাত্রেই অন্তঃকরণে স্নেহ, দয়া এবং বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়, পৃথিবীতে এমত কোন্ পাপাত্মা পুরুষ আছে যে তাহারদের দেখিয়া মদনানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বলের দ্বারা কৌমার হরণে উদ্যত হইবেক, ...। .... সে যাহা হউক, দাদা মহাশয় যে ভয় করেন তাহা মিথ্যা, অতএব বার্দ্ধক্যকালে সৎকর্ম্মসাধনে কেন আর বাধা দেন, স্থির রূপে বিবেচনা করিলে ইহাতে অনেক উপকার দেখিতে পাইবেন, এবং যদি না পান, তবে বলুন, আমরা চক্ষে ধরিয়া দেখাইব।'* (সা.বা.স.-২, পৃ. ৩১)

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর রাধাকান্ত দেব। ইতিহাস বলছে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সূচনাপর্বে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। শুধু সমর্থন নয়, সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি পিছুপা হননি। সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে তাঁর প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে (দ্র. স.সে.ক.-২, পৃ. ৪২৬)। অথচ এই রাজাই ভদ্র ঘরের মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ পছন্দ করেননি। তিনিই মিস কুকের সমর্থনে এগিয়ে আসেন নি। আবার, বেথুনের উদ্যোগকেও স্বাগত জানান নি। বরং যতদূর সম্ভব বিরোধিতাই করেছেন। প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' এবার তিনি আক্রমণের লক্ষ্য হলেন। *'ভূম্যধিকারী সভা যদ্দ্বারা এতদ্দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকের সমূহ প্রকার উপকার হইবেক অদ্যাপি তাহার বীজ বপন করিলেন না, অথচ চমৎকার এই যে, স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ে উৎসাহান্বিত সৎকর্ম্মকারি স্বজাতীয়দিগের জাতি মারিবার নিমিত্ত বিজাতীয় স্বভাব প্রকাশ করিতেছেন, অতএব যে দেশের সুকর্ম্মে বিরাগ কুকর্ম্মে অনুরাগ সে দেশের সুরাগ হওয়া অতি কঠিন।*

বাবু বাহাদুর মহাশয়ের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীবিদ্যা বিষয়কে উত্তম বলিয়া জানেন, বিশেষতঃ প্রধান রাজাটী বহুদিন পূর্ব্বেই স্কুল বুক সোসাইটি নামক সমাজে এ বিষয়ে আনন্দচিত্তে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে কি তিনি আপনার প্রকাশিত মতের অপহ্নব করিতে পারেন? ফলে বিচিত্র নহে, কর্ত্তাদিগের সকলি বিচিত্র, চমৎকার চরিত্র, সর্ব্ব বিষয়েই পবিত্র আছেন, কিছুতেই অপবিত্র হয়েন না, কিন্তু তাঁহারদের নিদ্রাভঙ্গ হয় না, এজন্যই ক্ষুব্ধ হইতে হয়।' (সা.বা.স.-২,পৃ. ৩৩)

'ধর্মসভা', 'ভূম্যধিকারী সভা', 'সমাচার চন্দ্রিকা' অর্থাৎ রক্ষণশীল গোষ্ঠী ভদ্র ঘরের মেয়েদের জন্য স্থাপিত বেথুনের স্কুলের বিরোধিতা করে যেমন আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন, তেমনি মৌনাবলম্বন করার জন্যও ব্রাহ্মসমাজের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। অথচ তাঁরা কখনই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নন। কিন্তু কি কারণে

তাঁরা অন্যান্য সংবাদপত্রের মত উচ্ছ্বসিত হলেন না, বা বিরোধিতাও করলেন না — সেটিই রহস্য। ২৪.৭.৪৯-এ 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখক সেই ক্ষোভের কথাটি ব্যক্ত করলেন : '.......... *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যাহাতে একাল পর্য্যন্ত কেবল নানাবিধ দেশহিতজনক জ্ঞানবর্ধক বিষয় প্রকটিত হইতেছে এবং দেশের কুরীতি সংশোধন ও সুরীতি সংস্থাপন যে পত্রের প্রধানাভিপ্রায় হইয়াছে এইক্ষণে সেই পত্রের কর্ম্মকর্ত্তারা এতন্মহদ্বিষয়ে এককালীন মৌনাবলম্বন করিলেন, ইহাতে সাধারণে বিবেচনা করিতে পারেন যে 'স্ত্রীশিক্ষা বিষয় তত্ত্ববোধিনী সভার অভিপ্রায় সিদ্ধ নহে' ব্রাহ্ম মহোদয়েরা এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট কর্ম্মসাধনে কি জন্য এইক্ষণে পরাঙমুখ হইলেন তাহা তাঁহারাই কহিতে পারেন, ...'।* (আকাদেমি-৮, স্বপন বসু, পৃ. ৪৪৪)

অনেক সাড়া জাগিয়ে, বহু বিরোধিতার মধ্যে বেথুনের স্কুল যাত্রা শুরু করলেও পথটি ছিল উপলবন্ধুর। কারণ সে সময় সমাজে প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন রক্ষণশীলরা যে বাধার সৃষ্টি করেছিল, তাতে সাধারণ মানুষের মনেও দ্বিধা দেখা দিল। ছাত্রীসংখ্যা কমতে লাগল। স্বয়ং বেথুনও চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, যদি পড়ুয়া ছাত্রীদের জন্য মাসিক ৫ টাকা বা ৬ টাকা করে বৃত্তির বন্দোবস্ত করা যায়, তবে হয়তো এই সমস্যার সমাধান করা যায়। মনের কথাটি লিখলেন লর্ড ডালহৌসিকে ২৯ মার্চ ১৮৫০-এ। *'Every kind of annoyance and persecution was set on foot to deter my friends from continuing to support the school ana with such success that at one time the number of enrolled pupils dwindled to seven, and on some occasion not more than three or four were present in the school. At ths time the question was agitated whether or not I should offer stipends to the girls who attened, as was done on the first establishment of some of the Government College and I was assured that I would offer 5 oı 6 rupees a month to each, I might count on immediately recruiting for the school to any extent that I might think desirable from Brahminical families of unquestioned caste and respectability.* (স্মরণিকা, পৃ. ৭০-৭১)

শুধু বেথুন নন, আরও কেউ কেউ কারণ খুঁজতে বসলেন কেন ভদ্র পরিবার থেকে আসা মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। একটা কারণ প্রকাশ্য স্থানে বিদ্যার্জনে অনীহা, দ্বিতীয় কারণ শিক্ষকের কাছে পড়ার ক্ষেত্রে সঙ্কোচ। শিক্ষকদের বদলে শিক্ষিকা নিয়োগ করলে সুফল ফলতে পারে বলে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় মত প্রকাশ করা হল ১৪.৫.১৮৫০-এ। *'আমাদের বোধহয় এ দেশের সর্ব্বসাধারণ ভদ্রলোকেরা যদিও বালিকাদিগের শিক্ষাদান বিষয়ে বিমত নহেন তথাপি প্রকাশ্য স্থানে বালিকা প্রেরণ করিতে অসম্মত আছেন এবং তাহা ভদ্র পরিবারের যোগ্য এমত জ্ঞান করেন না, ... অতএব আমরা অনুমান করি স্ত্রী বিদ্যালয়ে এক্ষণে যে প্রকারে বালিকাদের শিক্ষাদান হয় ইহার পরিবর্ত্তে ঐ বিদ্যালয় নর্ম্মেল স্কুল হইয়া তাহাতে কতকগুলি শিক্ষকা (শিক্ষিকা) প্রস্তুত করিলে যথার্থ ফল দর্শিতে পারে ও দেশের মধ্যম জাতীয় মধ্যম বৃত্তি স্ত্রী লোকেরা প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন তাদৃশ দোষ জ্ঞান করে না তাহারা অনায়াসে গিয়া উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া শেষে শিক্ষাদায়িনী হইতে পারিবেক এবং তাহাদের হইতে যে শিক্ষা হইবেক তাহা কেবল বালিকাদের প্রতি না হইয়া অন্তঃপুরস্থা যাবদীয় অবলাদেরও প্রতি অর্শিতে পারিবেক ......।'* (সা.বা.স-৩, পৃ. ৬৭)

ঈশ্বর গুপ্তের কথা বলি। যে মানুষটি রক্ষণশীলদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চড়া সুরে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করেছেন, এমনকি 'রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে প্রতিদিন বারেক দুইবার যাইয়া গুণবতীদিগের গুণের পরীক্ষা' নেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন, যিনি ছড়া কেটে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন – 'যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,/এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে;' সেই তিনিই নিজেকে আমূল পাল্টে ফেললেন। বেথুনের প্রয়াসকে স্বাগত তো জানালেনই, উপরন্তু বিরোধীদেরও সমালোচনা শুরু করলেন। 'সাংবাদ প্রভাকর' - এর সম্পাদকীয়তে দেখা দিলেন এক নতুন ঈশ্বর গুপ্ত। '.................... *আমরা স্থির নেত্রে পুরুষ জাতির বিদ্যাশিক্ষার বিবিধ উপায় অবলম্বন করত যেরূপ সুখানুভব করিতাম, স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার উপায়াভাব জন্য সেইরূপ দুঃখিত ছিলাম, কিন্তু মান্যবর মেং জে ই ডি বেথুন সাহেব আমারদিগের সেই দুঃখ নিবারণের জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি প্রথমতঃ আপনার অর্থব্যয় দ্বারা এই মহানগর কলিকাতা মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহার প্রারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় দলাদলি প্রিয় মহানুভব মহাশয়েরা তাহার*

উন্নতির প্রতি প্রতিবন্ধকতা করণে ত্রুটি করেন নাই, সংস্কৃত কালেজের বিচক্ষণ ইংরাজী শিক্ষক শ্রীযুত বাবু রসিকলাল সেন মহাশয় কথিত বিদ্যালয়ে বালিকা প্রেরণ করাতে যোড়াসাঁকো নিবাসী সিংহমহাশয়েরা আপনাদিগের দলে তাঁহার নিমন্ত্রণ রহিত করিয়াছিলেন। এই রূপ কতপ্রকার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না, কিন্তু সকলের সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করিয়া এইক্ষণে বেথুন সাহেবের স্ত্রী বিদ্যালয় যত উন্নত হইতেছে ততই আমরা হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি, ইহাতে ক্রোনিকেল সম্পাদক মহাশয় প্রতিকূলতা করাতে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলাম এবং তাঁহাকে নিতান্ত নিষ্ঠুর বোধ হইল, তিনি বিশিষ্টরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যে স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার অকর্ত্তব্য বলেন ইহাই আমারদিগের পরমাক্ষেপ।

.... ক্রোনিকেল সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষা হইলেই দেশের মঙ্গল দর্শে, স্ত্রীলোকের বিদ্যাতে কোন দেশই সুন্দর অবস্থায় স্থাপিত হয় নাই, ...। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি কি অবলাদিগকে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত রাখিয়া কেবল পুরুষদিগ্যে জ্ঞানালোক দেখাইবার অভিপ্রায় করেন? হায় । একি পক্ষপাত, কি অবিবেচনা? এ কি প্রকার অযৌক্তিক পাঠক মহাশয়েরাই ইহার বিচার করিবেন, ... । (সা.বা.স.-২, পৃ. ৪০)

আরও যেসব পত্র-পত্রিকা স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল তাদের বিস্তৃত পরিচয় ড. স্বপন বসু দিয়েছেন। (দ্র.বা.ন.ই., ২৮৮-২৯৯) শুধু পত্র পত্রিকা নয়, ১৮২২-এ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' লিখে বাংলা সাহিত্যেও স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, যার ধারাটি পরবর্তীকালে আরও বেগবান হয়। অবশ্য উল্লেখ্য তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' (১৮৫০), দ্বারকানাথ রায়ের 'স্ত্রী শিক্ষাবিধান' (১৮৫৭), রামসুন্দর রায়েব 'স্ত্রী ধর্ম বিধায়ক (১৮৫৯) ইত্যাদি। বেথুন যে-পথের সূচনা করলেন তাকে অনুসরণ করে সুখসাগরের মুন্সেফ কাশীশ্বর মিত্র ১৮৪৯ এর ১৬ আগস্ট ৬ জন ছাত্রী নিয়ে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন (দ্র. আকাদেমি ৮, স্বপন বসু, পৃ. ৪৪৪), রাজা রাধাকান্ত দেব শোভাবাজার রাজবাড়িতে মেয়েদের স্কুল স্থাপন করলেন। সেই স্কুলে সংস্কৃত কলেজের একজন ছাত্র মেয়েদের ইংরেজি বাংলা পড়াতেন। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তবপাড়ায় ১৮৪৯-এ স্কুল স্থাপনের যাবতীয় ব্যবস্থা করে ফেললেন। ধীরে ধীরে মহিলামহলে লেখা পড়ার আগ্রহ বাড়তে থাকে। বাড়ির পুরুষদেরও অসম্মতি দূর হতে থাকে। ফলে বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটতে শুরু করে। পরবর্তী ইতিহাস এখানে আলোচ্য নয়।

বাংলা প্রাইমার ও 'শিশুশিক্ষা'

উনিশ শতকের শিশুপাঠ্য বর্ণশিক্ষাগ্রন্থের বিশাল তালিকা (অন্তত ৪৫০টি) আমাদের সংগ্রহে এলেও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে বাংলা প্রাইমার রচনা করতে এদেশীয় মানুষ ১৮৩৫ সালের আগে এগিয়ে আসেন নি। বাংলা প্রাইমারের প্রথম নাম 'লিপিধারা'। ১৮১৬-তে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ১২ পৃষ্ঠার এই বইটি বার করেছিলেন। এর দু'বছর পর ১৮১৮ তে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে জেমস্ স্টুয়ার্ট প্রকাশ করেন 'বর্ণমালা'। বাঙালি তখনও নিজের ভাষার জন্য প্রাইমার রচনায় এগিয়ে আসে নি।

এর কারণ অবশ্য অন্যত্র। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় শিশুদের বাংলা ভাষা শেখার হাতেখড়ি হত পাঠশালায়। সেখানে 'ভয়ঙ্কর' গুরুমশাইদের কাছে মুখে মুখে চলত শুভঙ্করী আর্যা, চৌতিশা, নামতা শিক্ষা। উনিশ শতকের সূচনাও হয়েছিল একইরকমভাবে। বাঙালিও এই ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চায়নি। মাথা ঘামালেন মিশনারিরা। ওই শতকের গোড়া থেকেই মিশনারিরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে স্কুল স্থাপন করতে শুরু করেন। দশ-বারো বছরের মধ্যে বেশ কয়েকটি স্কুল তাঁরা স্থাপন করে ফেললেন। ১৮১৬-তে এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রকাশ করলেন Hints Relative to Native Education নামে এক প্রতিবেদন। পরের বছরই তাঁরা আরও শ'খানেক স্কুল স্থাপন করলেন। ছাত্র সংখ্যা ৭০০০-এর ওপর। ১৮২৩ সালের মধ্যে স্কুলের সংখ্যা ১৬০ ছাড়িয়ে গেল।

ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) ও 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮)। স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁদের উদ্যোগে স্টুয়ার্ট এদেশীয়দের জন্য ১৮১৮ -তে লিখলেন 'বর্ণমালা'। বইটির প্রথমে আছে বর্ণমালা, আর শেষে তিন সিলেবলযুক্ত শব্দ। বইটিকে ছাপার হরফে বাংলা বর্ণমালা শেখানোর সম্ভবত 'প্রথম প্রচেষ্টা' বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন। লঙ লিখেছেন, 'লিপিধারা' বইতে আকৃতি অনুসারে ধ্বনিগুলিকে সাজানো হয়েছিল। সে হিসেবে 'লিপিধারা' -কে বর্ণশিক্ষার প্রথম বই বলা যায়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বসু (স্ট্যানহোপ বা ইস্টার্নহোপ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা) লিখলেন 'শব্দসার'। বইটি দেখিনি। লঙ লিখেছেন এটি বর্ণমালা শেখার বই। তাহলে দেশীয় মানুষের রচিত বর্ণশিক্ষার এটিই প্রথম বই। স্কুলপাঠ্য হিসেবে স্টুয়ার্টের বইটি সম্ভবত খুব জনপ্রিয় হয়নি। ১৮২৫-এ ২য়, ১৮৪০-এ ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ছাপা হয়েছে মোট ৪০০০ কপি।

১৮৩৫ থেকে ১৮৩৯ - এই পাঁচ বছরে প্রকাশিত হয়েছে একটিমাত্র প্রাইমার। ১৮৩৫-এ শ্রীরামপুরের তমোহর প্রেস থেকে মিশনারিরা প্রকাশ করলেন ১ আনা দামের ২৪ পৃষ্ঠার একটি প্রাইমার। লঙ বলেছেন এটি পাঠযুক্ত বাংলা বর্ণশিক্ষার বই। ১৮৩৯-এ স্থাপিত হল হিন্দু কলেজ পাঠশালা এবং তার পরের বছর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। দুই পাঠশালাতেই সোসাইটির বর্ণমালা গৃহীত হয়নি। হিন্দু কলেজ পাঠশালাতে শিশুদের বর্ণশিক্ষার জন্য লেখা হল নতুন প্রাইমার। নাম 'শিশুসেবধি'। 'শিশুসেবধি' একটি সিরিজ। প্রথম লেখক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি প্রথম দুটি খণ্ড লিখেছেন। 'শিশুসেবধি'র মোট ক'টা খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে তা জানা যাচ্ছে না। আমরা ছ'টি 'শিশুসেবধি' দেখছি। ১৮৪০-এ প্রথম দুই ভাগ। এর পর 'শিশুসেবধি (বর্ণমালা১/৩)'-(১৮৪০?), 'শিশুসেবধি (বর্ণমালা-৩)'-(৫ম সংস্করণ-১৮৫০, সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র), 'শিশুসেবধি-বর্ণমালা ১ম ভাগ' (৯ম সং-১৮৫৪, ইস্টানহোপ যন্ত্র), 'শিশুসেবধি (বর্ণমালা-২)' (৮ম সং-১৮৫৩, ইস্টানহোপ যন্ত্র), 'শিশুসেবধি (বর্ণমালা১/২)' (১৮৫৫, জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র)। এই সিরিজের বর্ণমালা ১ (৯ম সং' ৫৪), বর্ণমালা-২ (৮ম সং' ৫৩) ও বর্ণমালা-৩ (৫ম সং' ৫০) - এর লেখক হিন্দু কলেজ পাঠশালার শিক্ষক ব্রাহ্ম ক্ষেত্রমোহন দত্ত।

তত্ত্ববোধিনী সভার পাঠশালার জন্য লিখিত হয়েছিল নতুন 'বর্ণমালা' (২ খণ্ড)। ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪০-এ। ২টি খণ্ড রচনার পিছনে অক্ষয়কুমার দত্তের উপস্থিতির সম্ভাবনা যথেষ্ট। কারণ ২০ বছর বয়সী অক্ষয়কুমার তখন ৮ টাকা বেতনে পাঠশালার শিক্ষক। মিশনারিদের প্রাইমার রচনার প্রয়াস তখনো অব্যাহত। ১৮৪১-এ ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানারুণোদয়'। বইটিতে ১৮টি 'পাঠ' আছে। প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনি ও পরে স্বরধ্বনি সাজানো। বিভিন্ন স্বরধ্বনি-কার (আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি) সহ উদাহরণ রয়েছে। ১৮৪৬-এ স্কুল বুক সোসাইটি নতুনভাবে বার করলেন 'বর্ণমালা'র ২টি খণ্ড। এর মধ্যে ১ম ভাগে বর্ণশিক্ষা ও ২য় ভাগে দ্রুতপাঠ। বর্ণমালা সজ্জায় এখানেও প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ,পরে স্বরবর্ণ। তারপর যুক্তাক্ষর ও তার উদাহরণ। স্কুলপাঠ্য হিসেবে এই বর্ণমালা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৩-র মধ্যে ১ম ভাগের ৭টি সংস্করণে মোট ৩৩৫০০ কপি ছাপা হয়। স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র সংখ্যাও বাড়ছিল। ফলে চাহিদাও তৈরি হতে শুরু করেছে।

উনিশ শতকে বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। সে বছর বেথুনের 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠার সময় যে ১৫ জন বাঙালি তাঁদের কন্যাদের পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত, বিদ্যাসাগরের সহপাঠী সহকর্মী ও বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার। শুধু তাই নয়, অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে সেই স্কুলে শিক্ষাদান করেছেন এবং ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্যগ্রন্থের অভাব পূরণ করতে লিখলেন বিখ্যাত 'শিশুশিক্ষা' সিরিজের প্রথম তিন ভাগ (১৮৪৯, ১৮৫০ ১৮৫০)। চতুর্থ ভাগ (বোধোদয়) লিখেছেন বিদ্যাসাগর, পঞ্চম ভাগ (নীতিবোধ) লিখেছেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে 'বোধোদয়' এবং 'নীতিবোধ' নিজস্ব নামে স্বীকৃতি পেলেও মদনমোহন-রচিত তিন খণ্ড 'শিশুশিক্ষা' নামেই রয়ে গেল। পাঁচটি ভাগের মধ্যে প্রথম দুটি ভাগ বর্ণশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত। শেষ তিন ভাগে রয়েছে দ্রুতপঠন।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'শিশুশিক্ষা' বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়। শুধু বালিকা বিদ্যালয় নয়, সকলের জন্যই

'শিশুশিক্ষা' আদর্শশিক্ষা হতে পেরেছিল। যথার্থ বলেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন — " 'শিশুশিক্ষা' বইটি যেন শিশুশিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে সহসা আধুনিকতার অরুণালোকে নিয়ে এল। ..... তিনি (মদনমোহন) মধ্যযুগীয় মানসিকতার অর্থাৎ চিরন্তন গতানুগতিকতার স্থলে আনলেন দেশকাল পাত্রবিচারে যুক্তিপ্রয়োগের আদর্শ। প্রথার বদলে বিচার, রীতির বদলে নীতি।" প্রচলিত প্রথা ভেঙে মদনমোহন প্রথমে স্বরধ্বনি ও পরে ব্যঞ্জনধ্বনি স্থাপন করেছেন। স্বরধ্বনির মধ্যে ' ং ' এবং ' ঃ ' অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্ভুক্ত ছিল ' ক্ষ '। দু'প্রকার ধ্বনিরই আকৃতিসাম্য অনুসারে সজ্জা আছে। প্রথম ভাগে রয়েছে অসংযুক্ত ধ্বনির উদাহরণ, দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত ধ্বনির উদাহরণ। প্রথম ভাগের অবিস্মরণীয় কবিতা আজও আমাদের মুখে মুখে ফেরে — 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।' আর ফেরে দুটি কলি — 'লেখাপড়া করে যেই।/গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।' ('গাড়ি' বানানটি লক্ষণীয়)। দ্বিতীয়ভাগের মুখবন্ধে মদনমোহন বলেছেন 'যে সকল সংযুক্ত বর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় একেবারে অপ্রচলিত এবং সংস্কৃত ভাষাতেও বিরলপ্রচার তৎসমুদায় শিশুগণের অনাবশ্যক অভ্যাস পরিশ্রম পরিহারার্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে।' বাংলা বর্ণমালার সজ্জাক্রম এবং সহজীকরণের পথিকৃৎ অবশ্যই মদনমোহন।

১৮৫০-১৮৫৪, এই পাঁচ বছরে বেশ কয়েকটি 'বর্ণমালা' প্রকাশিত হয়। অজ্ঞাতনামা এইসব লেখকের 'বর্ণমালা' ছাপা হয়েছে সত্যার্ণব প্রেস, কবিতা রত্নাকর যন্ত্র, চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্র, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, বিশপস্ কলেজ প্রেস থেকে। শেষ 'বর্ণমালা' আকারে বৃহৎ (২২৮ পৃ.)। এছাড়া বোমওয়েচ লিখেছেন 'ধ্বনিধারা' (১৮৫৩), জে.ইয়ুল লিখেছেন 'শিশুবোধোদয়' (১৮৫৪)। কিন্তু এই বইগুলি বিশেষত্ববর্জিত, গতানুগতিক।

১৮৪৯ যেমন বাংলা প্রাইমারের পালাবদলের সূচক, ১৮৫৫ সাল তেমন বাংলা প্রাইমারের আর একটি মাইলস্টোন। মদনমোহন বাংলা ধ্বনির সজ্জা ও উদাহরণের মধ্যে যে কাব্যরেশ ছড়িয়েছিলেন, তাকে বর্জন করে আরও নির্মেদ যুক্তিশীল ও সুঠাম গদ্যের ভঙ্গিতে দেখা দিল বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর ২টি খণ্ড। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' বহুল-আলোচিত। অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এটুকু বলা যায়, 'শিশুশিক্ষা' এবং 'বর্ণপরিচয়' পরবর্তীকালের বাংলা প্রাইমারের মান ও আদর্শ স্থির করে দিয়েছে। বিশেষত 'শিশুশিক্ষা'কে আরও পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করে বৈজ্ঞানিক কাঠামোয় বিদ্যাসাগর যেভাবে বাংলা বর্ণকে সংস্থাপন করেছেন, তাকে অতিক্রম করা আজও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

১৮৫৫-র পরবর্তী দশ বছরে অন্তত খান পঁচিশেক বাংলা প্রাইমারের আবির্ভাব ঘটেছে। এর মধ্যে অজ্ঞাতনামা লেখকের 'বর্ণমালা' আরও কয়েকটি। বেরিয়েছে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্র, কমলাসন যন্ত্র, সুধানিধি যন্ত্র থেকে। উল্লেখযোগ্য বই সাতকড়ি দত্তের 'প্রথম পাঠ' (১৮৬২ ? ৯ম সং ১৮৬৭) , 'দ্বিতীয় পাঠ' (১৮৬২), 'তৃতীয় পাঠ' (১৮৬২?, ৩য় সং ১৮৬৫)। ১৮৯০ সালের মধ্যে 'প্রথম পাঠে'র ৩২টি, 'দ্বিতীয় পাঠে'র ২৩টি, 'তৃতীয় পাঠে'র ২২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'প্রথম পাঠ' প্রত্যেক সংস্করণে ১০০০০ কপি, 'দ্বিতীয় পাঠ' ও 'তৃতীয় পাঠ' প্রত্যেক সংস্করণের ৬০০০ কপি ছাপা হত। সাতকড়ি দত্তের এই বইয়ের মুদ্রাকরের সংখ্যা অনেক। ১৮৬৯ পর্যন্ত এই তিন 'পাঠ' ছাপতেন স্ট্যানহোপ প্রেস, জি.পি রায় অ্যান্ড কোং, হিতৈষী প্রেস, হেয়ার প্রেস, গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস, জি.সি. বসু অ্যান্ড কোং প্রভৃতি। এমনকি সংস্কৃত প্রেস এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকেও এই তিনটি ভাগ ছাপা হয়েছে। বোঝা যায়, জনপ্রিয়তার বইটি বেশ কয়েব কদম এগিয়ে ছিল।

১৮৬৬-১৮৭০ এই পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রাইমারের তালিকায় আছে — গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বর্ণশিক্ষা' - ১/২ (১৮৬৭, হিতৈষী প্রেস), রামগতি ন্যায়রত্নের 'শিশুপাঠ' (১৮৬৮, বুধোদয় প্রেস), মথুরানাথ তর্করত্নের 'বর্ণবোধ' (১৮৬৯, প্রাকৃত প্রেস), মহঃ জুহুরুদ্দিনের 'জ্ঞানশিক্ষা' (১৮৬৯, সুলভ প্রেস), হারানচন্দ্র রাহার 'বর্ণবিজ্ঞান' ১/২ (১৮৭০, সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেস) ইত্যাদি। এছাড়া হীরালাল মুখোপাধ্যায় ৩ ভাগে লিখেছেন 'বর্ণপরীক্ষা'। ১ম ভাগটি কিছুটা জনপ্রিয় ছিল। অন্যান্য লেখকরা হলেন শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ('শিশুপাঠ'), চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ('শিশুরঞ্জন' স্ট্যানহোপ প্রেস), রামগতি বসু চৌধুরী ('শিশুপাঠ-১' সুলভ প্রেস), অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ('শিশুরঞ্জিকা', সুলভ প্রেস), অমরনাথ সরকার

('শিশুপাঠ-১', সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেস), ভুবনমোহন ভট্টাচার্য ('বর্ণশিক্ষা, জে.জি. চ্যাটার্জি'স্ প্রেস) ইত্যাদি।

১৮৭১-১৮৭৫, এই পাঁচ বছরে গতানুগতিকতার পুনরাবর্তন। প্রায় ৫০টির মত প্রাইমার প্রকাশিত হয়েছে, পুনর্মুদ্রিত হয়েছে গোটা ২৫টি। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তখন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়ছে। এরই মধ্যে এক শ্রেণীর লেখক ব্যবসা করার সুযোগে প্রাইমার লেখার কাজে নেমে পড়লেন। তাঁদের বইগুলি অবশ্য দুটি একটি সংস্করণের বেশি ছাপা হয়নি। তাঁরা কেউ মদনমোহন, কেউ বা বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। আবার কোন কোন লেখক মধ্যপন্থী। কিছুটা মদনমোহন, কিছুটা বিদ্যাসাগর থেকে নিয়ে বই বার করে ফেললেন। সাধারণত প্রাইমারগুলি হত ১০ থেকে ৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে। কোন কোন লেখকের বই এ সময়ে দেখা গেল বেশ পৃথুলাকারে। যেমন, হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের 'বর্ণপরীক্ষা' (১৮৭৩, বিজয়রাজ প্রেস, ১০০ পৃ.), ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের 'নবশিশুবোধ' (১৮৭৪, জে.জি. চ্যাটার্জি'স্ প্রেস, ১২৪ পৃ.), বৈকুন্ঠনাথ সেনের 'দ্বিতীয় পাঠ' (১৮৭৪, ইস্টবেঙ্গল প্রেস, ১১৩ পৃ.), গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'পাঠশালার পাঠ্যপুস্তক' (১৮৭৪, হিতৈষী প্রেস, ২৫০ পৃ.), বৈকুন্ঠনাথ গোস্বামীর 'শিশুবোধ' (১৮৭৫, গুপ্ত প্রেস, ১৪৫ পৃ.) ইত্যাদি।

বিক্রির দিক থেকে তখন 'শিশুশিক্ষা'র ৩ ভাগ, 'বর্ণপরিচয়ে'র ২ ভাগের অপ্রতিহতগতি। দুটি বইয়ের ধারে কাছে কেউ নেই। ১৮৭৫-এর মধ্যে সংস্করণের হিসেব দেখলেই তা বোঝা যাবে। 'শিশুশিক্ষা-১'-র ৭১তম, 'শিশুশিক্ষা-২'-র ৪৮ তম, 'শিশুশিক্ষা-৩'-র ৪৫তম সংস্করণ ১৮৭৫- এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি 'বর্ণপরিচয়-১' ৫৮তম এবং 'বর্ণ পরিচয়-২' ৫৭তম সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৭১-১৮৭৫-এর মধ্যে 'শিশুশিক্ষা' ও 'বর্ণপরিচয়-২' ৫৭ তম সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। সেদিক থেকে অন্যান্য প্রাইমারের অগ্রগতি বেশ ম্রিয়মান। সাতকড়ি দত্তের 'প্রথম পাঠ' ও 'দ্বিতীয় পাঠ' বাদে একমাত্র চোখে পড়ে রামগতি ন্যায়রত্নের 'শিশুপাঠ'। ১৮৭৫-এ তার ৬ষ্ঠ সংস্করণ বেরিয়েছে। এসঙ্গে এক অজ্ঞাত লেখকের 'বঙ্গভাষার বর্ণমালা' বইটির কথাও উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৫ সালে জ্ঞানোল্লাস প্রেস থেকে তার ১৭তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

মুদ্রণসংখ্যার দিকেও 'শিশুশিক্ষা' ও 'বর্ণপরিচয়' অনেক এগিয়ে। ১৮৬৭-র পর থেকে 'শিশুশিক্ষা'র ৩ ভাগই ১০০০০ কপি করে এবং 'বর্ণপরিচয়' ২ভাগ ২০০০০ কপি করে ছাপানো হত। অন্যান্য প্রাইমারের মধ্যে ৫০০০ বা তার বেশি কপি ছাপানো হত এমন বই হল — রামগতি ন্যায়রত্নের 'শিশুপাঠ', বৈকুন্ঠনাথ সেনের 'প্রথম পাঠ' ও 'দ্বিতীয় পাঠ', ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের 'নব শিশুবোধ', শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বর্ণবোধ', এবং অজ্ঞাত লেখকের 'বঙ্গভাষার বর্ণমালা'।

এই সময়ের অন্যান্য কয়েকজন লেখকের বইয়ের নাম উল্লেখ করি। জগদ্বন্ধু মোদকের 'সরল পাঠ' (৩ ভাগ), নারায়ণপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'শিশুপাঠ' (৩ ভাগ), কুশদেব পালের 'প্রথম শিক্ষা' ও 'দ্বিতীয় শিক্ষা', যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননের 'শিশুপাঠ' (২ ভাগ), জগচ্চন্দ্র মজুমদারের 'শিশুবোধ' (৩ ভাগ) ও 'বর্ণবোধ' (২ ভাগ), দ্বারকানাথ রায়ের 'শিক্ষাবলী' (৩ ভাগ), শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বর্ণবোধ' (২ ভাগ), দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের (বিদ্যাসাগর-ভ্রাতা) 'অক্ষর পরিচয়' ইত্যাদি।

১৮৭৬-১৮৮০ — এই পাঁচ বছরের শিশুপাঠ্য বর্ণশিক্ষাগ্রন্থের ঢল নেমেছে। নতুন বই বেরিয়েছে প্রায় ৭০টি আর পুনর্মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা অন্তত ৭৫টি। উল্লেখ করার মত বই — অক্ষয়কুমার রায়ের 'বর্ণের পরিচয়' (২ ভাগ), উদয়কৃষ্ণ দত্তের 'নব শিশুপাঠ' (৩ ভাগ, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'নব শিশুশিক্ষা', মদনমোহন সরকারের 'বালকশিক্ষা' (২ ভাগ), যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা) 'শিক্ষাসোপান', রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীর 'নববর্ণ পরিচয়' (২ ভাগ), রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর 'অক্ষরশিক্ষা' (২ ভাগ), শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বর্ণবিবেক' (২ ভাগ), শ্রীনাথ কুণ্ডীর 'বর্ণরঞ্জন' ইত্যাদি। এর মধ্যে কয়েকটি বইয়ের একাধিক সংস্করণ ছাপা হয়েছে।

এই পাঁচ বছরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'গুপ্তপ্রেস বর্ণমালা' (দুর্গাচরণ গুপ্ত, ১৮৭৮)। আঙ্গিকগত দিক দিয়ে দুর্গাচরণ কিছু অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ৩ টি খণ্ডেরই প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এক একটি বর্ণ বিশাল বড় করে ছাপিয়েছিলেন। প্রথম ভাগে স্বরধ্বনি, দ্বিতীয় ভাগে ব্যঞ্জনধ্বনি এবং তৃতীয় ভাগে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি। বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান উইলিয়ম ললার প্রশংসা করে বলেছেন - *'........ a novel kind issued*

for the first time in Bengali.' দৃষ্টিশোভন করার চেষ্টা করেছেন উদয়কৃষ্ণ দত্ত তাঁর 'নবশিশুপাঠ-১' বইটিকে। ৯ পাই দামের মধ্যে রেখেও তিনি বইয়ে অনেক পশুপাখির ছবি দিয়েছেন। শিশুদের মনোরঞ্জন করার আয়োজনটি লক্ষণীয়। ১৮৭৯ সালে ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে বেরিয়েছিল 'শিক্ষাদর্পণ-১'। গোঁড়া খ্রিস্টান মিশনারিসুলভ চাকচিক্যহীন প্রাইমার থেকে বইটি বেশ আলাদা। শক্ত, দামি কাগজে ছাপা। শিশুদের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথম থেকেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে ছবিতে, রেখায় সজ্জায়।

বইয়ের ভূমিকা বা মুখবন্ধ থেকে লেখকের মানসিকতার আঁচ পাওয়া যায়। দু' একটি উদাহরণ দিই। ১৮৭৯-তে বেরিয়েছে অজ্ঞাত লেখকের 'প্রথম শিক্ষা'। মাত্র ৮ পাতার বই। ভূমিকায় লেখক বলেছেন যে, তাঁর লক্ষ্য হল শিশুদের শিক্ষার ব্যয়ভার কমানো। সাধারণত তাদের একটি বইয়ের অনেকগুলি করে কপি দরকার হয়। (শিশুরা তাড়াতাড়িতে বই ছিঁড়ে ফেলে, তাই)। প্রত্যেকটির দাম এক আনার কম নয়। এজন্য তিনি দাম রেখেছেন মাত্র তিন পাই (১ আনার এক চতুর্থাংশ)। একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে দ্বারকানাথ পালের 'শিশুশিক্ষা-১'। তিনি খতিয়ে দেখেছেন যে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতা অনুযায়ী একটাও প্রাইমার বাংলাদেশে নেই। বিশেষত পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে চলতি প্রাইমার সহজে পাওয়া যায় না। সেজন্য তিনি এই বই লিখতে উদ্যোগী হয়েছেন। আবার রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী (নববর্ণ পরিচয় - ১, ২) ও মদনমোহন সরকার (বালক শিক্ষা-১) স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁরা বিদ্যাসাগর-প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছেন। তবে রাখালচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত শুধু শব্দ দিয়ে উদাহরণ দেননি, বাক্যসহ উদাহরণও দিয়েছেন। আর মদনমোহন সরকারের বইয়ে বিদ্যাসাগর থেকে বেশি উদাহরণ রয়েছে। এ বিষয়ে মধ্যপন্থী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ)। তিনি 'শিক্ষাসোপান-১' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'শব্দলালিত্য, শব্দযোজনার কবিত্বে, ও রচনার মাধুর্য্যে শিশুশিক্ষাত্রয় অতুলনীয়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্য ও নিরবচ্ছিন্ন লালিত্যবশতঃ .... শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে ....। সেই অসুবিধা নিরাকরণমানসে পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় .... তর্কালঙ্কারের অতিমাধুর্য্য ও অতিলালিত্যদোষ পরিহার করিতে গিয়া তিনি তদীয় পুস্তকদ্বয়কে কিঞ্চিত নিরস করিয়া তুলিয়াছেন। .... স্বতন্ত্রভাবে দুয়েরই অসুবিধা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, ... এই উভয় দোষ পরিহারপূর্ব্বক উভয়ের দোষগুণ একত্র করিয়া, সরসে নিরসে মিশাইয়া 'শিক্ষাসোপানাবলী' বিরচিত করিয়াছি।' যোগেন্দ্রনাথও বইটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য বেশ কিছু জীবজন্তুর ছবি দিয়েছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বইটি ছাপা হয় তাঁরই প্রেস 'আর্য প্রেস' থাকে।

বিগত সব বছরের তুলনায় ১৮৮০-তে সর্বাধিক প্রাইমার ছাপা হয়েছে। নতুন এবং পুনর্মুদ্রণ। আমরা সব মিলিয়ে ৫০টির মত বইয়ের সন্ধান পেয়েছি। কেউ দাম সস্তা রেখে বাজার ধরার চেষ্টা করেছেন, আবার কেউ নতুন পথে হাঁটতে চেয়েছেন। চন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করেছেন - and therefore more or less erroneous.' এমন ভুলে ভরা অর্ধশিক্ষিত গ্রন্থকারের হাতে পড়ে বইয়ের দশা কেমন হয়, ১৮৭৮-এ গোঁসাইচন্দ্র দাসের 'অক্ষর পরিচয়' সম্বন্ধে উইলিয়ম ললারের ক্রুদ্ধ মন্তব্য পড়লেই তা বোঝা যায় — 'The author evently does not know Bengali; the lessons are ill chosen, the orthography is wrong, and the sentences are ill constructed. The work abounds in grammitical mistakes, and it is to be hoped that it will never be used in any vernacular school.'

বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে ১৮৮০ সালকে আরও একটি কারণে গুরুত্ব দেব। এ বছরই 'শিশুশিক্ষা-১' তার শততম সংস্করণ পার করেছে। বাংলা প্রাইমার হিসেবে 'শিশুশিক্ষা-১'- ই এই গৌরবের প্রথম অধিকারী। ওই বছর নভেম্বর মাসে প্রথম ভাগের ১০২তম, দ্বিতীয় ভাগের ৬১তম, তৃতীয় ভাগের ৬৫তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সমানতালে এগিয়ে এসেছে 'বর্ণ পরিচয়'। ডিসেম্বরে ১ম ভাগের ৯৪তম এবং নভেম্বর ২য় ভাগের ৯০তম সংস্করণ ছাপা হয়েছে। তখন 'শিশুশিক্ষা' ১০০০০ কপি এবং 'বর্ণ পরিচয়' ২০০০০ কপি করে ছাপা হচ্ছে।

বিগত দশ বছরে আর একটি প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছে। 'শিশুশিক্ষা' এবং 'বর্ণপরিচয়' চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করার পর ওই দুটি নাম ভাঙিয়ে বই বার করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। কখনও হুবহু নকল করে, কখনও বা আগে কোন শব্দ বসিয়ে বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে। এতে যে ব্যবসার সুবিধে হত তা লেখাই বাহুল্য। ১৮৭৪-

এ 'বর্ণপরিচয়-১' ও 'বর্ণ পরিচয়-২' লিখেছেন বেণীমাধব ভট্টাচার্য, ১৮৭৭-এ 'নবশিশুশিক্ষা'-র তিনটি ভাগ লিখেছেন উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৮৭৯-তে 'শিশুশিক্ষা' নামেই বই প্রকাশ করেছেন দ্বারকানাথ পাল, একই বছরে 'নববর্ণপরিচয়'-এর রচয়িতা রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী, ১৮৮০-তে 'বর্ণপরিচয়' ২ ভাগ লিখেছেন রামরূপ চট্টোপাধ্যায় এবং নফরচন্দ্র দত্ত।

'শিশুশিক্ষা'-র পরবর্তীকালে রচিত সমস্ত প্রাইমারের লেখকরা কয়েকটি ধ্বনি নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। দীর্ঘ ঋ-কার, দীর্ঘ ৯-কার, ং, ঃ, ৎ, ক্ষ, — এই ধ্বনিগুলি স্বরধ্বনি না ব্যঞ্জনধ্বনি কোন্ বর্গে গৃহীত হবে, লেখকরা তা ঠিক করে উঠতে পারেন নি। একদল দীর্ঘ-ঋ এবং দীর্ঘ-৯ স্বরধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অন্যদল তা করেন নি। আবার বেশ কিছু লেখক ং, ঃ, স্বরধ্বনিতে গণ্য করেছেন, কিছু লেখক তার বিপরীত করেছেন। 'ক্ষ' যুক্তাক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিয়ে টানাপোড়েন চলেছে। 'ৎ' ধ্বনি নিয়েও সমস্যা রয়েছে। তবে একটি বিষয়ে 'শিশুশিক্ষা'র আদর্শ সর্বমান্য হয়েছে। মদনমোহন প্রথম ভাগে অসংযুক্ত বর্ণ, দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত বর্ণ এবং তৃতীয় ভাগে দ্রুতপাঠের আয়োজন করেছিলেন। এই রীতিটি পরবর্তীকালে সকলেই অনুসরণ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ে 'শিশুশিক্ষা'র প্রভাবের কথা বলা দরকার। মদনমোহন প্রথম ভাগটি শেষ করেছিলেন একটি কবিতা দিয়ে — সে কথা সর্বজনজ্ঞাত। পরবর্তী গ্রন্থকারেরা এই রীতিও শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। কেউ লিখেছেন ভগবৎপ্রেমের কবিতা, কেউ বা নীতিশিক্ষামূলক কবিতা। কোন কোন লেখক আবার ছড়া লিখেও রীতি রক্ষা করেছেন। সাতকড়ি দত্তের মত লেখকও তাঁর প্রাইমারের শেষে একটি কবিতা লিখেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, 'শিশুবোধক' নামক বিখ্যাত প্রাইমারেও পরবর্তীকালে একটি কবিতা থাকত এবং সেই কবিতাটি লেখকনামহীন — 'প্রভাতবর্ণন (প্রথম কলি — 'পাখী সব করে রব ....')।

উনিশ শতকের প্রাইমারের চিত্রময়তার কথাও উল্লেখ করা দরকার। বাংলা প্রাইমার কবে থেকে সচিত্র হতে শুরু করল, তার বিবর্তনের রূপরেখাটি নিয়ে পৃথক আলোচনা হতে পারে। আমরা যতটুকু সন্ধান পেয়েছি তাতে দেখছি, সম্ভবত সাতকড়ি দত্ত এই সচিত্র-ভাবনার পথিকৃৎ। সে ষাটের দশকের কথা। এরপর একেবারে আশির দশকের সূচনায় উদয়কৃষ্ণ দত্তের 'নবশিশুপাঠ' - এ ছবির ব্যবহার আছে। ১৮৮০-র পর থেকে 'সচিত্র শব্দটি যোগ করে বই বেরোতে শুরু করে বহুল পরিমাণে।

উনিশ শতকে 'শিশুশিক্ষা' ও 'বর্ণপরিচয়'-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে দুটি বই ছাপানো হয়েছে তাদের কথা একটু বলি। বইদুটি হল 'শিশুবোধক' ও 'বাল্যশিক্ষা'। 'শিশুবোধক' প্রথম কবে প্রকাশিত হয়, কে রচয়িতা ছিলেন, তা বলা সম্ভব নয়। লঙ ১৮৫৪ সালের একটি সংস্করণের উল্লেখ করেছেন। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৮৩০ সালে প্রকাশিত বিশ্বনাথ তর্কবাগীশের লেখা 'শিশুবোধক'-এর উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী প্রকাশ ১৮৪৩ ও ১৮৫১। তবে এই সালগুলিই যে চূড়ান্ত, এমন ভাবার কারণ নেই। প্রবোধচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন ঃ 'মুকুন্দরামের পূর্বকাল থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা শিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা বিধৃত হয়েছিল শিশুবোধক বইটিতে। সে শিক্ষার মান যতই নিচু হক না তাতে সামগ্রিকভাবে একটি জাতীয়তার রূপ ছিল।' লঙও বইটিকে *'the Lindlay Murry of Bengali'* বলে বর্ণনা করেছেন।

মূলত গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত ও প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণকারী পদ্যাশ্রিত 'শিশুবোধক' যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বহমান জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে বাংলাদেশে তখন চিন্তা-ভাবনা ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হলেও গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা আটকে ছিল এক নির্দিষ্ট গণ্ডীতেই। 'শিশুবোধকে'র বিষয়সূচিতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া তেমন লাগে নি। শুধু যুক্ত হয়েছে ইংরেজি বর্ণমালা, মদনমোহনের 'প্রভাতবর্ণন'। এস. ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। এখানেও সেই একই 'ট্র্যাডিশন'। 'শিশুবোধক'-এর কোন 'লেখক' নেই, আছেন সম্পাদক। কেউই সংস্করণ সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাই কখন কততম সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, তা-ও বলা যাবে না। সম্পাদক হিসেবে নাম পাচ্ছি — উদয়রাম ঘোষ, নৃত্যলাল শীল, বিপিনবিহারী শীল, বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ, বিশ্বম্ভর লাহা, বেণীমাধব ভট্টাচার্য, রাধাবল্লভ শীল, রামচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির। যেসব প্রেসের নাম পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে আছে — কবিতা কৌমুদী, কবিতা রত্নাকর, কমলালয়, কমলাসন, কাব্যপ্রকাশ, চৈতন্য চন্দ্রোদয়, জেনারেল প্রিন্টিং, জ্ঞানোদয়,

জ্ঞানোদ্দীপক, জ্ঞানোল্লাস, নিউ বিডন, নিস্তারিণী, নৃত্যলাল শীল, বিদ্যারত্ন, বিন্দুবাসিনী, লক্ষ্মীবিলাস, শীল, শ্রীরামপুর, সার সঙ্গ্রহ, সুধানিধি, সুধার্ণব, সুধাসিন্ধু, হরিহর, হিন্দু প্রেস ইত্যাদি। সর্বনিম্ন দাম ৬ পাই, সর্বোচ্চ ১ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২১ থেকে শুরু করে ১২২ পর্যন্ত। ছাপানো হত ১০০০ থেকে ১০০০০ কপি পর্যন্ত। কয়েক বছরের মুদ্রণ সংখ্যা এরকম — ১৮৬৯ - ৫১,০০০, ১৮৭৫ - ৪৪,০০০, ১৮৭৬ - ২০,০০০, ১৮৭৮ - ৩৯,০০০, ১৮৭৯ - ৫০,০০০, ১৮৮০ - ৩১,০০০।

'শিশুবোধক'-এর মত আরেকটি জনপ্রিয় প্রাইমার 'বাল্যশিক্ষা'। প্রথম রচয়িতা রামসুন্দর বসাক। ১৮৭৭ সালের জুন মাসে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। ১ আনা ৬ পাই দামের 'বাল্যশিক্ষা' সুলভ প্রেস থেকে অনুমোদন পাবার পর সে অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই বইটি ছাপা হয়। এতে রয়েছে বর্ণমালা, অসংযুক্ত এবং যুক্তাক্ষরে শব্দগঠন, শব্দসহ উদাহরণ, গদ্যে-পদ্যে সহজ দ্রুতপাঠ, শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য বেশ কিছু ছবি। সমাপ্তিতে আছে বাংলা সন তারিখের হিসেব, নামতা ইত্যাদি। কিছুদিনের মধ্যেই বইটি কলকাতাতেও ছাপা হতে শুরু করে। ১৮৭৮-এর নভেম্বর মাসে নিউ স্কুল বুক প্রেস থেকে ৫ম সংস্করণের ৬০০০ কপি ছাপা হয়। ১৮৭৯-র জুনে ৭ম সংস্করণ ১০০০০ কপিতে পৌঁছায়। সুলভ প্রেস থেকে রামসুন্দরেব 'বাল্যশিক্ষা' কলকাতায় ছাপা হতে চলে এলে পূর্বতন প্রেস তারিণীচরণ বসুচৌধুরীকে দিয়ে লেখালেন আর একটি 'বাল্যশিক্ষা'। প্রকাশিত হল ১৮৭৯-র ডিসেম্বরে।

উনিশ শতকের প্রাইমারে বালকদের একাধিপত্য। 'শিশু' বলতে বালকদেরই বোঝানো হত। কখনো সখনো নামকরণে তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকত। 'বালকশিক্ষা' বা 'বালকবঞ্জন বর্ণমালা' তার উদাহরণ। স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত প্রথম প্রাইমার শিশুশিক্ষায়ও 'বালিকা' শব্দটি নির্দেশিত হয় নি। কিন্তু কয়েকটি বইয়ের নামই স্ত্রীশিক্ষার নির্দেশক। ১৮৬৩-তে অজ্ঞাত লেখকের 'বালিকা বান্ধব' বইটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' (ভূমিকা) লেখক বলেছেন ঃ 'ইতিমধ্যেই বালকগণের প্রথম পাঠোপযোগী অনেক পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু বালিকাগণের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। ...... যাহাতে সুকুমারমতি বালিকাগণের চিত্তক্ষেত্রে প্রথমাবস্থা হইতেই ধর্ম্মের বীজ রোপিত, পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্দীপিত এবং তাহাদের চিরপরিচিত কুসংস্কারসকল নিরাকৃত হয় তাহাও ইহার এক প্রধান লক্ষ্য।' বইটি বর্ণমালা দিয়ে শুরু। এরপর নীতিশিক্ষা। 'বালিকা' বা 'বালা' শব্দযুক্ত আরও কয়েকটি প্রাইমার হল — 'বালাবোধ-১' (অজ্ঞাত, ১৮৭৪, ১২ পৃষ্ঠা, ১০০০ কপি, গিরিশ প্রেস - ঢাকা), 'বালিকাশিক্ষা-১' (দ্বারকানাথ বসু, ১৮৭৯, ২৯ পৃষ্ঠা, ১০০০ কপি, বাল্মীকি প্রেস), 'বালিকারঞ্জন-১' (বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, ১৮৮০, ১৩ পৃষ্ঠা)। বালিকাদের জন্য প্রথম মহিলা প্রাইমার-রচয়িতা হলেন — প্রফুল্লকুমারী দাসী ('বালিকাবোধিকা-১', ১৮৭৭, সনাতন প্রেস)। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের পর আরও কয়েকজন মহিলার নাম পাওয়া যায়। এই সময়কালে একজন মুসলমান লেখক মহঃ জুহুরুদ্দিন 'জ্ঞানশিক্ষা-১' (১৮৬৯, ১২ পৃষ্ঠা, সুলভ প্রেস) নামে একটি প্রাইমার লিখেছেন।

প্রাইমারের কথা সাঙ্গ করি একটি পরিসংখ্যান দিয়ে। লঙ জানিয়েছেন 'শিশুশিক্ষা-১'-র ১০টি সংস্করণ প্রথম ৬ বছরে, ২য় ভাগের ৬টি সংস্করণ প্রথম ৪ বছরে এবং ৩য় ভাগের ৬টি সংস্করণ প্রথম ৫ বছরে মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮৫৭-তে 'শিশুশিক্ষা-১' ১৮শ, 'শিশুশিক্ষা-২' ১৬শ, 'শিশুশিক্ষা-৩' ১২শ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। আর, 'বর্ণ পরিচয়' ২ বছরেই অন্তত ৭টি সংস্করণ ছাপা হয়েছে। প্রথম ৯টি সংস্করণে 'বর্ণপরিচয়-১' ৫৮০০০ কপি বিক্রি হয়। তখন 'শিশুশিক্ষা'ও ১০০০০ কপি করে ছাপা হচ্ছে। অন্যান্য প্রাইমারের তুলনায় এই দুটি বইয়ের অগ্রগতি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

সাল	শিশুবোধক	শিশুশিক্ষা (৩ভাগ)	বর্ণপরিচয় (২ভাগ)	অন্যান্য	মোট
১৮৬৯	৫১,৫০০	৮০,০০০	১,৭০,০০০	২৭,০০০	৩,২৮,৫০০
১৮৭০	১৬,০০০	৮০,০০০	১,০০,০০০	৩০,৫০০	২,২৬,৫০০
১৮৭১	১৫,০০০	৯০,০০০	*৯০,০০০	৩০,০০০	২,২৫,০০০
১৮৭২	২০,০০০	৮০,০০০	*৮০,০০০	১৮,৫০০	১,৯৮,৫০০
১৮৭৩	৭,০০০	৭০,০০০	*৮০,০০০	৩৭,০০০	১,৯৪,০০০

সাল	শিশুবোধক	শিশুশিক্ষা (৩ভাগ)	বর্ণপরিচয় (২ভাগ)	অন্যান্য	মোট
১৮৭৪	২১,০০০	১,১০,০০০	১,০০,০০০	৬০,০০০	২,৯১,০০০
১৮৭৫	৪৩,৫০০	১,১০,০০০	১,৭০,০০০	৫৩,৩০০	৩,৭৬,৮০০
১৮৭৬	২০,০০০	১,১০,০০০	১,৮০,০০০	৪২,০০০	৩,৫২,০০০
১৮৭৭	২৭,০০০	১,২১,০০০	২,০০,০০০	৮৪,০০০	৪,৩২,০০০
১৮৭৮	৩৯,০০০	১,১০,০০০	১,৬০,০০০	৭৫,০০০	৩,৮৪,০০০
১৮৭৯	৪৯,৫০০	১,৪০,০০০	২,৩০,০০০	৯১,৫০০	৫,১১,০০০
১৮৮০	৩১,০০০	১,৫০,০০০	২,৩০,০০০	১,৭০,০০০	৫,৮১,০০০
মোট	৩,৪০,৫০০	১২,৫১,০০০	১৭,৯০,০০০	৭,১৮,৮০০	৪১,০০,৩০০

*পুরো হিসেব পাওয়া যায়নি

১২ বছরের এই হিসেব থেকে অগ্রণী তিনটি প্রাইমারের খতিয়ানটুকু স্পষ্ট।

‘শিশুশিক্ষা’ ও ‘বর্ণপরিচয়’

১৮৪৯ এবং ১৮৫৫। মাত্র ছ'বছরের ব্যবধান। এই ছ'বছরে ঘটে গেল বাংলা প্রাইমারে যুগান্তর। ১৮৪৯-এ মদনমোহন যখন ‘শিশুশিক্ষা’ রচনা করেন তখনও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্ব। ১৮৫৫-তে বিদ্যাসাগর ‘বর্ণপরিচয়’ লেখার সময় সে বন্ধুত্বে ফাটল ধরেছে। দু'জনের বাক্যালাপ বন্ধ, হয়ত মুখ দেখাদেখিও। (বিষয়টি বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে মদনমোহনের জীবনীর প্রাসঙ্গিক সংযোজন অংশে) এ কারণেই কি বিদ্যাসাগর ভিতরে ভিতরে তাগিদ অনুভব করেছিলেন নতুন একটা প্রাইমার লেখার জন্য? ততদিন ‘শিশুশিক্ষা’ চারিদিকে সাড়া ফেলে দিয়েছে। বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই জানতেন তিনি যে পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত, যে পরিকাঠামো তাঁর হাতে আছে তাতে নতুন বই লিখলে তার মার্কেটিং - এ কোন অসুবিধে হবে না। নইলে, বন্ধুর লেখা সিরিজের প্রথম তিন খণ্ডের চতুর্থ খণ্ডটি লেখার পরও নতুন করে আবার একটি প্রাইমার লিখতে যাবেন কেন? তবে কি একথাও আমাদের ধরে নিতে হবে, ‘শিশুশিক্ষা’য় কোন অসম্পূর্ণতা দেখেছিলেন বলে ‘বর্ণপরিচয়’ লিখে তা দূর করতে চেয়েছিলেন? দুটি ভাগের ‘বিজ্ঞাপনে’ তেমন কথাও নেই। বরং উল্টোটাই দেখেছি, ২য় ভাগের শেষে ‘শিশুশিক্ষা’ থেকে কিছুটা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, যা ৬০ তম সংস্করণে এসে তিনি ‘নিষ্কাশন’ করেন। সে অন্য প্রসঙ্গ। আমরা দেখে নিতে পারি, এই দুই বইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক কতটা। বলা যায়, ‘শিশুশিক্ষা’র কাছে ‘বর্ণপরিচয়’ কতটুকু ঋণী।

এক. মদনমোহনের মত বিদ্যাসাগরও ১ম ভাগে অসংযুক্ত বর্ণ এবং ২য় ভাগে সংযুক্ত বর্ণ সংস্থাপন করেছেন। তবে, ‘ঋৃ’ ‘ঌ’ ‘ং’ ‘ঃ’ - এই চারটি ধ্বনিকে মদনমোহন স্বরধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর বিদ্যাসাগর প্রথম দুটি ধ্বনি ‘বাঙ্গালা ভাষায় .... প্রয়োগ নাই’ বলে পরিত্যাগ করেছেন এবং অবশিষ্ট দুটি ধ্বনিকে ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে গণ্য করেছেন। কারণ ‘অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।’ এখানেই বিদ্যাসাগরের বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব।

দুই. মদনমোহনের মত বিদ্যাসাগর ১ম ভাগে স্বরধ্বনিগুলি আকৃতিসাম্য অনুসারে সজ্জিত করেন নি ঠিকই, কিন্তু দুজনেই বর্ণের ‘পরিচয়’ বা ‘পরীক্ষা’ নেওয়ার জন্য ব্যঞ্জনধ্বনিকে প্রায় একইভাবে সাজিয়েছেন। যেমন ঃ

মদনমোহন

ব র ক ধ ঝ / য য় ষ ঘ ম স / খ থ ফ

চ ঠ ঢ ট ছ / ণ ন গ ল শ /

ত ভ ড ঙ জ / হ ক্ষ ঞ / দ প।

বিদ্যাসাগর

ব র ক ধ ঝ / য য় ষ ঘ ম স /

খ থ ফ চ ঠ ঢ / ঢ় ট গ ল শ হ /

ছ ঞ দ প ণ ন / ড ড় ঙ ভ ত ....

মিলটুকু নিম্নরেখ অংশেই দেখা যাচ্ছে।

তিন . মদনমোহন ১ম ভাগের 'পাঠ' অংশটুকু ছন্দে সাজিয়েছেন, বিদ্যাসাগর গদ্যে। তবু 'বর্ণ পরিচয়ে' পদ্যের ছোঁয়া সামান্য হলেও আছে। যেমন,

পথ ছাড়।/জল খাও।

হাত ছাড়।/বাড়ি যাও। (পাঠ ২)

বা,

কথা কয়।/জল পড়ে। ....

হাত নাড়ে।/ খেলা করে। (পাঠ ৩)

'জল খাও' এবং 'জল পড়ে' অংশটুকু 'শিশুশিক্ষা'তেও আছে। (দ্র. ১ম ভাগ, পৃ. (১৩))।

চার . দুটি বইয়ের ২য় ভাগের 'মুখবন্ধ' বা 'বিজ্ঞাপন' থেকে উদ্ধার করি। 'শিশুশিক্ষা' : '..... সংযুক্ত বর্ণ পরিচয়ের নিমিত্ত দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলিত হইল।' 'বর্ণপরিচয়' : ' সংযুক্ত বর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।' 'শিশুশিক্ষা' : 'সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের কেবল সংযুক্ত অক্ষরের পরিচয় ও অভ্যাস করিতে অত্যন্ত অসুখ ও বিরাগ জন্মে, এজন্য প্রত্যেক সংযুক্ত অক্ষরের উদাহরণস্বরূপ এক এক উপদেশবাক্য বিন্যস্ত করা গিয়াছে।' 'বর্ণপরিচয়' : 'ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগের শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক; এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে।' 'শিশুশিক্ষা' : 'শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকটে এই নিবেদন, তাঁহারা সামান্যতঃ সর্ব্বসাধারণ শিক্ষার্থিকে উদাহৃত উপদেশবাক্য সমুদায়ের ভাবার্থ অবগত করাইতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগের বোধশক্তি অনুসারে অবগতি করান, ... তৎসমুদায়ের ভাবার্থাবগতি যত হউক বা না হউক অভ্যাসমাত্রেই ছাত্রবর্গের ভূয়সী উপকার সম্ভাবনা ....।' 'বর্ণপরিচয' : '........ শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরু, শিষ্য, উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, ... '

দুজনেরই বক্তব্য ও উদ্দেশ্য এক। তবে, শিক্ষকদের কাছে মদনমোহন 'নিবেদন' করেছেন, আর বিদ্যাসাগর শিক্ষকদের প্রতি ফরমান জারি করেছেন।

পাঁচ . ফিরে আসি প্রথম ভাগের কথায়। আমরা 'শিশুশিক্ষা'র উদাহরণ এবং বিদ্যাসাগর-চয়িত উদাহরণ (পাঠ) পরপর রাখছি। পাঠকই বুঝে নেবেন।

'শিশুশিক্ষা'-১

১. কদাচ মিছা কথা কহিও না (পৃ. ১৯)

২. পাঠের সময় গোল করিও না (ঐ)

৩. খেলা করিও না (পৃ. ১৬)

৪. ভোর হইয়াছে/আর শয়ন করিও না/এখন মুখ ধোও (পৃ. ১৭)

৫. পাঠের কালে ভাল বলিতে না পারিলে এক পাঠিরা উপহাস করিবে গুরু মহাশয় ভাল বাসিবেন না (ঐ)

৬. বেলা হইল পড়িতে চল .... কাপড় পর (পৃ. ১৬)

৭. পাঠের সময় গোল করিও না (পৃ. ১৯)

'বর্ণপরিচয়' -১

১. কখনও মিছা কথা কহিও না। (পাঠ-১২)

২. পড়িবার সময় গোল করিও না। (ঐ)

৩. সারা দিন খেলা করিও না। (ঐ)

৪. ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। (পাঠ ১৪)

৫. ভাল করিয়া না পড়িলে পড়া বলিতে পারিব না। পড়া বলিতে না পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন; (ঐ)

৬. বেলা হইল। পড়িতে চল। .... তুমি কাপড় পড় (পাঠ ১৫)

৭. কখনও পড়িবার সময় গোল করিও না। (পাঠ ১৬)

ছয়. এবার পাড়ি 'বর্ণপরিচয়-১'-র বিখ্যাত গোপাল-রাখাল কথা।

'বিদ্যাসাগরচরিত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, ... নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মত সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এ ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মত দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালি জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে।'[১]

বিভ্রান্তির উৎপত্তি এখানেই। সবাই ধরে নিলেন গোপাল-রাখালের স্রষ্টা স্বয়ং বিদ্যাসাগর। কেউ এই কাহিনীর মধ্যে 'সমাজ পরিচয়' লক্ষ করেন[২], কেউ-বা গবেষণাগ্রন্থের শিরোনাম দেন 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস ঃ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য'।[৩] কোন গবেষক আরও ব্যাখ্যা করে বলেন 'সু-অভ্যাস ও চরিত্র গঠনকে বিদ্যাসাগরও শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। সেই জন্যই বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের ১৯ ও ২০ নং পাঠে গোপাল ও রাখাল কাহিনী দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।'[৪]

প্রশ্ন জাগে, গোপাল-রাখাল বিদ্যাসাগরের কতখানি নিজস্ব ? সত্যিই কি তিনি চরিত্রদুটির স্রষ্টা? এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে আমরা যা জেনেছি তা হল, গোপাল নামক সুবোধ বালক এবং ভোলানাথ নামক দুষ্ট বালকের যাত্রা শুরু হয়েছে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে 'নীতিকথা-২' গ্রন্থে। বইটির লেখক জে. ডি. পিয়ার্সন নামে এক ধর্মযাজক। পিয়ার্সন ১৮১৭ সালে ভারতে আসেন। বইটিতে গোপাল সূর্য ওঠার আগেই পাততাড়ি নিয়ে পাঠশালায় যায়। পাঠশালায় না গিয়ে কোনদিনই সে পথের মধ্যে 'দুষ্ট ও অলস পড়ুয়াদের সঙ্গে' খেলা করে না।

গোপালের উল্টোপিঠ ভোলানাথ। সে কখনও পাঠশালায় যায় নি। পড়াশুনা কিছুই জানে না। 'কেবল খেলা আর মন্দ কর্ম ছাড়া সে কিছুই জানত না। এই বইয়ে আরও এক 'গোপাল' আছে। তার নাম গোবিন্দচন্দ্র। 'সে অতি সুশীল বালক', সে অন্য দুশ্চরিত্র ও অলস বালকদের সঙ্গে খেলা করত না, দিনে দুবার পাঠশালায় যেত। তার বিপরীত বদনচাঁদ। সে 'দুরন্ত অধার্মিক', 'পিতার অবাধ্য', পাঠশালায় 'শিক্ষকের আজ্ঞা অবজ্ঞা' করত।

এরপর গোপালকে দেখি ১৮৫০ সালে লেখা কেশবচন্দ্র কর্মকারের 'বালকবোধকেতিহাস' গ্রন্থে। পাঁচ বছরের গোপাল 'সুশীল বালক'। সে প্রতিদিন প্রাতে 'অতিশীঘ্র পাঠশালায়' গিয়ে 'আপন পাঠ উত্তমরূপে অভ্যাস' করত। সে পাঠশালায় অন্য বালকদের সঙ্গে ঝগড়া গল্প কিছুই করতনা। পথে কারও সঙ্গে বিবাদ করত না। ঘরে এসেও খেলাধুলা না করে সবসময় কাগজ কলম নিয়ে পড়াশুনা করত।

এর 'শিশুশিক্ষা-৩'। 'সুশীল শিশুকে সকলে ভালবাসে', 'পরের দ্রব্যে লোভ করিও না' এই দুই পরিচ্ছেদে 'সুশীল ও সুবোধ' বালকের গুণ এবং পড়ুয়া পরদুঃখকাতর মাতৃভক্ত গোপালের দেখা আমরা পেয়েছি। 'দুরন্ত বালককে কেহ দেখিতে পারে না'-শীর্ষক পরিচ্ছেদের বেণী বিদ্যাসাগরের হাতে দুরন্ত রাখাল-এ পরিণত হয়েছে। মদনমোহনও রাখালকে এনেছেন 'সুশীল বালক সকলকে সমান ভালবাসে' এবং 'অন্ধজনে দয়া কর' পরিচ্ছেদে।

আসলে, বিদ্যাসাগরের গোপাল ও রাখাল ধারাবাহিকতার ফসল। তারা 'নীতিকথা-২', 'বালকবোধকেতিহাস' ও 'শিশুশিক্ষা-৩'-এর যোগফল। বিদ্যাসাগরের গোপালও সকলের আগে পাঠশালায় যায়, পথে খেলা করে না, কারও সঙ্গে ঝগড়া বা মারামারি করে না, লেখাপড়ায় অবহেলা করে না, গুরুমশাই ও বাপ-মায়ের বাধ্য এবং সেজন্য সকলের প্রিয়। পিয়ার্সনের গোবিন্দচন্দ্র 'অতি সুশীল', কেশবচন্দ্রের গোপাল 'সুশীল', মদনমোহন এক 'সুশীল ও সুবোধ' বালকের কথা বলেছেন আর বিদ্যাসাগরের গোপাল 'বড় সুবোধ'।

অন্যদিকে, 'নীতিকথা-২'-এর ভোলানাথ ও বদনচাঁদ, 'শিশুশিক্ষা-৩'-এর বেণী এবং 'বর্ণপরিচয়-১'-এর গোপাল একই পঙক্তিভুক্ত। তবে বেণীর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বড় বেশি। বেণী খুব দুরন্ত। একটুও লেখাপড়া করে

না। শুধু খেলা করে। পড়ার বইপত্র কোথায় ফেলে রাখে পরদিন তা খুঁজে পায় না। সে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে, একদিনও পড়া বলতে পারে না। শিক্ষকের তিরস্কার শোনে। তাই 'বেণীকে কেহ ভালবাসে না।' শেষে লেখক বলেছেন 'দেখিও তুমি যেন বেণীর মত হইও না।'

বিদ্যাসাগরের রাখাল বাপ-মায়ের অবাধ্য, পড়াশুনায় অমনোযোগী, একদিনও পড়া বলতে পারে না। খেলা ছাড়া আর কিছু ভালবাসে না। এজন্য শিক্ষকের তিরস্কার শোনে। ছুটির পর বাড়িতে বইপত্র কোথায় ফেলে রাখে তার ঠিকানা থাকে না। এ কারণে 'রাখালকে কেহ ভাল বাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়।' — এখানে কি মদনমোহনের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে না?

সাত. মদনমোহন ২য় ভাগে ১৮৯টি সংযুক্ত ধ্বনির উদাহরণ দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়-২' ভাগে দিয়েছেন ১৭৮ টি। দু'জনের মধ্যে ১৭০টি সংযুক্ত ধ্বনি সাধারণ (Common)। এই ১৭০টি সংযুক্ত ধ্বনির মধ্যে ১৩১টি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মদনমোহনের উদাহরণই গ্রহণ করেছেন। যেমন :

ক্য = কটু বাক্য নাহি কবে। (শি.শি-২)/ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য (ব.প.-২)

খ্য = কুকাজে অখ্যাতি হবে। (ঐ)/মুখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান (ঐ)

র্ছ = মুর্ছায় চেতনা নাহি থাকে। (ঐ)/মুর্ছা,মুর্ছিত (ঐ)

র্জ = মেঘের গর্জনে শিখী ডাকে। (ঐ)/গর্জন, দুর্জন, নির্জন (ঐ)। ইত্যাদি।

মাত্র ৩৭টি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর নতুন উদাহরণ নিয়েছেন। এর মধ্যে ৬টি উদাহরণ দেখা যাক :

ত্ম = আত্ম (শি.শি.-২)/আত্মীয় (ব.প.-২)

ক্ত = ভক্ত (ঐ)/ভক্তি (ঐ)

ঙ্খ = শৃঙ্খলা (ঐ)/ শৃঙ্খল (ঐ)

জ্জ = সজ্জা (ঐ) / সজ্জিত (ঐ)

দ্দ = উদ্দেশিয়া (ঐ) / উদ্দেশ (ঐ)

দ্ভ = উদ্ভব (ঐ) / উদ্ভূত (ঐ)। এই ৬টি উদাহরণের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর মদনমোহনের কাছে ঋণী।

মদনমোহন সংযুক্ত ধ্বনিসজ্জায় ক্রমরক্ষা করেছেন যথাক্রমে - য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা, ব-ফলা, ন-ফলা, ম-ফলা, রেফ্, দ্ব্যক্ষর ও ত্র্যক্ষর। একই ক্রম বিদ্যাসাগরও রক্ষা করেছেন। শুধু ণ-ফলা-র পৃথক বিভাগ ব-ফলা ও ন-ফলা-র মধ্যে স্থাপন করেছেন। মদনমোহন ওই উদাহরণগুলি দ্ব্যক্ষর ব্যঞ্জনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

'শিশুশিক্ষা'য় নানা প্রসঙ্গ

প্রকৃতিজগৎ : 'শিশুশিক্ষায় ছেয়ে আছে প্রকৃতি। শিশুমনে প্রকৃতির আলোছায়া নানারূপে দেখা দিয়েছে। এই প্রকৃতিতে আছে সূর্য, চন্দ্র, জল, বায়ু, ফুল-ফল, ভ্রমর, নদ, নদী, মেঘ-বৃষ্টি, ঋতুপর্যায়ের ছ'টি পর্ব, বন-অরণ্য ইত্যাদি। প্রথম ভাগের ৫ পৃষ্ঠায় পাঠ অংশে শব্দদ্বৈতে প্রকৃতির আভাস রয়েছে। 'ঝরঝর' বৃষ্টির সূচক, 'কলকল' 'খল খল' 'টল টল' জলের শব্দসূচক। মেঘ-বৃষ্টি-জলের একাধিকবার উল্লেখে মনে হয় মদনমোহনের সঙ্গে জলের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ভোর হওয়া-আলোয় স্পষ্টতা-ফুল ফোটা-বাতাস বওয়া-তার ফলে ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ার এসবই এক সূত্রে গাঁথা। ঝড়-মেঘগর্জন-বারিপাত (পৃ. ২১) শিশুমনে একটা ছবি এঁকে দেয়। ২য় ভাগেও প্রকৃতি বহমান। ষড়ঋতুর পরিচয় এই ভাগের বড় অংশ দখল করে আছে। এছাড়া উদাহরণের বাক্যগুলিতেও প্রকৃতির ছোঁয়া।

প্রাণিজগৎ : প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে প্রাণিকুল। 'শিশুশিক্ষা'-র তিনটি ভাগেই জীবজগতের বিবরণ আছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, সে পরিচয় ধাপে ধাপে বিস্তৃত হয়েছে। ১ম ভাগে 'কাল কাক', 'মণি হারা ফণি', 'ক্ষীণ কায় মীন', 'মেষ পাল', 'তোতা পাখি', 'হংস ধরে', 'ঘোড়ায় চড়িব', 'কোকিল ডাকিল', 'বানর সাজিছে' — এটুকু পরিচয় বাক্যাংশের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২য় ভাগে প্রাণিজগতের পরিচয় একটু বিস্তৃত। সে পরিচয় পূর্ণবাক্যের রূপে বিধৃত। যেমন, 'ব্যাঘ্র নাহি বশে থাকে', বজ্রসম সিংহ ডাকে', 'আরবদেশে ভাল অশ্ব হয়', 'মেঘের গর্জনে শিখী ডাকে', 'সর্প নাহি মানে পোষ' — ইত্যাদি। লক্ষণীয়, প্রত্যেক বাক্যে প্রাণীটির সামান্য বৈশিষ্ট্য ও মুদ্রিত। আর যেসব প্রাণীর কথা ২য় ভাগে আছে, তারা হল কোকিল, সারস, কুক্কুট, উট, ভেক, ময়ূর-ময়ূরী, বক, অলি ইত্যাদি।

৩য় ভাগে কয়েকটি প্রাণী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সেসব অনুচ্ছেদে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থাকলেও একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে সেকালে সেটুকুই অনেক। মদনমোহনের প্রাণিজগতে জলচর স্থলচর নভোচর নিশাচর উভচর সকলেরই আনাগোনা।

ভাষা-ছন্দ ঃ বাংলা বর্ণমালার বিন্যাসক্রমে মদনমোহন মৌলিকতা দেখান নি। আমরা যে ক'টি প্রাইমার দেখেছি তাতে 'ক্ষ' ব্যঞ্জনধ্বনি এবং 'ং' ও 'ঃ' স্বরধ্বনি হিসেবে গণ্য হয়েছে। পূর্ববর্তী প্রাইমারগুলিতে আকৃতিসাম্য অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনি সজ্জিত থাকত শিক্ষার্থীর অনুশীলনের জন্য। শিরোনাম 'ব্যুৎক্রম ব্যঞ্জন' বা 'ব্যুৎক্রম স্বর', যাকে মদনমোহন বলেছেন 'বর্ণপরিচয়'। 'শিশুসেবধি' - তে ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যুৎক্রম - 'ব র ঝ ক ধ ঘ / য ষ ফ চ ঠ ছ / ট ঢ ভ ত ড জ / ঙ থ খ গ প শ / ন ল ণ ম স হ ক্ষ ঞ দ।' স্বরধ্বনির ব্যুৎক্রম - 'আ অ ঐ এ ঈ ঊ ঋ ৯ ঋ্ ৯ৢ ঔ উ ই ও অঃ অং।' 'ফলা'-র ক্ষেত্রে অনুক্রম-য র ল ব ন ম ঋ রেফ্। প্রথম ভাগে সামান্য ব্যতিক্রমসহ মদনমোহন এই অনুক্রমই রক্ষা করেছেন। লক্ষণীয়, বর্গীয়-ব এবং অন্তঃস্থ-ব একই আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় একটি 'ব' গৃহীত হয়েছে। 'য়' ধ্বনিটি সর্বপ্রথম মদনমোহনই পৃথক ধ্বনি হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু, 'র' 'ড়' 'ঢ়'-র মধ্যে উচ্চারণ-পার্থক্য থাকলেও 'ড়' ও 'ঢ়' ব্যঞ্জনধ্বনিতে গৃহীত হয়নি। শব্দগঠনে প্রথমাবধি শব্দদ্বৈতের উদাহরণ। ৫ পৃষ্ঠায় প্রথম দুটি অংশের শব্দসজ্জায় প্রতি শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনে বর্ণানুক্রম রক্ষিত। তৃতীয় অংশ থেকে তার ব্যতিক্রম ঘটলেও ধ্বনিঝঙ্কারগত দিক দিয়ে শব্দগুলি যোজিত। এসব ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে শব্দসমূহের ছন্দ পরিমিতি ও মিলের শব্দসুষমা। শিশুচিত্তে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। ত্র্যক্ষর শব্দের প্রথম অংশের সব শব্দই ন-অন্ত। পরবর্তী অংশে পাশাপাশি মিল রক্ষিত। যেমন, 'শমন/দমন', 'সরস/পনস' ইত্যাদি। সমিল শব্দদ্বারা বাক্যের রূপ প্রাথমিকভাবে ৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া গেলেও (পান খায় গান গায়, দান চায় মান যায় ইত্যাদি) বাক্যের স্ফুটতর অর্থবহ রূপ দেখা গেছে ১২ পৃষ্ঠায়। যেমন, 'মালা গাঁথি গলে পরি', 'বাঁশি বাজে গান করি' ইত্যাদি।

প্রকৃত গদ্যরূপ যতিচিহ্নসহ সূচিত হয়েছে ১৫ পৃষ্ঠা থেকে। প্রথম যতিচিহ্ন প্রশ্নবোধক। প্রথম প্রশ্নমালার সমাপ্তি-প্রশ্নের উত্তরটি কৌতুকপ্রদ। 'তোমার হাতে কি পুথি'-র উত্তর 'আমার হাতে শিশুশিক্ষা'। নির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বনে দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র বাক্যের সাহায্যে অনুচ্ছেদের সূচনা ২০ পৃষ্ঠা থেকে। এই পৃষ্ঠা থেকেই যতিচিহ্নে ব্যাপকত্ব এসেছে।

'শিশুশিক্ষা-র তিনটি ভাগেই সাধু-চলিতের মিশ্রণ সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। যেমন, ফেটে', 'চেটে' (১০/১), 'দেখে' 'উঠে' (১৩/১), 'যাবে' (১৫/১), 'চেঁচিয়া' (১৯/১), 'তাকে' (২৪/১), 'ভিজে যায়' (১০/২), 'ফেলিয়া ছড়িয়া' 'হবে না' (২/৩), 'দাঁড়িয়া ছিলাম' (৬/৩), 'কোথায় পাবে' 'তা হলে ত' 'খেতে ছড়িয়া' 'হবে না' (২/৩), 'দাঁড়িয়া ছিলাম' (৬/৩), 'কোথায় পাবে' 'তা হলে ত' 'খেতে পরিতে' (৭/৩), 'চেয়ে দেখ' (৮/৩) ইত্যাদি। কয়েকটি শব্দের বানানে নবীনত্ব আছে। যেমন, খুদ পাখি বাঁশি আঙুল ইত্যাদি।

নীতিশিক্ষা ঃ ২য় ভাগের মুখবন্ধে লেখক বলেছেন ' .... প্রত্যেক সংযুক্ত অক্ষরের উদাহরণস্বরূপ এক এক উপদেশবাক্য বিন্যস্ত করা গিয়াছে।' ৩য় ভাগের মুখবন্ধেও স্পষ্ট করে বলেছেন 'তৃতীয় ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানা বিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল।' প্রথম ভাগের মুখবন্ধে তেমন কোন ঘোষণা না থাকলেও উদাহরণ ও অধ্যায় সন্নিবেশে উপদেশবাক্য- সমাহার চোখে পড়ার মত।

শিশুপাঠ্যগ্রন্থে নীতিশিক্ষার বিষয়টি নতুন কিছু নয়। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই এই প্রচেষ্টা সচেতনভাবে শুরু হয়েছে। * 'শিশুশিক্ষা' ১ম ভাগে নীতিশিক্ষার রূপটি প্রকাশিত হয়েছে ধীরে ধীরে। বাক্যগঠনগত দিক দিয়ে অস্ত্যর্থক, নঞর্থক, অনুজ্ঞবাচক, নিষেধাত্মক — সব রূপেরই সমাহার। 'দান চায় মান যায়', 'শীল যায় কীল খায়' (৮), 'অধিক আহার করিলে রোগ হয়' (১৮) ইত্যাদি সাধারণ নীতিশিক্ষার পাশে আছে 'পুথি পড় পাঠ বল' (১৩), 'অলস হইও না খেলা করিও না' (১৬), 'পিতার কথা শুনিবে মাতার সেবা করিবে' (১৮) ধরনের

বাক্য। ১৯ পৃষ্ঠায় নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে ৭টি নিষেধাত্মক অনুজ্ঞবাচক বাক্যে, ৫টি অনুজ্ঞাবাচক অস্ত্যর্থক বাক্যে, ২টি নির্দেশাত্মক নঞর্থক বাক্যে। এমনকি 'প্রভাত বর্ণন' কবিতায় অসাধারণ প্রকৃতি-বর্ণনার পর নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যেই অন্তিমে দুটি পঙক্তি যোজিত 'উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ / আপন পাঠতে মন করহ নিবেশ'।

'শিশুশিক্ষা'র তিনটি ভাগে নীতিশিক্ষার দুটি দিক আছে। একটি শিশুর ব্যক্তিগত দিক, যেখানে আছে তার সু-অভ্যাস গড়ে তোলা, সদাচরণ অভ্যাস করা, চরিত্র সুগঠিত করা ইত্যাদি। আর একটি শিশুর সামাজিক দিক। এখানে শিশু পেয়েছে তার সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত শিক্ষা। শিশুর পারিবারিক সম্পর্ক সামাজিক দিকের সঙ্গে অন্বিত।

বিজ্ঞান জগৎ ঃ প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানের জগৎ নয়, আমাদের চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে মদনমোহন শিশুকে সচেতন করে দিতে চেয়েছেন। সে জগতে রয়েছে প্রকৃতি, প্রাণী (এই দুই বিষয়ে আগেই বলেছি), ভূবিদ্যা ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক সত্য ও তথ্যের দিক দিয়ে বেশ কিছু স্থানে অসম্পূর্ণতা থাকলেও শিশুর চিত্তে বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে মদনমোহনের এই প্রয়াস বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম।

THE

INFANT TEACHER.

PART I.

COMPILED FOR THE USE

OF

FEMALE SCHOOLS IN BENGAL

BY

MADUN MOHUN TURKALUNKAR

SECOND EDITION
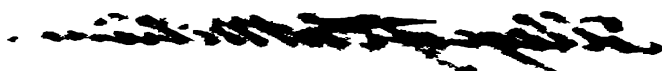
CALCUTTA

PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS.

1850

শিশুশিক্ষা

প্রথম ভাগ

এতদ্দেশীয় বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ

শ্রীযুক্ত মদনমোহন শর্ম্ম তর্কালঙ্কার

প্রণীত

কলিকাতা

সংস্কৃতযন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯০৭

TO THE HON'BLE J. E. D. BETHUNE.
Member of the Supreme Council of India,
President of the Council of Education.
&c. &c. &c.

HON'BLE SIR,

The want of elementary works in the Vernacular language for the use of children in Bengal has long been felt. The series, of which the following pages are the first part, is intended to supply that want, which especial reference to female education.

It is natural for an author, however humble his position, and however slight his work, to desire that the fruits of his labour should be presented to the public under the sanction of a dignified personage. This desire has influenced me to connect your name with these publications.

Whether I contemplate your public position as the head of the Educational Department, and therefore the patron exofficio of every undertaking that aims at the intellectual and moral improvement of the country, or whether I reflect on the deep interest which

---

(2)

you have invariably delighted to manifest in the wellbeing of my countrymen, and especially in the emacipation of the females of Bengal from the most galling and degrading, of all yokes – I feel encouraged by the idea that, if I have presumed too much on your kindness in inscribing your name on this work, your public and private acts will be my apology.

In the hope that the series, of which this little book is the first number, and on which, although they are mere primers in the language, I have had occasion to bestow some labour and a good portion of my time, will prove acceptable to you, and useful to those for whose benifit they have been compiled.

I am,
Hon'ble Sir,
Your most Obedient Servant,
Madun Mohun Serma.

Calcutta
6th September
1850

মহামহিম মান্যবর শ্রীযুক্ত জে. ই. ডি. বীটন

ভ(া)রতবর্ষীয় রাজসমাজসদস্য শিক্ষাসমাজাধিপতি

মহাশয়েষু।

সমুচিত সম্মানপূর্ব্বক সবিনয়নিবেদনম্।

অনেকেই অবগত আছেন, প্রথমপাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথা নিয়মে স্বদেশ ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই কয়েকটি পত্র দ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কি ছোট কি বড় গ্রন্থকার মাত্রেই আপনার গ্রন্থ যত তুচ্ছ হউক না কেন, কোন মহানুভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামানুগৃহীত করিয়া লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া থাকেন। এই বিশ্বজনীন ব্যবহার দর্শনে বাসনা হইয়াছে আমারও পুস্তকসকল আপনকার নামাক্ষর সংযুক্ত হইয়া প্রচারিত হয়।

আপনি শিক্ষাসমাজের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া অস্মদ্দেশস্থ লোকের বিদ্যা, বিষয়, শীল, সুনীতি সম্পাদনার্থে যেরূপ অ(া)ন্তরিক যত্ন ও অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, বিশেষতঃ এতদ্দেশের হতভাগ্য নারীগণের দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অজ্ঞানান্ধকূপ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার মানসে যে অশেষ প্রয়াস

---

(২)

পাইতেছেন, আমি আপনকার সেই সমস্ত বিশুদ্ধ গুণে মুগ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আপনকার সুপ্রতিষ্ঠিত নাম সংযোজন সাহসে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে যদি আমি অনুযোজ্য হই, ভাবিয়াছি, আপনকার মহানুভব স্বভাব ও অলোকসামান্য গুণগ্রাম আমার পক্ষে সপক্ষতা করিবেক সন্দেহ নাই।

এই সঙ্কলিত পুস্তকপরম্পরা আপনকার সন্নিধানে পরিগৃহীত এবং শিশুগণসমাজে আদৃত ও ব্যবহৃত হইলেই আমার পরিশ্রম ও সময়ব্যয় সমুদায় সার্থক হইল বলিয়া বিবেচনা করিব ইতি।

একান্তবশম্বদস্য

কলিকাতা

সংবৎ ১৯০৭ শ্রীমদনমোহনশর্ম্মণঃ।

২২ ভাদ্র

শিশুশিক্ষা।

প্রথম ভাগ

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ ৠ

ঌ ৡ এ ঐ

ও ঔ অং অঃ

---

(২)

প্রস্তর অথবা কাষ্ঠফলকে নিম্নলিখিত ধারানুসারে বর্ণপরিচয় করাও।

অ আ অং অঃ

উ ঊ ও ঔ

ই ঈ এ ঐ

ঋ ৠ ঌ ৡ

(৩)

ব্যঞ্জন

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল ব
শ ষ স হ ক্ষ

---

(৪)

প্রস্তর অথবা কাষ্ঠফলকে নিম্ন লিখিত
ধারানুসারে বর্ণপরিচয় করাও।

ব র ক ধ ঝ
য য় ষ ঘ ম স
খ থ ফ
চ ঠ ঢ ট ছ
ণ ন গ ল শ
ত ভ ড ঙ জ
হ ক্ষ ঞ
দ প

(৫)

পাঠ।

কর	কর	খর	খর
গর	গর	জর	জর
ঝর	ঝর	থর	থর
দর	দর	ধর	ধর
পর	পর	সর	সর

কল	কল	খল	খল
গল	গল	চল	চল
ছল	ছল	টল	টল
ঢল	ঢল	বল	বল
ঘর	কর	কর	ধর
মল	পর	ফল	ধর
বল	কর	জল	সর
যত	কয়	তত	নয়
গত	হয়	কত	সয়

---

(৬)

ঝড়	বয়	বড়	ভয়
রণ	জয়	ধন	রয়

নর	গণ	কর	পণ
ঘন	বন	ধন	জন
হল	ধর	জল	চর
বড়	ঘর	গড়	নর

ধর	বচন	কর	রচন
পর	বসন	খর	দশন
ঘন	ভবন	বন	পবন
জল	শয়ন	ফল	চয়ন

শমন	ভয়	দমন	হয়
সরস	দল	পনস	ফল
সরল	নল	তরল	জল
চরণ	ধর	মরণ	হর

(৭)

আ	া	ক	া	কা
ই	ি	ক	ি	কি
ঈ	ী	ক	ী	কী
উ	ু	ক	ু	কু
ঊ	ূ	ক	ূ	কূ
ঋ	ৃ	ক	ৃ	কৃ
ঌ	ৢ	ক	ৢ	কৢ
এ	ে	ক	ে	কে
ঐ	ৈ	ক	ৈ	কৈ
ও	ো	ক	ো	কো
ঔ	ৌ	ক	ৌ	কৌ
অং	ং	ক	ং	কং
অঃ	ঃ	ক	ঃ	কঃ

---

(৮)

কাল	কাক	ভাল	নাক
কাটা	কাণ	ফাটা	শান
পাকা	পান	টাকা	দান
বার	মাস	তার	দাস
পান	খায়	গান	গায়
দান	চায়	মান	যায়
পাত	পাড়	ভাত	বাড়
ধান	ঝাড়	থান	ফাড়
কি	রাখি	ঘি	চাখি
শিকি	চাই	টিকি	নাই
খিলি	খাই	মিলি	যাই
শিখি	নাই	লিখি	ভাই
মণি	হারা	ফণি	পারা
শীল	যায়	কীল	খায়
শীত	পায়	গীত	গায়

(৯)

ক্ষীণ কায় — মীন খায়
কসী টান — মসী আন

ঘন কালী — বন মালী
বাটী যাও — মাটী খাও
খড়ী পাড় — দড়ী ছাড়
ভাল ধনী — কাল ফণী

ফুল পাড় — ফুল ঝাড়
খুদ খায় — সুদ চায়
লুণ খাই — গুণ গাই
দুধ ভার — বুধ বার

ডুব দাও — খুব খাও
তরু কাটি — চরু চাটি
কাল তনু — ভাল ধনু
পুর বাসী — সুর দাসী

---

(১০)

কূপ জল — রূপ বল
তূল ধুনি — মূল বুনি
পদ শূল — ন[illegible] কূল

ধন তৃষা — গণ মৃষা
ঘৃত আনি — কৃত মানি
কৃশ কায় — ভৃশ ধায়
ঋণ দায় — তণ (তৃণ) খায়

কেবা নরে — সেবা করে
কেন করি — যেন মরি
কেশ ধর — বেশ কর
মেষ পাল — শেষ কাল

বেদ ছাড়ে — খেদ বাড়ে
গেল কাল — ফেল জাল
ফেটে যায় — চেটে খায়
দেশে চল — শেষে বল

(১১)

কোতা	রাখি	তোতা	পাখি
গোল	হয়	খোল	ময়
দোষ	জানে	পোষ	মানে
কোপ	ধরে	লোপ	করে
ঢোল	রাখি	ঝোল	মাখি
খৈ	খাই	দৈ	নাই
মৈ	টানে	কৈ	আনে
ভাল	কৈরব	কাল	ভৈরব
গৌর	কায়	চৌর	ধায়
গৌণ	হয়	মৌন	রয়
কৌতুক	কর	যৌতুক	ধর
যত	কৌরব	হত	গৌরব
হংস	ধরে	কংস	রাজ
অংশ	করে	বংশ	মাজ

(১২)

মালা	গাঁথি	গলে	পরি
বাশি(বাঁশি)	বাজে	গান	করি
করি	ফাঁদ	ধরি	চাঁদ
দুঃসাহসে		দুঃখ	হয়
দুঃশীলের		নিঃসংশয়	
পা	ফাটে	গা	চাটে
দা	মারে	ঘা	সারে
হ্যা	করে	না	সরে
রা	কাড়ে	ছা	পাড়ে
গমন	করে	শমন	ঘরে
শয়ন	করে	বসন	পরে
সকল	দেশ	ধবল	বেশ
মরণ	দায়	শরণ	চায়
সরল	মতি	তরল	গতি
পবন	বহে	ভবন	দহে

(১৩)

আমি	বসি	তুমি	যাও
ফল	ধর	জল	খাও
পুথি	পড়	পাঠ	বল
বেলা	নাই	বাড়ী	চল
দেখে	আসি	ভাল	বাসি
ডুব	দাও	জলে	ভাসি
জল	পড়ে	ছাতি	ধর
উঠে	বসি	খেলা	কর

ঘড়ী	গড়	গাড়ী	চড়
মধু	খাও	গান	গাও
পাত	লেখি	হাত	দেখি
জল	আন	ধান	ভান
পাট	কাট	গুড়	চাট
ভোর	হয়	মুখ	ধোও
রাতি	হয়	ঘরে	শোও

---

(১৪)

মিঠাই	খাইব	কোথায়	পাইব
বসন	পরিব	শয়ন	করিব
সকল	পড়িব	ঘোড়ায়	চড়িব
যখনি	যাইব	তখনি	ধাইব
মাধব	আসিবে	যাদব	হাসিবে

দশন	নড়িল	খসিয়া	পড়িল
মলিন	হইল	নলিন	লইল
কোকিল	ডাকিল	অখিল	থাকিল
কুসুম	ফুটিল	সৌরভ	ছুটিল
রমণী	আসিছে	তরণি (তরণী)	ভাসিছে
যাতনা	বাড়িছে	চেতনা	ছাড়িছে
বসিয়া	লেখিছে	উঠিয়া	দেখিছে
পবন	বহিছে	ভবন	দহিছে
বালিকা	হাসিছে	বালক	কাশিছে
বাজনা	বাজিছে	বানর	সাজিছে

(১৫)

তুমি কি লোক?
তোমার নাম কি?
তোমার বাড়ী কোথায়?
তুমি কি পড়?
তোমার হাতে কি পুথি?
আমি বামণ
আমার নাম রামনাথ
আমার বাড়ী বালী
আমি 'য' ফলা পড়ি
আমার হাতে শিশুশিক্ষা

তুমি কি করিতেছ?
আজি পড়িতে যাবে না?
বসিয়া আছ কেন?
কি ভাবিতেছ?

---

(১৬)

তুমি কি ভয় পাইয়াছ?
আমার সহিত আইস?
আমার কাছে কে কি বলিতে পারিবে

অলস হইও না
খেলা করিও না
বেলা হইল
পড়িতে চল
গৌণ কর কেন
কাপড় পর
পুথি লও
পাঠশালায় চল
তোমার পুথির মলাট কোথায় গেল?
গুরু মহাশয় দেখিলে রাগ করিবেন?

(১৭)

ভোর হইয়াছে
আর শয়ন করিও না
এখন মুখ ধোও
ঘরের ভিতর আলো হইয়াছে
পাঠের পুথি হাতে লও
আগে নূতন পাঠ শিক্ষা কর
পরে পুরাতন পাঠ একবার দেখ
পাঠের কালে ভাল বলিতে না
পারিলে, একপাঠিরা উপহাস করিবে
গুরু মহাশয় ভাল বাসিবেন না

কমল ফুল ফুটিয়াছে
ভাল সৌরভ আসিতেছে
ঘরে জল পড়িতেছে
বিছানা ভিজিয়া গেল

---

(১৮)

তিনি ভোজন করিতেছেন
এখন দেখা হইবে না
তাঁহার পীড়া হইয়াছে
আমি দেখিতে যাইব
পায় বেদনা হইয়াছে
চলিতে পারিব না
বড় মাথা ধরিয়াছে
কথা কহিতে পারি না
পিতার কথা শুনিবে
মাতার সেবা করিবে
সদা পাঠ পড়িবে
বড় সুখে থাকিবে

যাহার মলিন বেশ তাহার আদর নাই
অধিক আহার করিলে রোগ হয়।

(১৯)

অলস লোক দুঃখ পায়
দয়ার সমান গুণ নাই
দীন দেখিয়া দান করিবে
চেঁচিয়া কথা কহিও না
পাঠের সময় গোল করিও না
গুরুলোকের নাম ধরিও না
পিপাসায় জল দান করিবে
ক্ষুধিত জনে ভোজন করাইবে
বিবাদ করা ভাল নয়
কাহারও গায়ে হাত তুলিও না
সুশীলকে সকলে ভাল বাসে
কদাচ মিছা কথা কহিও না
কাহারও কিছু চুরি করিও না
কথায় কথায় শপথ করিও না

---

(২০)

পিতামাতার সেবা কর, তাঁহারা যাহা করিবেন তাহাই করিবে। গুরুলোকের উপদেশে অবহেলা করিও না, যাহারা তোমার একপাঠী তাহাদের সহিত কখন কলহ করিও না, কাহাকেও কটু কথা কহিও না।

সকলকেই ভাল বাসিবে ও ভাল কথা কহিবে, যে জন যে কথায় মনে পীড়া পায় তাহাকে তেমন কথা কহিবে না। কাণাকে কাণা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না, তাহা বলিলে তাহারা মনে দুঃখ পাইবে। পড়িবার সময়ে আর দিকে মন দিও না। যিনি তোমাকে শিক্ষা দেন সাবধানে তাঁহার কথা মনে রাখিবে এবং তিনি

(২১)

যে বিষয়ে নিষেধ করেন কদাচ তাহা করিও না।

মেঘ হইতে জলধারা পড়িতেছে এখন ঘরের বাহিরে যাইব না। আমার গা ও পা ভিজিয়া যাইবে শীত করিবে এবং অবশেষে কফ কাশী হইয়া বড় পীড়া পাইব। মেঘের ভিতর হইতে আলো বাহির হইয়া আমার চক্ষে লাগিতেছে জানালার কপাট দিই। উঃ! মেঘের ডাকে কাণ ফাটিয়া যায়। আলো বাহির হইতেছে আবারও বুঝি মেঘ ডাকে, চক্ষু বুজিয়া থাকি

---

(২২)

কাণ ঢাকিয়া রাখি এবং মাঝের কুঠুরীতে যাইয়া বসি। রাম! জল ছাড়িল আপদ্ গেল মেঘের ডাকে এখনি মরিয়া গিয়াছিলাম।

দশ দিক্। সাত বার। দুই পক্ষ। বার মাস। ছয় ঋতু। পোনর তিথি। পৃথিবী গোলাকার। রবি তেজোময় গোলাকার। সাগরের জল লোণা। নিশাকর গোলাকার নিজে তেজোময় নয়। পাহাড় সকল পাষাণময় এবং ভূতল হইতে অনেক উচ। নদ নদী সকল পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে, ইহারা উচ দেশ

---

(২৩)

হইতে নীচ দেশে বহিয়া যাইতেছে, এবং সকলেই সাগরের জলে মিসিতেছে। যেমন ভাগীরথী নদী হিমালয় হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণে ভারত সাগরে পড়িতেছে।

মানুষের দুই পা। যাহার পা আছে সেই চলিতে পারে, যাহার পা বিকল সেই খোঁড়া। দুই হাত। হাত দিয়া সকল কাজ করা যায়। যাহার হাত নাই সে কিছুই করিতে পারে না তাহাকে নুলো বলে। সকলেরি এক মুখ মুখ দিয়া আহার করা যায়। আহার না করিলে

(২৪)

কেহ বাঁচে না। মুখের ভিতর যে জিভ আছে তাহাতেই সকল রস টের পাওয়া যায়। জিভ না থাকিলে লবণ, মধুর, ঝাল, টক, তিত, কষা, কিছুই বোধ হইত না। সকলেরি দুই ঠোঁট। ঠোঁট থাকাতে দুধ জল আদি চুমুক দিয়া খাওয়া যায়, ঠোঠ (ঠোঁট) না থাকিলে মুখ হইতে আহার পড়িয়া যাইত।

মানুষের দুই পাটী দাঁত। দাঁত দিয়া কঠিন ফল, মূল, মাছ, মাংস, চিবান যায়। আমাদের জিভ তালু দাঁত ঠোঁট আছে, অতএব কথা কহিতে পারি। যে কথা কহিতে না পারে লোকে তাকে বোম্বা বলে।

---

(২৫)

দুই চক্ষু। চক্ষু দিয়া সকল দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার চক্ষু নাই সে কিছুই দেখিতে পায় না। আহা কাণা বড় দুঃখী।

তোমার দুইটী কাণ আছে। কাণ না থাকিলে আমার কথা শুনিতে পাইতে না। কালারা কিছু শুনিতে পায় না। নাক দিয়া বাহিরের বাতাস টানিয়া লওয়া যায়, এবং ভিতরের বাতাস বাহির করা যায়, তাহাতেই জীবন রক্ষা হয়। যাহার নাক নাই সে ফুলের বাস পায় না, ও দেখিতে কদাকার। দুই ভুরূ। ভুরূ চক্ষুর শোভা। ভুরূ থাকাতে চক্ষে বড় রোদ লাগে না

---

(২৬)

এবং পথের ধূলা ও কপালের ঘাম চক্ষে পড়িতে পারে না। সকলের মাথায় চুল আছে। চুল না থাকিলে মাথার শোভা হয় না। চুল থাকাতে মাথায় রোদ ও হিম কম লাগে। যাহার চুল নাই তাহাকে নেড়া বলে।

এক এক হাতে পাঁচ পাচ (পাঁচ) আঙুল আছে। আঙুল না থাকিলে হাত দিয়া কিছুই করা যায় না। দুই পায় দশ আঙুল। পায় আঙুল না থাকিলে চলা কঠিন হইত। দুই চক্ষে চারি পাতা আছে। ঐ পাতা থাকায় চক্ষুর ভিতর কুটা, ধূলা, পোকা, মাকড়, পড়িতে পায় না এবং রবির তাপ ও

(২৭)

আলো লাগিয়া চক্ষুর কোন দোষ ঘটায় না।

বার তিথি মাস যত।
একে একে হয় গত।
বার মাস সাত বার।
আসে যায় বার বার।
লেখাপড়া করে যেই।
গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।
লেখাপড়া যেই জানে।
সব লোক তারে মানে।
পিতা মাতা গুরুজনে।
সেবা কর কায় মনে।

---

(২৮)

প্রভাত বর্ণন।

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল।
গগণে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় যুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥

---

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

শিশুশিক্ষা।

দ্বিতীয় ভাগ।

এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সাহিত্যাধ্যাপক

শ্রীযুত মদনমোহন শর্ম্মতর্কালঙ্কার

প্রণীত।

কলিকাতা। সংবৎ ১৯০৬।
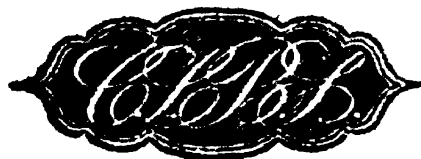
CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL BOOK SOCIETY'S PRESS, AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD

1850.

মুখবন্ধ।

শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগে কেবল অসংযুক্ত বর্ণপরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এক্ষণে সংযুক্ত বর্ণপরিচয়ের নিমিত্ত দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলিত হইল।

ইহাতে সংযুক্ত বর্ণের বিন্যাসক্রম প্রাচীন প্রথার অনুরোধে, ক্য, ক্র, ক্ল, ক্ব, ক্ণ, এই রূপ শৃঙ্খলায় অনুবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যে সকল সংযুক্ত বর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় একেবারে অপ্রচলিত এবং সংস্কৃত ভাষাতেও বিরলপ্রচার তৎসমুদায় শিশুগণের অনাবশ্যক অভ্যাস পরিশ্রম পরিহারার্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেমন, ঙ্ঘ্য, ছ্য, ঞ্য, ঢ্র, ঝ্র ,ক্ষ্ল, ঙ্ব, ঞ্ব ,ক্ষ্ন, ঝ্ণ, ঘ্ণ , ছ্ণ ইত্যাদি।

সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের কেবল সংযুক্ত অক্ষরের পরিচয় ও অভ্যাস করিতে অত্যন্ত অসুখ ও বিরাগ জন্মে, এজন্য প্রত্যেক সংযুক্ত অক্ষরের উদাহরণস্বরূপ এক এক উপদেশবাক্য বিন্যস্ত করা গিয়াছে। এবং স্থূলরূপে কাল পরিজ্ঞানার্থে পুস্তকের শেষভাগে বার, মাস এবং ঋতু বিষয়ক বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

শিশুশিক্ষার শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকটে এই নিবেদন, তাঁহারা সামান্যতঃ সর্ব্বসাধারণ শিক্ষার্থিকে উদাহৃত উপদেশবাক্য সমুদায়ের ভাবার্থ অবগত করাইতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগের বোধশক্তি অনুসারে অবগতি করান, কারণ সংযুক্তবর্ণের উদাহরণ স্থল দর্শাইবার উদ্দেশেই (উদ্দেশ্যেই?) ঐ সকল বাক্যকদম্ব রচিত হইয়াছে, সুতরাং তৎসমুদায়ের ভাবার্থাবগতি যত হউক বা না হউক অভ্যাসমাত্রেই ছাত্রবর্গের ভূয়সী উপকার সম্ভাবনা ইত্যলং বিস্তরেণ।

শিশুশিক্ষা

দ্বিতীয় ভাগ

ক্য   কটু বাক্য নাহি কবে।
খ্য   কুকাজে অখ্যাতি হবে।
গ্য   আরোগ্য সুখের মূল।
চ্য   কুবাচ্য কথার শূল।
জ্য   অনিয়মে রাজ্য নাহি রয়।
ট্য   কুনটের নাট্য কিছু নয়।
ঠ্য   পাঠ্য পুথি হাতে কর।
ড্য   জাড্য দোষ পরিহর।
ঢ্য   আঢ্য জন যারা।
ণ্য   গণ্য হয় তারা।
ত্য   অসত্য পাপের চর।
থ্য   কুপথ্য রোগের ঘর।
দ্য   বিদ্যাধন আছে যার।
ধ্য   সকলি সুসাধ্য তার।

---

(২)

ন্য   ধান্য ধন মহাধন।
প্য   আলাপ্য সরল জন।
ভ্য   সভ্য জন সভার ভূষণ।
ম্য   গম্য নয় কুজন ভবন।
য্য   দিবা শয্যা পরিহর।
ল্য   বাল্যকালে শিক্ষা কর।
ব্য   দিব্য করা বড় দোষ।
শ্য   বশ্য কর নিজ রোষ।
ষ্য   দোষিকে সকলে দূষ্য করে।
স্য   আলস্য অশেষ গুণ হরে।
হ্য   কাপুরুষেরাই অপমান সহ্য করে।
ক্ষ্য   অন্যকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিও না।

ক্র   বক্রভাব ভাল নয়।
গ্র   উগ্রতায় দুঃখ হয়।
ঘ্র   ব্যাঘ্র নাহি বশে থাকে।
জ্র   বজ্রসম সিংহ ডাকে।

(৩)

ত্র মিত্রসম পাত্র নাই।
দ্র ভদ্রলোক কোথা পাই।
ধ্র গৃধ্র পাখী মাংস খায়।
প্র বিপ্রজাতি দান পায়।
ভ্র শুভ্র বেশ পরিধান।
ম্র নম্র লোক পায় মান।
ব্র ব্রত করে মুনিগণ।
শ্র শ্রম করে কৃষি জন।
স্র সহস্র দানের ফল।
হ্র হ্রদের গভীর জল।

ক্ল শুক্লপক্ষের রজনী অতি মনোহর।
গ্ল পরের গ্লানি করা বড় দোষ।
প্ল জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া যায়।
ম্ল অধিক অম্ল খাইলে পীড়া হয়।
শ্ল শ্লাঘা করা উচিত নয়।
হ্ল মিত্রলাভে কাহার না আহ্লাদ হয়?

---

(৪)

ক্ক পক্ক ফল সুরস হয়।
গ্ব মূঢ়ের দিগ্বিদিক্ বোধ নাই।
ঘ্ব লঘ্বাহারে রোগ হয় না।
জ্ব জ্বর হইলে ঔষধ খাওয়া উচিত।
ট্ব ধনি লোকেরা খট্বায় শয়ন করে।
ত্ব আপন কাজে সত্বর হও।
থ্ব পৃথ্বী গোলাকার।
দ্ব বিদ্বান লোক আদরণীয় হয়।
ধ্ব বীণার ধ্বনি বড় মধুর।
ন্ব অন্বেষণ করিলে সকলি মিলিতে পারে।
ম্ব বিম্বফল পাকিলেই সুরস।
শ্ব আরব দেশে ভাল অশ্ব হয়।
স্ব রাজার রাজস্ব অবশ্য দেয়।
হ্ব কাপুরুষ শোকে বিহ্বল হয়।
ক্ষ্ব রঘুবংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকু।

গ্ন ভগ্ন গৃহে বাস করা অনুচিত।
ঘ্ন শুভ কাজের অনেক বিঘ্ন।

(৫)

ত্ন যত্ন করিলেই সকল সফল হয়।
প্ন সুনিদ্রায় স্বপ্ন হয় না।
ম্ন নিম্ন দিকেই জল যায়।
শ্ন অনুচিত প্রশ্ন করা অনুচিত।

ক্ম রুক্মিণী অতি গুণবতী ছিলেন।
গ্ম বাগ্মী লোক সভামান্য।
ঙ্ম বাঙ্ময় পড়িলে মূঢ়তা দূর হয়।
ট্ম কুট্মল ফুটিলেই সৌরভ পাওয়া যায়।
ণ্ম মৃণ্ময় পাত্র সকলেরই সুলভ।
ত্ম অধমেরা আত্মসুখে রত থাকে।
দ্ম পদ্মের সৌরভ অতি মনোহর।
ন্ম বিদ্যা না থাকিলে বৃথা জন্ম।
ল্ম গুল্মরোগ বড় দুঃখজনক।
ষ্ম ভীষ্মদেব মহাবীর ছিলেন।
শ্ম শ্মশান ভূমি অতি ভয়ানক।
স্ম অলৌকিক বিষয় দেখিলে বিস্ময় জন্মে।

---

(৬)

হ্মা ব্রহ্মোপাসনা করা সকলেরই উচিত।
ক্ষ্ম অপব্যয় করিলে লক্ষ্মীছাড়া হয়।

র্ক কর্কশ বচন সকলেরই অপ্রিয়।
র্খ মূর্খের অশেষ দোষ।
র্গ কুসংসর্গে নানা দোষ ঘটে।
র্ঘ দীর্ঘসূত্রির যত্ন সফল হয় না।
র্চ অনধিকার চর্চ্চা করা ভাল নয়।
র্ছ মূর্ছায় চেতনা নাহি থাকে।
র্জ মেঘের গর্জনে শিখী ডাকে।
র্ঝ নির্ঝর জল অতি শীতল।
র্ণ ধাতু মধ্যে সুবর্ণ মহামূল্য।
র্ত আর্ত জনে দয়া করা কর্ত্তব্য।
র্থ লোভ নানা অনর্থের মূল।
র্দ নির্দয় লোক পশুর সমান।
র্ধ নির্ধনের আদর নাই।
র্ন অসতের দুর্নাম ভয় নাই।
র্প সর্প নাহি মানে পোষ।

(৭)

র্ব দুর্ব্বলের বৃথা রোষ।
র্ভ কুজনের কথায় নির্ভর করিলে দুঃখ ঘটে।
র্ম ধর্ম্মের সদাই জয়।
র্য ধৈর্য্যগুণ বড় গুণ।
র্ল যথার্থ মিত্র অতি দুর্লভ।
র্ব গর্ব করা বড় দোষ।
র্শ পরামর্শ না করিয়া কিছুই করিবে না।
র্ষ অভিলষিত লাভে কাহার না হর্ষ হয়।
র্হ পরহিংসা অতি গর্হিত কর্ম্ম।

ঙ্ক অসতের কলঙ্ক ভয় নাই।
ঙ্খ সকল বিষয়েই শৃঙ্খলা থাকা ভাল।
ঙ্গ সৎসঙ্গের অশেষ গুণ।
ঙ্ঘ গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিও না।
ঞ্চ সঞ্চয়ী লোক অবসন্ন হয় না।
ঞ্ছ সকল বাঞ্ছা সফল হয় না।
ঞ্জ নয়নে অঞ্জন সাজে।
ঞ্ঝ নূপুর ঝঞ্ঝন বাজে।

---

(৮)

ণ্ট কুপুত্র কুলের কণ্টক।
ণ্ঠ কোকিলের কণ্ঠস্বর অতি মনোহর।
ণ্ড দোষ করিলে দণ্ড পায়।
ণ্ণ বিপদে বিষণ্ণ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ।
ন্ত শান্ত লোক সকলের প্রিয়।
ন্থ ধর্ম্মপথের পান্থ হও।
ন্দ মন্দ কথা পরিহর।
ন্ধ অন্ধ জনে দয়া কর।
ন্ন অন্নদান বড় দান।
ম্প সম্পদ্ বাড়ায় মান।
ম্ফ ব্যাঘ্রেরা লম্ফ দিয়া শীকার করে।
ম্ব বিনা সম্বলে পথ চলিবে না।
ম্ভ দাম্ভিক লোক সকলেরই অপ্রিয়।
ম্ম মূর্খের সম্মান নাই।
ঙ্ক্ষ আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই।

স্ক তস্করের ধর্ম্ম নাই।
ষ্ক শুষ্ক সরোবরে সারস থাকে না।

(৯)

স্খ কদাচ যেন বাক্যের স্খলন হয় না।
ষ্খ পরদুঃখে দুঃখী হও।
দ্গ তদ্গত মনে পাঠ কর।
দ্ঘ অন্যের দোষ উদ্ঘাটন করা বড় দোষ।
শ্চ নিশ্চয় না জানিয়া কিছু কহিও না।
শ্ছ মানির অপমান শিরশ্ছেদন তুল্য।
ব্জ কাণ খঞ্জ কুব্জ দেখিয়া উপহাস করিও না
জ্ঞ অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করা উচিত।
ষ্ট দুষ্ট লোকের চিরকাল কষ্ট থাকে।
ষ্ঠ প, ফ, ব, ভ, ম, ইহারা ওষ্ঠ বর্ণ।
ষ্ণু সহিষ্ণু লোক বিপদে অবসন্ন হয় না।
স্ত ঘসিতে ঘসিতে প্রস্তরও ক্ষয় পায়।
স্থ. যাহার শরীর সুস্থ সে সদা সুখী।
ব্দ অপশব্দ ব্যবহার করিও না।
ব্ধ লব্ধ ধন রক্ষা না করিয়া অলব্ধ লাভের চেষ্টা উচিত নয়।
হ্ন মধ্যাহ্নের কাজ মধ্যাহ্নে সার।

---

(১০)

হ্ণ অপরাহ্ণের কার্য্য অপরাহ্ণে সার।
স্প পরের দ্রব্য স্পর্শ করিও না।
ষ্প সুগন্ধি পুষ্প কাহার না মন হরে?
স্ফ বৃথা আস্ফালন করা অসারের কর্ম্ম।
ষ্ফ যত্ন কখনও নিষ্ফল হয় না।
দ্ব জ্ঞানের উদ্বোধ না হইলে হিতাহিত বোধ হয় না।
দ্ভ হিমালয় হইতে গঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে।

ক্ক, চ্চ প্রভাতে কুক্কুট ডাকে, উচ্চ রব তার।
চ্ছ,জ্জ ইচ্ছামত কর শিশু সজ্জা আপনার।
জ্ঝ কুজ্ঝটিকা জলে অঙ্গ ভিজে যায় পাছে।
ট্ট অট্টালিকা মধ্যে থাক জননীর কাছে।
ড্ড প্রভাতে ছাড়িয়া আড্ডা পান্থগণ যায়।
ত্ত মধুপানে মত্ত অলি গুণগুণ গায়।
ত্থ, দ্দ তমোনাশ উদ্দেশিয়া উত্থান রবির।
ল্ল পল্লবে পল্লবে পড়ে নিশির শিশির।

(১১)

ল্ক শ্রীরামেরও জটা বল্কল ধারণ করিতে হইয়াছিল।
ল্গ ফাল্গুন মাসে বসন্ত ঋতুর উদয় হয়।
ন্ট প্রথমে যাহা কহিবে তাহার উল্টা কহিও না।
ল্প পাঠের সময় গল্প করিও না।
ল্ফ গুল্ফদেশে বেদনা হইলে চলিতে পারা যায় না।
লভ প্রগলভতা করা বড় দোষ।
গ্দ বাগ্দান করিয়া পরে নিরাশ করিও না।
গ্ধ দুগ্ধদান দুর্ব্বলের বড় পথ্য।
ঞ্চ্র যাচ্ঞা করিলে মান যায়।
দ্ধ গুরুবচনে শ্রদ্ধা করিও।
ড়্গ কাহারও উপর খড়্গহস্ত হইও না।
ক্ত ভক্ত ব্যক্তির প্রতি স্নেহ করিবে।
প্ত পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইও না।
ক্ষ্ণ তীক্ষ্ণবুদ্ধির অগোচর কি আছে?

---

(১২)

জ্জ্ব সুবর্ণের বর্ণ অতি উজ্জ্বল।
ত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞান না হইলে একেবারে দুঃখ দূর হয় না।
র্দ্ধ ঊর্দ্ধমুখে পথ চলিও না।
ন্দ্ব কাহারও সহিত দ্বন্দ্ব করিও না।
ন্ত্র মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।
ন্ত্ব শোকাকুল ব্যক্তিকে সান্ত্বনা কর।
ম্ভ্র মান্যজনকে দেখিয়া সম্ভ্রম করা উচিত।
ষ্ট্র উষ্ট্র ব্যতিরেকে মরু ভূমিতে যাইবার অন্য উপায় নাই।
ষ্ক্র শিক্ষকের নিকটে শিষ্য যে উপকার পায় তাহার নিষ্ক্রয় নাই।
ষ্প্র দুষ্প্রাপ্য বিষয়ে আশা করা অনুচিত।
স্ত্র স্ত্রী লোকের বিদ্যাশিক্ষা করা আবশ্যক।

(১৩)

মাধবের সদ্ব্যবহার।

শুন মাধব, আজি কেন তোমার পাঠশালা হইতে আসিতে এত বিলম্ব হইল? ছুটীর পরে বুঝি সেখানে খেলা করিতেছিলে?

না, মা! খেলা করি নাই, ছুটীর পরে আমি আর গোপাল দুই জনে একত্র আসিতেছিলাম, চৌমাথার কাছে একটি ছোট বালক রোদন করিতে২ যাইতেছে দেখিয়া ভাবিলাম ইহার বয়স চারি বৎসর সঙ্গে কেহ নাই অবশ্যই পথহারা হইয়া কান্দিতেছে।

পরে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে আরও কান্দিতে লাগিল। আমরা তাহার চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলাম, ভয় কি ভাই? তোমার বাড়ী কোথায় বল, এখনি আমরা তোমাকে বাটীতে পঁহুছিয়া দিব।

সে ভাল করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল এইমাত্র কহিল, আমি ঘোষালদের বাড়ীর ছেলে, আমার বাবার নাম হরনাথ, আমাদের বাড়ীর সম্মুখে বড় পুকুর আছে।

---

(১৪)

ইহা শুনিয়া আমরা কিছুই ঠিকানা করিতে পারিলাম না। দৈবাৎ সেই স্থান দিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন, তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, আমরা সঙ্গে আইস, ঘোষালদের বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি।

আমরা সেই বৃদ্ধের সঙ্গে২ কিঞ্চিৎ উত্তর মুখে গমন করিলাম। কতক দূর গিয়া তিনি কহিলেন, এই গলি ধরিয়া যাও। খানিক পরেই হরনাথ ঘোষালের বাড়ী। আমরা সেই গলির ভিতর কিঞ্চিৎ গিয়া একটা পুকুর দেখিতে পাইলাম।

তখন সেই বালক "এই আমাদের বাড়ী" বলিয়া সহাস্য মুখে ভিতরে প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া এই আসিতেছি। এই জন্যেই এত বিলম্ব হইল।

মাতা এই কথা শুনিয়া কহিলেন, মাধব, তোমার এত দূর পর্য্যন্ত বোধ জন্মিয়াছে, ইহাতে আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম।

(১৫)

সপ্তবার।

১ রবি। ২ সোম। ৩ মঙ্গল। ৪ বুধ। ৫ বৃহস্পতি। ৬ শুক্র। ৭ শনি।

দ্বাদশ মাস।

১ বৈশাখ। ২ জ্যৈষ্ঠ। ৩ আষাঢ়। ৪ শ্রাবণ। ৫ ভাদ্র। ৬ আশ্বিন। ৭ কার্ত্তিক। ৮ অগ্রহায়ণ। ৯ পৌষ। ১০ মাঘ। ১১ ফাল্গুন। ১২ চৈত্র।

ছয় ঋতু।

১ গ্রীষ্ম। ২ বর্ষা। ৩ শরৎ। ৪ হেমন্ত। ৫ শীত। ৬ বসন্ত।

গ্রীষ্ম।

বারো মাসের মধ্যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল। এই কালে সূর্য্যের তেজ বড় তীক্ষ্ণ হয়। জলাশয়ের জল শুকাইয়া যায়। দিনের বেলায় রৌদ্রের জন্য ঘরের বাহির হওয়া যায় না। অনবরত শরীরে ঘাম হয়। সর্ব্বদা পিপাসা পায়। শরীর জুড়াইবার জন্যে সকল জীব জন্তু শীতল স্থানে বাস করিতে বাসনা করে। দক্ষিণ দিক

(১৬)

হইতে বেগে বায়ু বহিতে থাকে, মধ্যে মধ্যে অপরাহ্ণে ঝড় জল বজ্রপাত হয়, এবং আম জাম কাঁঠাল প্রভৃতি নানাবিধ ফল পাকে। এই কালে দিন বাড়ে রাত্রি ছোট হয়।

হে বালক বালিকাগণ, তোমরা গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় ঘরের বাহির হইও না। বিকাল বেলায়, যখন মাটী ও বায়ু শীতল হইয়াছে দেখিবে, তখন মাঠে গিয়া খেলা করিবে ও বেড়িয়া বেড়াইবে।

বর্ষা।

আষাঢ় শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল। এই কালে আকাশ প্রায় মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। সর্ব্বদা অতিশয় বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জন হয়। নদ নদী খাল বিল পুকুর প্রভৃতি সকল জলাশয় জলে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। পথ ঘাট কাদা হইয়া যায়; পথিক লোকের যাতায়াত করা কঠিন হইয়া উঠে।

এই সময়ে ভেকগণের বড় আনন্দ; ইহারা নূতন জল পাইয়া নানা রঙ্গে খেলা করে ও উচ্চস্বরে ডাকিতে থাকে। ময়ূর ময়ূরী মেঘ দেখিয়া আহ্লাদে পেকম ধরিয়া নাচিয়া বেড়ায়। কেতক ও কদম্ব পুষ্প ফুটিয়া গন্ধে চারিদিক আমোদিত

(১৭)

করে, এবং আতা পেয়ারা আনারস প্রভৃতি সুখাদ্য ফল সকল পাকে। চাসী লোকেরা মাঠে মাঠে ধান্য রোপণ করিতে থাকে।

এই কালে পূর্ব্বদিক হইতে অহিতকারী বায়ু বহে। হে শিশুগণ, সেই বায়ু শরীরে লাগাইলে এবং বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাদায় কাদায় বেড়াইলে কফ কাশী জ্বর জ্বালা অনায়াসে হইতে পারে।

শরৎ।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে শরৎকাল হয়। এই কালে আকাশমণ্ডল ও দিক্ সকল পরিষ্কৃত হইতে থাকে। সূর্য্যের কিরণ খরতর হয়। পথের কাদা ও ভূমির জল প্রায় শুকাইয়া যায়। নদ নদীর জল নির্ম্মল হয়। চন্দ্র ও তারাগণের জ্যোতি উজ্জ্বল হওয়াতে রাত্রিকালে আকাশের বড় শোভা হয়। কমল কুমুদ প্রভৃতি জলপুষ্প এই সময়ে প্রস্ফুটিত হইয়া জলাশয়ের শোভা করে। হংস বক চক্রবাক সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষী আনন্দে কেলি করিতে থাকে। লেবু নারীকেল তাল সুপারী প্রভৃতি নানাবিধ ফল পরিপক্ক হইয়া বৃক্ষের শোভা বৃদ্ধি করে।

---

(১৮)

এই সময়ে সমুদায় মাঠ ধানের গাছে পরিপূর্ণ দেখিয়া নয়নের বড় প্রীতি জন্মে। হে শিশুগণ, সকালে ও বিকালে যদি মাঠের দিকে বেড়াইতে যাও, তবে ধান্যের শোভা দেখিয়া বড় আহ্লাদ পাইবে। শরৎকালের রৌদ্র বড় উগ্র ও অপকারক, কদাচ শরীরে লাগাইও না।

হেমন্ত।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ দুই মাস হেমন্ত। এই কালে উত্তর দিক হইতে অল্প অল্প শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়, এবং অল্প অল্প শীত অনুভব হইতে থাকে। রাত্রিকালে এত হিম পড়ে যে প্রভাতে বোধ হয় যেন বৃষ্টি হইয়াছে।

এই কালে মনুষ্যেরা শীত বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। দিনের পরিমাণ অল্প হইতে থাকে এবং রাত্রির পরিমাণ ক্রমে ক্রমে অধিক হয়। রৌদ্রের তেজ হ্রাস হইয়া যায়, হেমন্ত কালে ক্ষেত্রের ধান্য পাকিয়া উঠে।

হে শিশুগণ, হেমন্তকালের হিম শরীরে লাগিলে বড় পীড়া হয়, অতএব শীতবস্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা শরীর ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(১৯)

শীত।

হেমন্তের পর পৌষ ও মাঘ মাসে শীতকাল আগত হয়। উত্তরের বায়ু যত বেগে বহিতে থাকে ততই শীতের বৃদ্ধি হয়। রাত্রিকালে মনুষ্যেরা শীত নিবারণের জন্যে লেপ কাঁথা কম্বল ব্যবহার করিয়া থাকে। দিবসেও শাল রুমাল বনাত লুই পাছুড়ি প্রভৃতি শীত বস্ত্র গায় না দিলে শীত ভাঙ্গে না, কোন ব্যক্তিই জলের ত্রিসীমানায় যাইতে চায় না, কেবল আগুনের তাত ও রৌদ্রের উত্তাপ ভাল লাগে।

রাত্রিকালে আকাশ মণ্ডল ধূমে ও শিশিরে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। চন্দ্র ও তারাগণের প্রভা মলিন দেখায়। এই সময়ে রাত্রি অনেক বড় হয়, দিন একেবারে ছোট হইয়া যায়। মুগ মটর মাষকলাই রাই শরিষা প্রভৃতি রবি খন্দ শিশিরের জল পাইয়া প্রস্তুত হয়। কিন্তু পদ্ম আদি জলপুষ্প একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকালে কুজ্ঝটিকা হইয়া থাকে। শীতকালে সকল লোকেই অতিশয় পরিশ্রম করিতে পারে, অথচ ক্লেশ বোধ হয় না।

---

(২০)

বসন্ত।

ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্তকাল। এই সময়ে দক্ষিণ দিক্ হইতে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে থাকে। আকাশ মণ্ডল নির্ম্মল ও সূর্য্যের তেজ তীক্ষ্ণ হয়। এবং চন্দ্র ও তারাগণের আলোক উজ্জ্বল হয়। সমুদয় তরু ও লতার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হয়। কাহারো নূতন পল্লব কাহারো মুকুল কাহারো মঞ্জরী কাহারো ফুল কাহারো ফল উৎপন্ন হইতে থাকে। পুষ্পের মধু পান করিবার অভিলাষে ভ্রমর ও মধুমক্ষিকাগণ এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে উড়িয়া উড়িয়া বসিতে থাকে। পক্ষিগণ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া আহ্লাদে মধুর স্বরে গান করে। বসন্তকাল সকল কাল অপেক্ষা উত্তম। এই কালে না শীত না গ্রীষ্ম না বৃষ্টি না শিশির কিছুই থাকে না। সুতরাং সকল প্রকার জীবজন্তু আনন্দে কাল যাপন করে।

সম্পূর্ণ।

THE

INFANT TEACHER.

PART III.

COMPILED FOR THE USE OF

FEMALE SCHOOLS IN BENGAL.

BY

MODUN MOHUN TURKALUNKAR,

CALCUTTA

PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS

1850.

তৃতীয় ভাগ

বধূ পাঠ

এতদ্দেশীয় বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ

শ্রীযুত মদনমোহন শর্ম্ম তর্কালঙ্কার

প্রণীত

কলিকাতা

সংস্কৃতযন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯০৭

মুখবন্ধ।

শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণপরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানাবিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল।

কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ নির্ম্মল চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; এ নিমিত্ত, হংসীর স্বর্ণডিম্বপ্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাসনিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থালী ও কাষ্ঠভারদর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন, পুরস্কারলোভে বক কর্ত্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয় মধুর স্বর পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বদ্ধ অবাস্তবিক বিষয়সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।

কলিকাতা।

১৬ই ভাদ্র। ১৭৭২ শকাব্দাঃ

শিশুশিক্ষা

তৃতীয় ভাগ

ঋজুপাঠ

সুশীল শিশুকে সকলে ভাল বাসে।

সুশীল ও সুবোধ বালক সর্ব্বদা লেখা পড়া করে। সারা দিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। পাঠের সময় সে যেমন পাঠ বলিতে পারে আর কেহই তেমন পারে না। এজন্য গুরু মহাশয় তাহার উপর বড় সন্তুষ্ট থাকেন। সে কখন মন্দ কর্ম্ম করে না ও মন্দ কথা মুখে আনে না। গুরু লোকেরা তাহাকে যাহা কহেন সে তাহাই করে। কদাচ কথার অবাধ্য হয় না। তাহাকে যে কর্ম্ম করিতে একবার নিষেধ করা যায় তাহা কখন করে না। সুতরাং সে সকলের প্রিয় হয়।

---

(২)

দুরন্ত বালককে কেহ দেখিতে পারে না।

বেণী বড় দুরন্ত বালক। সে কাহারও কথা শুনে না। অতিশয় অনাবিষ্ট। একবারও লেখা পড়া করে না। কেবল খেলিয়া বেড়ায়। পাঠশালা হইতে ঘরে গিয়া পাঠের পুথি কোথায় ফেলিয়া রাখে পর দিন তাহা খুঁজিয়া পায় না। বাড়ীতে যত ক্ষণ থাকে কেবল গোলমাল করিয়া সকলকে বিরক্ত করে। বেণীর মাতা বেণীর জন্যে নানাপ্রকার খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, বেণী বাড়ী আসিয়া সে সকল ফেলিয়া ছড়িয়া দেয়। এবং ইহা দাও, উহা দাও, ক্ষীর কৈ, মিঠাই কৈ, বলিয়া মাকে কটু কহে ও মারিতে যায়।

বেণীকে কেহ ভাল বাসে না। বেণী সকলকে গালি দেয় ও সকলের সঙ্গে ঝকড়া করে, এজন্য কোন বালক তাহার সঙ্গে খেলা করিতে চায় না। গুরু মহাশয় প্রতিদিন তিরস্কার করেন তবু একটি দিনও পাঠ বলিতে পারে না। কেমন মাধব! তুমি শুনিয়াছ গুরু মহাশয় সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, বেণীর বিদ্যা হবে না চিরকাল

(৩)

মূর্খ থাকিবে ও দুঃখ পাবে। দেখিও তুমি যেন বেণীর মত হইও না।

পরের দ্রব্যে লোভ করিও না।

এক দিন পাঠশালার ছুটীর পর সকলে চলিয়া গেলে, গোপাল যেমন নীচে নামিতে ছিল; সিড়ীর নীচে এক ছড়া সোণার হার পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইল। অমনি তাহা কুড়িয়া লইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কোন অসাবধান বালক ইহা ফেলিয়া গিয়া থাকিবেক। আমি এখন কি করি। যদি দ্বারবানের কাছে রাখিয়া যাই, কি জানি, সে ছোট লোক সোণার লোভে পাছে অপলাপ করে। অতএব মার কাছে লইয়া যাই। তিনি যা বলেন, তাই করিব।

গোপাল বাড়ী আসিয়া প্রথমেই মার নিকটে গেল, এবং সেই হার দেখাইয়া কহিল। দেখ মা! কোন অবোধ বালক পাঠশালায় এই হার ফেলিয়া গিয়াছে। হায়! সে বাড়ী গিয়া কত দুঃখ পাইতেছে। পিতা তিরস্কার করিতেছেন,

---

(৪)

মা গালাগালি দিতেছেন, অন্যেরা অসাবধান নির্ব্বোধ বলিয়া কত নিন্দা করিতেছে। আহা! তাহারা সকলেই মনে করিতেছে, হার আর পাওয়া যাইবে না, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, কে পাইয়াছে। দেখ মা! এই সময় যদি আমি এই হার লইয়া তাহাদিগকে দিতে পারিতাম, না জানি, তাহাদের কতই আহ্লাদ হইত।

গোপালের মাতা গোপালের মুখে এই সব কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং গোপালকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, বাছা গোপাল তোমার এত দুর বোধ হইয়াছে! পরের দ্রব্য লইতে নাই, ইহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ! ভাল, ভাল, হার এখন আমার কাছে থাকুক, কালি সকালে পাঠশালা যাইবার সময় লইয়া যাইও। এবং এই সকল কথা কহিয়া গুরু মহাশয়ের হাতে দিও। তিনি যাহার হার তাহাকে দিবেন। পরদিন গোপাল তাহাই করিল। পাঠশালার সকল লোক গোপালের প্রশংসা করিতে লাগিল।

---

(৫)

সুশীল বালক বালিকা সকলকে সমান ভাল বাসে।

রাখাল! তুমি ঘোষালদের সামা বামাকে দেখিয়াছ? আমি তাহাদের গুণের কথা শুনিয়া দুই তিন দিন দেখিতে গিয়াছিলাম। আহা! তাহাদের যেমন রূপ তেমনি গুণ। দুটী বইনে কেমন ভাব। কেহ কাহাকে উচ্চ কথাটী কয় না। মুখে সদাই হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। দুজনে একত্রে শয়ন করে, একত্রে ভোজন করে, এক সঙ্গে বেড়ায়, এক সঙ্গে খেলা করে। কেহ কাহারো কাছ ছাড়া হয় না।

আমি যতবার সামা বামাকে দেখিয়াছি, কখন তাহাদের মলিন বেশ দেখি নাই। চুল গুলি পরিষ্কার, শরীরে মলা (ময়লা) নাই, দাঁতগুলি পরিচ্ছন্ন। তাহাদের গুণের কথা কি কহিব, রাগ করিয়া দাস দাসীকেও কটু কথা কয় না। তুমি বই তুই বাক্য মুখে আনে না। সামাটী বয়সে বড় বটে কিন্তু বামাকে না বলিয়া কোন কাজ করে না। বামাও, দিদি যা বলেন, তাই করে। কখন কোন বিষয় লইয়া দুজনের ঝকড়া কলহ হয় না। তাহাদের দুটীকে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।

---

(৬)

সামা কোন খাবার দ্রব্য পাইলে বামাকে না দিয়া খায় না। এইরূপ বামাও সামাকে না দিয়া একলা খায় না। এক দিন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সামা মার নিকট একটী কমলা লেবু পাইয়াছিল। বামা তখন বাড়ী ছিল না বলিয়া তার জন্যে আধখানি রাখিয়া আধখানি আপনি খাইল। দেখ রাখাল! ইহারা দুটী ভগিনী কেমন সুখে আছে। ইহাদের পিতা মাতা কত সুখী।

অন্ধজনে দয়া কর।

মা! আমাদের বাড়ীর দ্বারে একটী বৃদ্ধ আসিয়াছে। সে অন্ধ, দুটী চক্ষুহীন, কিছুই দেখিতে পায় না। একটী ছোট ছেলে হাত ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার শরীর শীর্ণ, পরিধান এক খানি জীর্ণ বস্ত্র তাহাও অতিশয় মলিন। বৃদ্ধ যখন আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল আমি যে সেখানে দাঁড়িয়া ছিলাম তাহাও সে টের পাইল না। হাঁ গো মা। ও কি কিছুই দেখিতে পায় না? তবেত উহার বড় দুঃখ। ঐ অন্ধ এমন শীর্ণ কেন? উহার কি খাবার যো নাই? ভাল কাপড় নাই?

(৭)

না বাছা, অন্ধ দীন দুঃখী কোথায় পাবে।

ভাল, কাহারও বাড়ীতে কেন চাকরী করে না? তা হলেত এত দুঃখ পাইত না।

হা বাছা! কেমন করিয়া চাকরী করিবে। যাহার চক্ষু নাই তাহার যে কিছুই নাই। চক্ষু মনুষ্যের পরম ধন। চক্ষু না থাকিলে দেখিতে পায় না, কর্ম্ম কাজ করিতে পারে না। তাহাতে আবার বৃদ্ধ হইয়াছে, বোধ করি উহাকে খেতে পরিতে দেয় এমত কেহ নাই; সুতরাং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দুঃখে কালযাপন করে।

মা! তবে উহাকে একখানি কাপড় আর চারিটি পয়সা দাও।

রাখালের এইরূপ দয়া দেখিয়া মাতা আহ্লাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ একখানী বস্ত্র, ও চারিটি পয়সা দিলেন। অন্ধ পাইয়া আনন্দে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

নির্দ্দয় লোক পশুর সমান।

দেখ রাখাল! ইহারি নাম বট গাছ। কল্য তোমাকে ইহারি কথা কহিয়াছিলাম। কেমন!

---

(৮)

সমুদায় বাগান শোভা করিয়া রহিয়াছে কি না। এই গাছের তল কেমন শীতল। ইহার ছায়াতে বসিলে রৌদ্রের তাপ কিছু মাত্র বোধ হয় না। কেমন ঘন ঘন পাতা। চল উহার ছায়ায় গিয়া বসি। রৌদ্রের সময় পক্ষী সকল ডালে বসিয়া গান করিতেছে শুনিতে পাইব।

দেখ, দেখ, ঐ বড় ডালের পাশ দিয়া চেয়ে দেখ। বোধ হয় যেন, আগডালের পাতার মধ্যে একজন মানুষ নড়িতেছে। হাঁ, সত্য বটে, একটি বালক। ও কি করিতেছে? দেখ, ও এমন চুপে চুপে যাইতেছে কেন? আমার বোধ হয়, ঐ পাখীর বাসা হইতে পাখীর ছানা পাড়িতে যাইতেছে। হাঁ, আমি উহাকে চিনি, ও ছোঁড়া বড় নির্দ্দয়। দিনের বেলায় কেবল এই রূপে গাছে গাছে পাখীর ছানা পাড়িয়া বেড়ায়। এবং কাহারো পায় কাহারো ডানায় দড়ী বাঁধিয়া টানাটানি করে।

উহার সঙ্গে আরো দুই ছোঁড়া বেড়ায়। তাহারা আরও নিষ্ঠুর কৌতুক দেখিবার জন্যে কোন পাখীর পা ভাঙ্গিয়া দেয়, কোন পাখীর

(৯)

ডানা কাটিয়া ফেলে। পাখী গুলি যাতনায় ধড় ফড় করে, ইহারা আনন্দে হাত তালি দিয়া হাসিতে থাকে। খেলা সাঙ্গ হইলে ঐ সকল পাখী কুকুর দিয়া খাওয়ায়। এইরূপে নিত্য নূতন নূতন পাখী আনিয়া নষ্ট করে।

আ, হা, হা, কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর! ঐ পামর গুলার পানে তাকাইলেও পাপ হয়। যে সকল জীব দুর্ব্বল, কথা কহিতে পারে না তাহাদিগকে এইরূপে অকারণে যাতনা দেওয়া বড় নিষ্ঠুরের কর্ম্ম। ভাল উহাদিগের কি মা বাপ নাই? কেহ শাসনকর্ত্তা নাই? যে নিবারণ করে। চল এখান হইতে চল। আর এখানে থাকা যায় না, দেখিয়া বড় দুঃখ হইতেছে।

মিথ্যা কথার অনেক দোষ

যে বালক সর্ব্বদা মিথ্যা কহে তাহার কথায় পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহই বিশ্বাস করে না। সে যদি কখন সত্য কহে তাহাও মিথ্যা মনে করিয়া সকলে অশ্রদ্ধা করে। মিথ্যাবাদী মিছা কহিয়া, একবার দুইবার না হয় তিনিবার পার

---

(১০)

পাইতে পারে, কিন্তু একবার ধরা পড়িলে আর কেহ তাহার কথায় প্রত্যয় করে না।

হরিহর নামে এক বালক গুরু মহাশয়ের নিকট, মার পীড়া হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা করিয়া মধ্যে মধ্যে ছুটী লইত। এক দিন তাহার সেই মিথ্যা ধরা পড়িল। গুরু মহাশয় সেই অবধি তাহাকে আর কখন ছুটী দিতেন না।

মিথ্যাবাদী বালককে কেহ ভাল বাসে না। শিক্ষকেরা তাহাকে ঘৃণা করেন। অধিক কি বলিব, সে দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইলেও কেহ তাহার দুঃখে দুঃখী হয় না; এবং তাহার কান্না দেখিয়া কাহারও দয়া হয় না।

কৃষ্ণদাস নামে এক রাখাল কোন বনের ধারে গরু চরাইত। একদিন সে তামাসা দেখিবার জন্যে এই বলিয়া মিছামিছি চেচাইতে লাগিল (ভাইরে কে কোথায় আছ দৌড়িয়া আইস আমার পালে বাঘ পড়িয়াছে।) নিকটে কৃষকেরা চাস করিতেছিল, রাখালের চীৎকার শুনিয়া সকলে দৌড়িয়া আসিল; দেখিল বাঘ নাই, বালক হী হী করিয়া হাসিতেছে। তখন তাহারা

রাখালের তামাসা বুঝিতে পারিয়া গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। দুর্ব্বুদ্ধি রাখাল মধ্যে মধ্যে এইরূপ মিথ্যা চীৎকার করিয়া কৃষকদিগকে ডাকিত ও কৌতুক দেখিত।

দৈবাৎ এক দিন সত্য সত্যই বাঘ আসিয়া গরুর পালে পড়িল। রাখাল বালক বাঘ আসিয়াছে বলিয়া বার বার চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সে দিন কেহই আসিল না। সকলেই মনে করিল মিছামিছি ডাকিতেছে। তখন বাঘ পালের গরু নষ্ট করিয়া মিথ্যাবাদী রাখালের ঘাড় ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেল।

চুরি করা বড় দোষ।

দেখ গোপাল! ঐ যে বেড়ী পায়, গৌরবর্ণ, যুবা পুরুষ, মাটী কাটিয়া পথ বাঁধিতেছে। ও কে, তুমি জানিতে চাও? তবে শুন।

ঐ হতভাগা তোমাদের পাঠশালাতেই পাঠ করিত। সকলে উহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসাও করিত। কিন্তু চিরকালই এক পাঠিদিগের ছুরী, কাঁচী, কাগজ, কলম, পয়সা চুরি করিয়া

বাড়ী লইয়া যাইত। উহার মা বাপ জানিয়া শুনিয়াও বারণ করিত না। ক্রমে ক্রমে উহার এমন কু অভ্যাস জন্মিল যে কাহার কোন ভাল বস্তু দেখিলে চুরি করিতে ইচ্ছা হইত। এবং সুযোগ পাইলে চুরিও করিত।

ঐ ব্যক্তি এক দিন বৈকালে এক মণিকারের দোকানে উপস্থিত হইল। দেখিল নানাবিধ মনোহর বস্তু সারি সারি সাজান রহিয়াছে। দেখিবা মাত্রেই কু-অভ্যাস বশতঃ চুরি করিতে ইচ্ছা করিল। তখন এক বার এ দিক এক বার ও দিক বেড়িয়া চেড়িয়া সুযোগ পাইয়া একটা সোণার ঘড়ী চুরি করিল।

ঘড়ী চুরি করিয়া তাড়াতাড়ি যেমন বাহিরে যাইতেছিল, অমনি দোকানের এক জন লোক উহাকে ধরিল। এবং জিজ্ঞাসা করিল তুমি চুপে চুপে ঘড়ী লইয়া পলাইতেছ কেন? চোর উত্তর করিল এ ঘড়ী তোমাদের নয়। আমি আর এক দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়াছি। কিন্তু ঐ নির্ব্বোধ জানিত না যে ঘড়ীর ভিতর ঐ মণিকারের নাম ক্ষোদা আছে। দোকানের লোকেরা

(১৩)

ঘড়ী খুলিয়া উহাকে সেই নাম দেখাইল। এবং তৎক্ষণাৎ চোর বলিয়া বিচারালয়ে পাঠাইয়া দিল। বিচারকর্ত্তা বিচার করিয়া এই দণ্ড দিয়াছেন।

দেখ গোপাল! এই অভাগা যদি চুরি করিতে না শিখিত, তবে এতদিনে এক জন বিদ্বান হইত এবং কত সুখে কাল কাটাইতে পারিত। এখন উহার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, উহার সঙ্গে কথা কহিতেও আমাদিগের ঘৃণা হয়। চুরি করিলে সকলেরি এই রূপ দুর্দ্দশা ঘটে।

চন্দ্র অতি বৃহৎ, গোল, নিজে তেজোময় নয়।

আর রৌদ্র নাই, আমার সঙ্গে তোমরা কে কে বেড়াইতে যাবে আইস। চল গঙ্গা তীরে ঐ ঘাসের উপর বেড়িয়া বেড়াই। আজি পূর্ণিমা তিথি, ঐ দেখ অশ্বত্থ গাছের ভিতর দিয়া দেখ, পূর্ণচন্দ্র উদয় হইতেছে। এখন কত বড় দেখাইতেছে! আর খানিক উপরে উঠিলে এত বড় দেখাবে না।

তোমরা বোধ করিতেছ, চন্দ্র একটী ছোট বস্তু, এক খানি বালার মত। কিন্তু তা নয়, অনেক দূরে

---

(১৪)

আছে বলিয়া এমন ছোট দেখাইতেছে। নিকটে যে বস্তু বড় দেখিতে পাও তাহা দূরে থাকিলে ছোট বোধ হয়। ঐ দেখ, এখনি আমাদের নিকট দিয়া যে লোকটী চলিয়া গেল, উহাকে বালকের মত ছোট বোধ হইতেছে। তবু এখনও অনেক দূরে যায় নাই। তোমরা খানিক দূর যাও দেখি, আমার হাতের এই পাতাটী কত ছোট দেখিবে। কেমন, ছোট দেখাইতেছে কি না? আর খানিক যাও আরও ছোট দেখিবে।

চন্দ্র অতি বৃহৎ ও গোল। উহার উপর কত কত পাহাড় পর্ব্বত আছে। দূরের জন্যে দেখা যায় না। দূরবীণ দিয়া দেখিলে সকল স্পষ্ট দেখা যায়। চন্দ্র ঠিক এই পৃথিবীর মত। যেমন উজ্জ্বল দেখিতেছ সেরূপ নয়। সূর্য্যের আলো পড়িয়া অমন উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রের উপর হইতে দেখিলে এই পৃথিবীও ঐরূপ উজ্জ্বল বোধ হয়।

পেঁচা রাত্রিকালে চরিয়া বেড়ায়।

ছোট ছেলের কান্নার মত অশ্বত্থগাছে ও কি শব্দ শুনা যাইতেছে? বোধ করি তোমরা জান

(১৫)

না। পেচা ডাকিতেছে। দেখ দেখ! ডালের আগায় উঠিয়া বসিল, ডানা মেলিতেছে, এখনি উড়িবে, ঐ উড়িয়া গেল। প্রথমে বার কতক ডানা নাড়িয়া, এখন বাতাসে ভর দিয়া কেমন ধীরে ধীরে যাইতেছে। ইঁদূর ও ছোট ছোট পাখী ধরিয়া খাবে এই জন্যে ভূমির নিকট দিয়া যাইতেছে।

আমরা যেমন আহার করি, গান গাই, বেড়িয়া বেড়াই, পাখি সকলও দিনের বেলায় সেইরূপ করিয়া থাকে। রাত্রি হইলে আপন আপন বাসায় ডানা গুটাইয়া নিদ্রা যায়। কিন্তু পেঁচার সকলি উল্টা। ইহারা দিনে নিদ্রা যায় রাত্রি কালে চরিয়া বেড়ায়। সূর্য্যের আলো ইহার চক্ষে সয় না, এবং ছোট ছোট পাখী ইহাকে দেখিলে ঠুকরিয়া বিরক্ত করে, এ জন্যে দিনের বেলায় বাহির হয় না। পেঁচা অন্ধকারে থাকে, কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপও ভাল বাসে। যখন শীত পায় তখন গাছের কোটরে ভাঙা দেয়ালের ফাটলে রৌদ্রের উত্তাপে সুখে নিদ্রা যায়।

---

(১৬)

পেঁচা মনুষ্যের হিতকারী। ইহারা ইঁদূর ধরিয়া খায়, তাহাতে লোকের ধান চাল অপচয় হয় না।

ভেক শীতকালে কেবল নিদ্রা যায়।

তোমরা শুনিতে পাইতেছ, পুকুরে বেঙ ডাকিতেছে। আজি রাত্রে বড় উচ্চ রব করিতেছে। যে প্রকার ডাকিছে, বোধ হয় শীঘ্র জল হবে। আমি শুনিয়াছি, এক জন লোক একটা বেঙ পুষিয়াছিল। ঐ বেঙ সেই ব্যক্তিকে জল হইবে কি না বলিয়া দিত। বেঙ কিছু কথা কহিতে পারে না। কিন্তু যখন অনেকক্ষণ ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিত, তখন ঐ ব্যক্তি বুঝিতে পারিত শীঘ্র জল হইবে।

বেঙ পেঁচার মত দিনের বেলায় অন্ধকার গর্ত্তে চুপ করিয়া থাকে। রাত্রি হইলে বাহির হয়। বৃষ্টির সময় দিনের বেলায়ও বাহির হয়। বেঙ জলেও থাকে, স্থলেও থাকে। বেঙের পায়ের আঙুল, হাঁসের আঙুলের মত, চামড়া দিয়া জোড়া; এজন্য সাঁতার দিতে পারে। কাক

(১৭)

ও সালিকের আঙুল জোড়া নয়, সুতরাং তাহারা সাঁতার দিতে পারে না। বেঙ পুকুরে থাকিতে যেমন ভাল বাসে এমন আর কোথাও নয়। যখন সূর্য্যের তেজ বড় খরতর হয় তখন বেঙ পুকুরের শীতল জলে সুখে বাস করে। শীতকালে পুকুরের জল বড় শীতল হয়। তখন তাহারা জল ছাড়িয়া, পাঁকের ভিতর কিম্বা গর্ত্তের মধ্যে গিয়া, শুইয়া থাকে। এইভাবে তিন চারি মাস ঘুমায়। ঐ সময়ে তাহারা একবারও নড়ে চড়ে না, কিছু খায় না। যদি কেহ খোঁচা মারে কিম্বা পা কাটিয়া দেয় তবুও ঘুম ভাঙে না।

যখন বসন্তকাল আইসে, সূর্য্যের তেজ তীক্ষ্ণ হইতে থাকে, তখন ভেকদিগের দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হয়। জাগিয়া আহার অন্বেষণ করে, থপ্ থপ্ করিয়া বেড়ায়, এবং পূর্ব্বের মত আনন্দে খেলা করিতে থাকে।

এই সময়ে ইহারা ডিম পাড়ে। সেই ডিম সকল ফুটিয়া কাল কাল ছোট ছোট ছানা হয়। তাহাদের এক একটি লেজ ও গোল গোল মাথা। উহাদিগকে বেঙাচি বলে। বোধ করি, তোমরা

---

(১৮)

পুকুরের জলে বেঙাচি দেখিয়া থাকবে। দেড় মাসের হইলে তাহাদের পেছনের পা দুখানি হয়। দুই মাসের হইলে সম্মুখের পাও হয় এবং লেজটি খসিয়া যায়। তখন দেখিতে ঠিক বেঙের মত। লাফিয়া লাফিয়া ডাঙায় ওঠে। ছোট ছোট গুগলী ও ছোট ছোট কীট ধরিয়া খায়। তখন পুকুর ছাড়িয়া কিছু কাল ঝোড়ে ঝাড়ে বাস করে।

পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার আলস্য নাই।

হে শিশুগণ! তোমরা পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার পরিশ্রম দেখিলে বুঝিতে পারিবে, অলস হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। দেখ! পিপীলিকারা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। তথাপি অনেকে একত্র হইয়া সর্ব্বদা পরিশ্রম করিয়া আপনদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। একবারো আলস্য করিয়া বসিয়া রয় না। সর্ব্বদাই আহারের অন্বেষণে ফিরিতেছে। কোন খানে অধিক আহারের দ্রব্য দেখিলে সকলে আসিয়া বহিয়া

(১৯)

লইয়া যায়, ও আপন আবাসে সঞ্চয় করে। ইহারা এক ক্ষণও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকে না।

এইরূপ মধুমক্ষিকারাও প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া মধু আহরণ করে। যখন বাসায় থাকে, সকলে মিলিয়া বহু পরিশ্রমে এমন চমৎকার বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, যে মানুষেরও সেরূপ করা অসাধ্য।

কুকুর বড় প্রভুভক্ত।

হে শিশুগণ! তোমরা যদি পশু ও পক্ষিগণের আচরণ মন দিয়া দেখ, তবে তাহা হইতেও অনেক উপদেশ পাইতে পার। আমি শুনিয়াছি, এক জন একটী কুকুর পুষিয়াছিল। সে যখন সেখানে (যেখানে) যাইত, কুকুরটী সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। ঐ কুকুর বড় প্রভুভক্ত, প্রভুর দ্রব্য অতি সাবধানে আগুলিত। এক দিন ঐ ব্যক্তি রাস্তার ধারে একটা বস্তা রাখিয়া, তাহার রক্ষার নিমিত্ত সেই কুকুরকে রাখিয়া গেল। কুকুর সেই বস্তার পাশে বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তথায় এক খান গাড়ী আসিয়া পহুছিল। শকটবান্ কুকু -

---

(২০)

রকে সরিয়া যাইতে সঙ্কেত করিল, কুকুর একবার নড়িলও না। চাবুক মারিতে লাগিল, তথাপি উঠিল না, প্রভুর বস্তা আগুলিয়া বসিয়া রহিল। শকটবান্ আর বিলম্ব না করিয়া, কুকুরের উপর দিয়াই গাড়ী চালাইয়া গেল। কুকুর চাকার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি প্রভুর দ্রব্য ছাড়িয়া উঠিয়া গেল না।

সারসপক্ষী বহুযত্নে সন্তানের লালন পালন করে।

হে বালক বালিকাগণ! মন দিয়া সারসপক্ষির ব্যবহার দেখিলে এই উপদেশ পাওয়া যায়, "পিতা মাতার প্রতি ভক্তি করা উচিত, এবং প্রাণ পণে তাঁহাদিগের ক্লেশ ও দুঃখ দূর করা কর্ত্তব্য"। দেখ! সারস পক্ষী আপন ছানাগুলিকে কত যত্নে লালন পালন করে। ছানাগুলি যত দিন পর্য্যন্ত আপনার আহার আপনি খুজিয়া লইতে না পারে, তত দিন একবারও তাহাদের কাছ ছাড়া হয় না। বাসা হইতে প্রথম বাহির করিয়াই আগে উড়িতে শিখায়। উড়িতে না পারিলে ডানায় করিয়া বহন করে। সারসেরা ছানাগুলিকে

(২১)

বিলের ধারে ছাড়িয়া দিয়া কাছে কাছে থাকে; এবং খাবার জন্যে বেঙ দেখাইয়া দেয়। কট্‌কটে বেঙ খাইলে কষ্ট পাবে এ জন্যে কোন ক্রমে তাহা খাইতে দেয় না।

আগুন লাগিয়া যখন ডেল্‌ট নগর পুড়িয়া যায়, তখন একটি সারস, ছানা লইয়া পলাইবার জন্যে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কারণ সন্তানগুলি অতিশিশু যাইতে পারিল না সুতরাং আপনিও তাহাদিগে ফেলিয়া পলাইল না। পরিশেষে আর কোন উপায় না দেখিয়া, ছানাগুলি ডানায় ঢাকিয়া বাসায় বসিয়া রহিল। এবং দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইয়া গেল।

সারসেরা সন্তানগুলিকে যেরূপ ক্লেশে প্রতিপালন করে, সন্তানগুলি বড় হইয়া তাহা ভুলিয়া যায় না। দূর পথ যাইবার সময়ে, বৃদ্ধ সারস সারসী যদি যাইতে অক্ষম হয়, তবে বলবান সন্তানেরা তাহাদিগকে পিঠে করিয়া লইয়া যায়।

---

(২২)

ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার।

হে শিশুগণ! যদি সকল মনুষ্য দীন হীন অক্ষম ব্যক্তিকে দয়া করে, পরহিংসা পরদ্বেষ পরধনহরণ প্রভৃতি কুকর্ম্মে রত না হয়, এবং ক্রোধ লোভের বশীভূত হইয়া অধর্ম্মাচরণ না করে, তবে এই সংসার কি সুখের স্থান হয়! আর কেহ কাহাকে কটু কহে না। আর কেহ কাহাকে অহঙ্কার করিয়া ঘৃণা করে না। প্রতারণা মিথ্যা ও চৌর্য্য একেবারে দূর হইয়া যায়। ঘোরতর নির্দ্দয়ের কর্ম্ম যে যুদ্ধ তাহার আর কথাও থাকে না। পৃথিবী আর মনুষ্য রক্তে দূষিত হয় না। তখন সকলেরি অন্তঃকরণ দয়াতে পরিপূর্ণ, সকলেরি নয়ন আহ্লাদে প্রফুল্ল হয়। এবং সকল লোকই একবাক্য হইয়া এই সুখের অবস্থাকে প্রশংসা করিতে থাকে। অতএব সকলেরি এমত যত্নবান্‌ হওয়া উচিত যাহাতে এইরূপ সুখের অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে।

(২৩)

সিংহ।

সিংহ বড় বলবান্, সিংহ কাহাকেও ভয় করে না। এ জন্য লোকে ইহাকে পশুরাজ বলিয়া থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশ ইহার জন্ম স্থান।[১] সিংহ ইচ্ছাপূর্ব্বক জন্ম স্থান ত্যাগ করে না। ইহার ঘাড়ে[২] লম্বা লম্বা কোক্‌ড়া কোক্‌ড়া লোম হয়, তাহাকে কেসর বলে। সিংহ ইচ্ছা করিলে কেসর ফুলাইতে পারে। গায়ের লোম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, চিক্কণ, পিঙ্গলবর্ণ। উদরের লোম শাদা। পায়ে বাঁকা বাঁকা বড় বড় ধারাল নখ আছে। সিংহ লম্বে পাঁচ ছয় হাত, উচ্চে তিন হাত। লেজ দু তিন হাত লম্বা। কিন্তু সিংহী এত বড় হয় না, এবং ঘাড়েও কেসর নাই।[৩]

সিংহ খাবার বেলায় নদী ও নির্ঝরের ধারে ঝোপের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যখন কোন জন্তু জল খাইতে আসে, অমনি দশ বার হাত দূর হইতে লাফিয়া তাহার ঘাড়ে পড়ে। যদি এক লাফে তাহার উপর পড়িতে না পারে তবে আর তাহাকে আক্রমণ না করিয়া আপন স্থানে ফিরিয়া আসে। সিংহ অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেও ক্ষুদ্র অথবা দুর্ব্বল জন্তু ধরিয়া খায় না।[৪]

---

(২৪)

সিংহের গর্জ্জন অতি ভয়ঙ্কর। রাত্রি কালে শুনিলে দূরের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বোধ হয়।

সিংহকে প্রতিপালন করিলে প্রতিপালকের বশ হয়। প্রতিপালক ধম্‌কাইলে অথবা তাড়না করিলে তাহা সহ্য করে। কখন কখন প্রতিপালক সিংহের দাঁত ধরিয়া জিব টানিয়া মুখের ভিতর মাথা দিয়া কৌতুক দেখায়, তাহাতে সিংহ বিরক্ত হয় না। কিন্তু সিংহের ক্রোধ অতি ভয়ঙ্কর, অতএব ক্ষুধার সময় বিরক্ত করিলে প্রতিপালকেরও বিপদ্ ঘটিতে পারে।

বিলাতে কোন সাহেব এক সিংহ পুষিয়াছিলেন। সাহেবের চাকর সিংহের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিত, কখন কখন অতিশয় নিগ্রহও করিত। এক দিন প্রাতঃকালে হঠাৎ সিংহনাদ শুনিয়া সাহেবের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। মশারি তুলিয়া দেখিলেন; সিংহ চাকরের প্রাণবধ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে বসিয়া গর্জ্জন করিতেছে।

সিংহী পাঁচ মাস গর্ব্ভ ধারণ করিয়া একেবারে তিন চারিটী সন্তান প্রসব করে। অতি দুর্গম গিরিগহ্বরে গিয়া তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখে।[৫]

(২৫)

পাছে কেহ টের পায় এই আশঙ্কায়, যাইবার সময় লাঙ্গুল দিয়া পায়ের চিহ্ন পুছিয়া পুছিয়া যায়। সিংহের সন্তান পাঁচ ছয় বৎসরের হইলেই যৌবন প্রাপ্ত হয়।

সিংহের উপকার করিলে, সে তাহা ভুলে না। রোম নগরের একজন প্রধান লোক কোন অপরাধে এক ভৃত্যের প্রাণবধের আজ্ঞা দেন। ভৃত্য পলাইয়া নিউমিডিয়া দেশে এক পর্ব্বতের গুহায় লুকাইয়া রহিল। হঠাৎ এক দিন তথায় এক সিংহ উপস্থিত হইল। ভৃত্য দেখিয়া বড় ভয় পাইল। কিন্তু সিংহ কোন অনিষ্ট করিল না বরং উহার জানুর উপর একখানি পা তুলিয়া দিয়া বিষণ্ণবদনে উহার গা চাটিতে লাগিল। ভৃত্য, সেই সিংহের পায় একটা কাঁটা ফুটিয়া রহিয়াছে, রক্ত পূয পড়িতেছে, দেখিয়া মনে করিল এই জন্যই সিংহ আমার নিকটে আসিয়াছে। তখন কাঁটা বাহির করিয়া দিল। সিংহ সুস্থ হইল এবং তদবধি সেই উপকারক ব্যক্তির আহারের নিমিত্ত প্রতিদিন এক এক পশু মারিয়া আনিয়া দিত।

---

(২৬)

ভৃত্য সেই জনশূন্য স্থানে একাকী আর থাকিতে না পারিয়া কিছু দিন পরে স্বদেশে ফিরিয়া আইল। ভৃত্যের প্রভু মৃগয়ায় গিয়াছিলেন তিনিও সেই সময়ে কএকটা সিংহ ধরিয়া স্বদেশে আনিলেন। এবং, পলায়িত ভৃত্য দেশে আসিয়াছে, শুনিয়া তাহার পূর্ব্ব অপরাধ মনে করিয়া এই দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন "আমি যে সকল সিংহ ধরিয়া আনিয়াছি, উহাকে, তাহাদের একটার মুখে ফেলিয়া দাও"। ভৃত্য নিউমিডিয়া দেশে পর্ব্বত গুহায় যে সিংহের পার (পায়ের) কাঁটা বাহির করিয়া দেয় দৈবাৎ সেও ধৃত হইয়া আনীত হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে সেই সিংহেরি মুখে নিক্ষিপ্ত হইল।

সিংহ সেই উপকারক ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়া কুকুরের মত তাহার পদতলে লুটিয়া পড়িল, আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল, এবং উহার গা চাটিতে লাগিল। দেখিয়া সকল লোক বিস্ময়াপন্ন। ভৃত্যও সিংহকে চিনিতে পারিয়া তাহার বৃত্তান্ত সকলকে জানাইল। তখন প্রভু স্বচক্ষে সেই ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত

(২৭)

হইলেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে ভৃত্যের অপরাধ মার্জনা করিলেন

হস্তী।

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে হস্তির আকার অতি বৃহৎ। বড় বড় হাতী দশ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ও আফ্রিকার কোন কোন প্রদেশ হস্তির জন্মস্থান। ইহার গাত্রের চর্ম্ম কর্কশ, বলিত (বলিভ) ও বন্ধুর। প্রায় সকল হস্তির বর্ণ ধূমের মত ধূম্র। কেবল ব্রহ্মদেশে শ্বেত হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

হস্তী ঘাড় ছোট বলিয়া মুখ নামাইতে পারে না। শুঁড় দিয়া খাবার দ্রব্য মুখে তুলিয়া লয়। ইহারা ইচ্ছা অনুসারে শুঁড় ফিরাইতে ঘুরাইতে এবং গুড়াইতে বাড়াইতে পারে। শুঁড় দিয়া বড় বড় ডাল ধরিয়া ভাঙিতে পারে। ফুলের গাছ হইতে এক একটী করিয়া ফুল তুলিতে পারে। ভূমি হইতে শিকি দুআনী প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য খুটিয়া লইতে পারে। কপাটের খিল, দড়ার গাঁইটও খুলিতে পারে। হস্তির

---

(২৮)

শুঁড়ের আগায় ছিদ্র[২] আছে এবং তাহাতেই নিশ্বাস প্রশ্বাস বয়। এবং তদ্দ্বারা জলাশয় হইতে জল শুষিয়া লয়। কতক জল মুখে ঢালিয়া দিয়া পান করে। কতক সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়া দিয়া শরীর শীতল করে।

হস্তী ডাল, পালা, ফল, মূল, শাক, পাতা, ঘাস, খড় আহার করে। গোরুর মত গিলিত চর্ব্বণ করে না। কোন স্থানে প্রচুর আহার দেখিতে পাইলে একাকী খায় না। আপন পালের সকলকে ডাকিয়া আনে। হস্তী সকল সর্ব্বদা দল বাঁধিয়া থাকে। যখন চরিতে যায় হস্তিনী ও দুর্ব্বল হস্তিদিগকে মাঝে রাখিয়া বলবান্ দুই হস্তী আগে পাছে গমন করে।

হস্তির শুঁড়ের পাশ দিয়া বড় বড় দুই দাঁত বাহির হয়। ঐ দন্ত অতিশয় দৃঢ়। উহা দ্বারা বাঘ ও অন্য অন্য শত্রুকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। হস্তিদন্ত বাক্স, কৌটা, চিরণী, পাখা, পাশা প্রভৃতি নানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত হয়, ও তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু হস্তিনীর এই রূপ বড় দন্ত হয় না।[৩] হস্তির দুই কসে চারি

(২৯)

চারি আট দাঁত আছে। তাহাতেই ডাল পালা চিবিয়া খায়। হস্তির কুলার মত বড় বড় দুই কাণ আছে, সর্ব্বদা তাহা নাড়ি (নাড়িয়া) থাকে। তাহাতেই চক্ষে পোকা মাকড় ধূলা কুটা পড়িতে পায় না।

হস্তী ঘোড়ার মত বেগে চলিতে পারে না। কিন্তু ঘোড়া এক লাফে যত যায়, মাহুতেরা চালাইয়া দিলে হস্তী এক এক পায় তত যাইতে পারে। ইহারা উত্তম রূপে সাঁতার দেয়। বড় বড় বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া অনায়াসে বড় বড় নদী পার হইয়া যায়। সাঁতার দিবার সময় সকল শরীর জলে ডুবিয়া থাকে, নিশ্বাস ফেলিবার জন্য কেবল শুঁড়টী উচ্চ করিয়া রাখে।

হস্তী মধুর স্বর শুনিতে বড় ভাল বাসে। যখন কোন উত্তম বাদ্য বাজে, শুনিয়া আহ্লাদে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়।

হস্তিনী একবারে এক সন্তানের অধিক প্রসব করে না।[৪] হস্তিনীর স্তন বক্ষঃস্থলে আছে, সন্তান শুঁড় দিয়া তাহা পান করে। কখন কখন হস্তিনীও শুঁড় দিয়া আপন স্তনদুগ্ধ চূষিয়া লইয়া

---

(৩০)

সন্তানের মুখে ঢালিয়া দেয়। পোষা হাতির সন্তান হয় না। অতএব যত পোষা হাতী দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই বন হইতে ধরিয়া আনা। ত্রিশ বৎসর বয়সে হস্তির পূর্ণ যৌবন হয়। পোষা হাতী এক শত বিশ বা ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। ইহাতে বোধ হয় যাহারা স্বচ্ছন্দে বনে বাস করে তাহারা আরো অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে।[৫]

ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন রাজারা বিবাহ ও মহোৎসবের সময়ে আপনাদিগের হস্তি সকল সুসজ্জিত করিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাওদা তুলিয়া বড় ঘটা করিয়া বাহির হইতেন। যুদ্ধকালেও হস্তি লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেন। এখন হস্তি দ্বারা যুদ্ধ হয় না, ইহারা কেবল যুদ্ধের সামগ্রী সকল বহন করে। বড় বড় কামান টানিয়া লইয়া যায়। বালীতে অথবা জলাতে কামানের চাকা বসিয়া গেলে শুঁড় দিয়া তুলিয়া দেয়। যুদ্ধযাত্রাকালে সম্মুখে বন জঙ্গল পড়িলে তাহা পরিষ্কার করিয়া সৈন্যদিগের পথ করিয়া দেয়। নদীর তীরে জাহাজ নির্ম্মাণ হইলে

(৩১)

কখন কখন তাহা টানিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়। শীকারি লোকেরা হস্তির উপর চড়িয়াই ব্যাঘ্রাদি শীকার করে। হস্তী না হইলে দুর্গম পথে যাওয়া যায় না।

হস্তির বল অতিশয়। ছয়টা ঘোড়ায় অথবা পচিশ জন লোকে যে বোঝা নাড়িতে পারে না, হস্তী একাকী তাহা অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়। হস্তী এমত সাবধানে নৌকার উপর মোট উঠাইয়া দেয়, যে মোটের গায় জল লাগিতে পায় না। নৌকার উপর আস্তে আস্তে মোটটি নামাইয়া শুঁড় দিয়া নাড়িয়া দেখে, যদি মোট নড়ে, তবে বুদ্ধিপূর্ব্বক নীচে ঠেকা দিয়া রাখিয়া যায়।

প্রশংসা অথবা তিরস্কার করিলে হস্তী তাহা বুঝিতে পারে। প্রভুর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিয়া পুরস্কারের অভিলাষ করে। কেহ উপকার বা অপকার করিলে হস্তী তাহা কখনও ভুলে না। সময় পাইলেই পরিশোধ করে। হস্তী ছোট বালক বালিকাকে বড় ভাল বাসে ও তাহাদিগকে লইয়া খেলা করে। কেহ উপহাস করিলে তাহাও সে বুঝিতে পারে।

---

(৩২)

কোন সময়ে এক সাহেব এই দেশে একখান নূতন জাহাজ প্রস্তুত করিয়া তাহা জলে ভাসাইবার নিমিত্ত, আপন হস্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হাতী বিস্তর টানাটানি করিল কোন মতে জাহাজ নামাইতে পারিল না। তখন সাহেব ক্রোধভরে কহিলেন "এই অকর্ম্মণ্য হাতিটাকে দূর করিয়া দাও, এ কোন কাজের নয়, আর একটা ভাল দেখিয়া আন।" হস্তী সেই তিরস্কার বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণপণে এমত জোরে টানিতে লাগিল যে তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গেল, এবং সেই স্থানেই দাঁড়িয়া পঞ্চত্ব পাইল।

মদ খেতে দিব বলিয়া, এক মাহুত আপন হাতি দ্বারা কোন কাজ সারিয়া লইয়াছিল, কিন্তু মদ দেয় নাই। হস্তী সেই প্রতিশ্রুত পুরস্কার না পাইয়া ক্রোধে মাহুতের প্রাণ বধ করিল। মাহুতের স্ত্রী সমক্ষে স্বামিহত্যা দেখিয়া মৃত্যু কামনায় আপনি দুই শিশু সন্তান লইয়া হস্তির

(৩৩)

পদতলে পড়িল, এবং কহিল "হে হস্তি তুমি আমার পতিহত্যা করিয়াছ অতএব আমাদিগকেও মারিয়া ফেল।" হাতী তৎক্ষণাৎ অনুতাপিত হইয়া মাহুতের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শুণ্ড দ্বারা আপন স্কন্ধে উঠাইয়া লইল। অর্থাৎ তাহাকেই আপন মাহুত বলিয়া মানিয়া নিল। তদবধি আর কাহাকেও আপন স্কন্ধে চড়িতে দিত না।

কোন মাহুত পথে যেতে যেতে একটা নারিকেল পাইয়াছিল। এবং তখনি তাহা খাইবার অভিলাষে হাতির মাথায় আছাড় মারিয়া ভাঙিল। তাহাতে বড় বেদনা বোধ হইলেও হাতী সে দিন মাহুতকে কিছুঁ না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। পরদিন হাতী যেমন বাজার দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। অমনি শুঁড় দিয়া এক দোকান হইতে একটা নারিকেল তুলিয়া লইল, এবং সেই নারিকেল দিয়া মাহুতের মাথায় এমত জোরে আঘাত করিল যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণত্যাগ হইল।

---

(৩৪)

এক মাহুতের স্ত্রী আপন শিশু সন্তানকে পিঁড়ির উপর শুয়াইয়া হাতির সম্মুখে রাখিয়া হাট বাজার করিতে যাইত। হাতী শুঁড় নাড়িয়া সেই ছেলের গায় মসা মাছি বসিতে দিত না। যদি কখন ছেলেটী ঘুম ভাঙিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিত। হস্তী অমনি শুঁড় দিয়া সাবধানে সেই পিড়িখানি তুলিয়া লইয়া দোলাইয়া দোলাইয়া পুনর্ব্বার তাহাকে ঘুম পাড়াইত। হস্তী সেই শিশুকে এমত ভাল বাসিত, যে সে কাছে না থাকিলে আহার করিত না।

কোন লোক এক চিড়িয়াখানায় হাতি দেখিতে গিয়া, এক খানা রুটি, হাতিকে যেন খাইতে দিবে এই রূপ ছল করিয়া, মুখের নিকট ধরিল। হাতী তাহা খাইবার জন্য যেমন শুঁড় বাড়াইল অমনি আর তাহা না দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হস্তী তাহার সেই ঠাট্টা বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে এমন শুণ্ডাঘাত করিল যে ভূতলে পড়িয়া তাহার পাঁজর ভাঙিয়া গেল।

---

(৩৫)

ব্যাঘ্র।

ব্যাঘ্রের তুল্য হিংস্র ও মারাত্মক জন্তু আর নাই। ইহারা যেমন বলবান্ তেমনি ভয়ঙ্কর। সিংহ বিরক্ত অথবা ক্ষুধিত না হইলে হিংসা করে না, কিন্তু ব্যাঘ্র সেরূপ নয়। ইহারা যত প্রাণি দেখিতে পায় সকলকেই বধ করে। প্রাণি বধ করিয়া ইহাদের আশ মিটে না। ব্যাঘ্র মানুষ দেখিলে ভয় পায় না, মানুষের রক্তই অধিক ভাল বাসে।[১]

বাঘের গায়ের লোম পীতবর্ণ, উপরে কাল কাল ডোরা। দেখিতে বড় সুন্দর। পেট ও পায়ের ভিতর দিক কেবল সাদা।

ব্যাঘ্র, সকল পশুকেই আক্রমণ করিয়া থাকে, কখন কখন সিংহকেও আক্রমণ করে। তখন উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, ও উভয়েই বিনষ্ট হয়।

বাঘ কখনও পোষ মানে না। যে ব্যক্তি ইহাকে পুষিয়া প্রত্যহ আহার দেয়, যো পাইলে তাহারও ঘাড় ভাঙিয়া রক্ত খায়। কিন্তু শিশুকালে কোন কোন ব্যাঘ্রকে অহিংস্র দেখা গিয়াছে।

---

(৩৬)

ব্যাঘ্র বড় শোণিতপ্রিয়। ইহারা যখন কোন জন্তু বধ করে, অগ্রেই তাহার রক্ত পান করে, পরে মাংস খায়। যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তবে হত জন্তুর শরীরের ভিতর আপনার চক্ষু পর্য্যন্ত প্রবেশিত করিয়া পেট ভরিয়া রক্ত পান করে।

ইহারা এত শক্তি ধরে যে গরু হরিণ প্রভৃতি জন্তু মুখে করিয়া অনায়াসে খানা ডোবা ডিঙিয়া পলায়ন করে। বড় বড় মহিষকেও বধ করিয়া পিঠে ফেলিয়া লইয়া যায়।

বড় বড় বাঘ লম্বে ও উচ্চে সিংহের সমান হয়। মাঝারি বাঘ দুই হাত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহারা হরিণ ও বনবরাহ খাইতে ভাল বাসে। ক্ষুদ্রজাতীয় বাঘ দেড় হাতের অধিক উচ্চ হয় না, কিন্তু বড় ধূর্ত্ত ও মনুষ্যের রক্ত মাংস অধিক ভাল বাসে।

ব্যাঘ্র সচরাচর নদীর তীরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়া থাকে। কোন জন্তু জল খাইতে আসিলে ভয়ানক গর্জন করিয়া অতি বেগে তাহার উপর লাফিয়া পড়ে। কখন কখন লোকালয়ে আসিয়া

(৩৭)

কুটীরের ও গোয়ালের আগড় ভাঙিয়া গোরু মানুষ ছাগল ভেড়া যা পায় ধরিয়া লইয়া যায়।

সিংহীর ন্যায় বাঘিনীও একবারে চারি পাঁচ সন্তান প্রসব করে। নবপ্রসূতা ব্যাঘ্রী অধিক হিংস্রক ও ভয়ানক হয়।[২]

হঠাৎ বাধা দিতে পারিলে কখন কখন ব্যাঘ্র ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়। কোন সময়ে কয়েকটি বিবি ও সাহেব সুন্দরবনে এক নদীর তীরে বৃক্ষের তলে বসিয়া আহার ও আমোদ প্রমোদ করিতেছিল। হঠাৎ এক বাঘ আসিয়া আক্রমণের উপক্রম করিলে, তৎক্ষণাৎ এক বিবি আপনার ছাতা বাঘের মুখের উপর খুলিয়া ধরিল। বাঘ ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল।

ভালুক

শাদা, কাল, ধূসর এই তিন বর্ণের ভালুক দেখিতে পাওয়া যায়। সাদা ভালুক হিমপ্রধান দেশে জন্মে। ইহারা অতিবলবান্ ও প্রকাণ্ড শরীর। কেবল মৎস আহার করে। কাল ও ধূসর

---

(৩৮)

বর্ণের ভালুক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ফল মূল শস্য ভক্ষণ করে। কখন কখন মৎস মাংসও আহার করিয়া থাকে। যে সকল দুর্গম গিরিগহ্বরে সর্ব্বদা মনুষ্যের গতায়াত নাই ইহারা সেই খানে বাস করে।

ভালুকের অঙ্গে ঘন ঘন লম্বা লম্বা লোম আছে, এজন্য শীত বাত বৃষ্টিতে ক্লেশ পায় না। ইহাদের গোল গোল ছোট ছোট কাণ। চক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। পা ও উরু অতিশয় দৃঢ় ও মাংসল। প্রত্যেক পায় পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি থাকায় সম্মুখের পা দিয়া হস্তের কার্য্য করিতে পারে। আঙুলের আগায় বড় বড় ধারাল নখ হয়। ভালুকের শ্রবণশক্তি ঘ্রাণশক্তি ও স্পর্শশক্তি বড় প্রবল।[১] ইহাদের স্বর গম্ভীর কর্কশ ও ভয়ানক।

বর্ষার শেষে ভালুক বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হয়। শীতের আরম্ভ হইলে পর্ব্বতের গহ্বরে প্রবেশ করে। কিছু খায় না, মরার মত হইয়া সমুদায় শীত কাল কাটায়। এই কালে ভল্লুকীর সন্তান হয়। ভালুক টের পাইলে সেই ছানা খাইয়া ফেলে, এজন্য ভল্লুকী তাহার কাছ ছাড়া হইয়া

(৩৯)

অন্য কোন গোপনীয় গহ্বরে গিয়া প্রসব হয়। চারি মাস আপনি কিছু না খাইয়াও সন্তানকে স্তন পান করায়, ও অতিশয় স্নেহে প্রতিপালন করে।

ভল্লুকী ছয় মাস গর্ব্ভ ধারণ করিয়া অগ্রহায়ণের শেষে একবারে দুই তিন সন্তান প্রসব করে।[২] ভালুকের ছানা প্রথমে পীতবর্ণ ও পিণ্ডের মত গোলাকার হয়, কেবল মুখের দিকে কিঞ্চিৎ সরু। ২৮ দিন পর্য্যন্ত চক্ষু ফুটে না।

বসন্ত কালের আরম্ভে ভল্লুকী ছানা গুলি সঙ্গে লইয়া বাহির হয়। অনাহারে অতি কৃশ, ও ক্ষুধায় বড় কাতর, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আহার অন্বেষণ করে। গাছে চড়িয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কত গুলা ফল ভক্ষণ করে। যখন গাছে চড়ে পাছের পায়ে ডাল ধরিয়া সমুখের পা দিয়া ফল পাড়িয়া খায়। ইহারা খেজুর খাইতে বড় ভাল বাসে।

ভালুক বড় নিষ্ঠুর জন্তু, অতি অল্পেই রাগিয়া উঠে ও নখ দিয়া চিরিয়া ফেলে। পরিশেষে সমুখের দুই পা দিয়া আপন কোলের মধ্যে

---

(৪০)

এমত চাপিয়া ধরে, যে ধৃত ব্যক্তির নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ হয়।[৩]

ভালুকের বোধ শক্তিও বিলক্ষণ আছে। ভালুকেরা কখন কখন রাত্রিকালে ক্ষেতে পড়িয়া যব, গম, ধান উপড়ায়; এবং মাটীতে আছড়িয়া বীজ সকল ছাড়াইয়া ভক্ষণ করে। পাতিয়া শুইবার নিমিত্ত বিচালি লইয়া যায়। ইহারা মধু পান করিতে এত ভাল বাসে, যে তাহার জন্যে নানা চাতুরী করে ও অনেক কষ্ট সয়।

পোষা ভালুক অনেক শান্ত। যে প্রতিপালন করে তাহার অবাধ্য হয় না। ভালুক পুষিয়া তাহাকে সোজা হইয়া চলিতে ও নাচিতে এবং নানা কৌতুক করিতে শিখায়। ভালুক সহজে শিখিতে চায় না, নির্দ্দয় দুরাত্মা লোকেরা শিখাইবার নিমিত্ত বিস্তর যাতনা দেয়।

কোন কোন দেশের লোকেরা ভালুকের চর্ম্মে বিছানা গায়ের কাপড় ও টুপি প্রস্তুত করে। এবং বরফের উপর দিয়া চলিতে পারিবার জন্য জুতোর তলাও গড়ে। ভালুকের নাড়ী অভ্রের মত স্বচ্ছ এজন্য ঐ লোকেরা সেই নাড়ীর চর্ম্মে

(৪১)

জানালার পরদা তৈয়ার করে। ঐ পরদায় আলো আটকায় না। আর ভালুকের ঘাড়ের হাড় দিয়া তাহারা ঘাসও কাটিয়া থাকে।

গণ্ডার।

গণ্ডার কেবল হস্তি অপেক্ষায় আকারে ছোট, কিন্তু বল ও বিক্রমে কাহা অপেক্ষাও ন্যূন নয়। গণ্ডার হিংস্রক নহে অথচ ভাল পোষ মানে না। কখন কখন ইহার এমত রাগ উপস্থিত হয় যে কোন মতেই সান্ত্বনা করা যায় না। একবার একটা গণ্ডারকে এক জাহাজে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পথের মধ্যে হঠাৎ সে রাগপ্রাপ্ত হইয়া জাহাজখান ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপ আরও একটা গণ্ডার জাহাজ ভাঙিয়া ফেলিয়া সমুদ্রে ডুবে মরিয়াছিল।

ইহারা কাদায় পড়িয়া খেলা করিতে ভাল বাসে। এজন্য যেখানে মনুষ্যের গতায়াত নাই এমন জলা বিল ও নদীর তটে সচরাচর বাস করে। বাঙ্গালা, শ্যাম, চীন, জাবা, সিংহল এই সকল দেশ গণ্ডারের জন্ম স্থান।

---

(৪২)

গণ্ডারের চর্ম্ম এমত কঠিন যে তা ব্যাঘ্রের নখরে বিদ্ধ হয় না, হস্তির দন্তে বিদারিত হয় না, তরবারের ধারে কাটা যায় না, বন্দুকের গুলিতেও ভেদ হয় না। ইহার ওষ্ঠ অধরের উপর ঝুলে পড়িয়া আছে, ওষ্ঠ দিয়া খাবার বস্তু মুখে তুলিয়া লয়। ইচ্ছা মত ওষ্ঠ বাড়াইতে ও এদিক ওদিক ফিরাইতে পারে।

বহুদিন অন্তর গণ্ডারীর সন্তান হয়।[১] একবারে একটীর অধিক হয় না। প্রথম মাসে সন্তান দেখিতে শূকরের মত। তখন শৃঙ্গ থাকে না, পরে ক্রমশঃ যত বয়স বাড়ে নাকের উপর একটি শৃঙ্গ বাহির হইতে থাকে। উহাকেই লোকে গণ্ডারের খড়্গ বলে। গণ্ডারের শৃঙ্গ দু হাত আড়াই হাত লম্বা হয়।[২]

গণ্ডার কাঁচা ঘাস, কাঁটা শাক ও সকল প্রকার শস্য ভক্ষণ করে। সর্ব্বাপেক্ষায় ইক্ষু খাইতে বড় ভাল বাসে।

গণ্ডারের শ্রবণ শক্তি বড় তীক্ষ্ণ। যদি কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পায় অমনি মনোযোগ পূর্ব্বক সেই দিকে কাণ পাতিয়া রয়। ইহার

(৪৩)

ঘ্রাণশক্তিও বড় তীক্ষ্ণ, শত্রু ব্যক্তি দূরে থাকিলেও গন্ধ দ্বারা টের পায়। গণ্ডার ঠিক সম্মুখের বস্তুই দেখিতে পায়, আশ পাশের দেখিতে পায় না। যখন কোন শত্রুকে আক্রমণ করিতে ধায়, কোন বাধা না মানিয়া কেবল সোজা দৌড়ায়। শরীরে ঘর্ষণে গাছ পালা ভাঙিয়া চুরিয়া যায়, এবং সম্মুখে যাহা কিছু পড়ে শৃঙ্গ দ্বারা তুলিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়।

গণ্ডারের চর্ম্মে ঢাল হয়। শৃঙ্গে উত্তম উত্তম কৌটা বাটী জলপাত্র ও খেলানা প্রস্তুত হয়। ইহার মাংস আফ্রিকা দেশের লোকেরা রুচি পূর্ব্বক ভক্ষণ করে, এবং আমাদের ভারতবর্ষেও পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্যামদেশের লোকেরা ইহার শৃঙ্গ বিষঘ্ন বলিয়া আদর করে।

গণ্ডার বাছুরের মত শব্দ করে। ইহারা ৭০/৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

উষ্ট্র

জগদীশ্বর আরব দেশের জন্যই উটের সৃষ্টি করিয়াছেন। আরবীয়েরা ইহার দুগ্ধ পান

---

(৪৪)

করে। লোমে গাত্রবস্ত্র ও তাম্বু প্রস্তুত করে। ইহার মাংস খায় ও বিষ্ঠা জ্বালায়। স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার ও গৃহস্থালী দ্রব্য সকলি উটের পৃষ্ঠে লইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া কেবল উটের গুণেই পরিত্রাণ পায়। অতএব উষ্ট্রই আরবদিগের পরম ধন।

আরব দেশের মরু ভূমি অতি ভয়ানক। সে স্থানে জলাশয় নাই, বৃক্ষের ছায়া নাই, অধিক কি কহিব একগাছি তৃণও নাই; যে দিকে চাও কেবল অপার বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। বিশেষতঃ যখন মধ্যাহ্নকালে দারুণ রৌদ্র হয়, বালির রাশি তাতিয়া উঠে, অগ্নির কণার মত বালি সকল ঝড়ে উড়িতে থাকে, কোন জীব জন্তু চলিতে পারে না। তখন ধৈর্য্যশালী দুঃখসহিষ্ণু উষ্ট্র নাসিকার উপরের চর্ম্ম দ্বারা নাসিকার দ্বার আবৃত করিয়া চক্ষু মুদিয়া সেই মরুভূমির উপর দিয়া অনায়াসে গতায়াত করে।

উটের পদতল কোমল, এজন্য বালির উপর দিয়া গতায়াত করিতে তাহার ক্লেশ হয় না।

(৪৫)

গোরু ও মহিষের যেমন চারিটা পাকস্থলী আছে[১] উটের সেরূপ নয়। ইহার আরো একটা অধিক আছে।[২] ঐ পাকস্থলীতে কয়েক দিনের মত পানীয় জল একবারে পূরিয়া রাখে, ও প্রয়োজন মতে ব্যবহার করে। অতএব পাঁচ সাত দিন জল না জুটিলেও উটের কষ্ট হয় না। উষ্ট্র কেবল গোটা কতক খেজুর ও কাঁটা ঘাস খাইয়া দিন কাটাইতে পারে। ইহারা তিন পোয়া পথ থাকিতে গন্ধ দ্বারা জল টের পায়।

উষ্ট্রের সমান শান্ত ও ধৈর্য্যশালী পশু আর দেখা যায় না। ইহারা অগ্নি তুল্য তপ্তবালির উপর দিয়া প্রতিদিন ৫০/৬০ ক্রোশ করিয়া ক্রমিক নয় দশ দিন চলে, একবারও পরাঙ্মুখ হয় না।[৩] যখন দারুণ উত্তাপে তাপিত হয় তখনই কেবল উন্মত্তের ন্যায় হইয়া আপন প্রভুকে কামড়াইতে যায়।

তুরুস্ক, পারস্য ও মিসর দেশের লোকেরা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বড় বড় বোঝা চাপাইয়া দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যায়। যখন বাণিজ্য যাত্রা করে সহস্র সহস্র উট একত্রিত করিয়া

---

(৪৬)

দল বাঁধিয়া চলিয়া যায়। উট যখন বোঝাই লয় উদর পাতিয়া মাটীতে শয়ন করে, এবং পা গুটাইয়া পেটের তলে রাখে। বোঝাই হইবা মাত্রেই আপনি উত্থিত হয়। যদি অধিক ভার চাপান যায় তবে উঠিতে চায় না, কাতর স্বরে চীৎকার করিতে থাকে। উটকে চালাইবার জন্যে চাবুক মারিতে হয় না, কেবল বাঁশি বাজাইলেই তাহার স্বর শুনিয়া আনন্দে চলিয়া যায়।

উটের সন্তান একবারে একটীর অধিক হয় না।[৪] ছয় বৎসর বয়সে উট পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়, এবং চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

সম্পূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক

সম্পাদকীয় মন্তব্য

শিশুশিক্ষা - ১

ও

শিশুশিক্ষা - ৩

॥ শিশুশিক্ষা - ১॥

॥ কাণাকে কাণা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না ॥

প্রথম ভাগে মানবাঙ্গ-সংস্থানের পরিচয় দিয়েছেন বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদে। হাত, পা, মুখ, দাঁত, ঠোঁট, চোখ, নাক, কান, ভুরু, চুল, আঙুল, চোখের পাতা ইত্যাদির অবস্থান কার্য উপকারিতা বিষয়ে বক্তব্য রয়েছে ঐ সব পরিচ্ছেদে। শিশুকে মানব-শরীর সম্বন্ধে সচেতন করার এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমাদের কোন আপত্তি নেই। থাকার কথাও নয়।

আপত্তির ক্ষেত্রটি অন্যত্র। প্রথম ভাগের ২০ পৃষ্ঠায় তিনি শিশুদের উপদেশ দিয়েছেন '....যে জন যে কথায় মনে পীড়া পায় তাহাকে তেমন কথা কহিবে না।' বাক্যের পূর্ববর্তী অর্ধাংশ হল 'সকলকেই ভাল বাসিবে ও ভাল কথা কহিবে, ...'। 'ভাল কথা'-র অনেক অর্থ হতে পারে। সুন্দর কথা, সৎ কথা, মিষ্টি কথা, হিতকথা, প্রিয় কথা ইত্যাদি। প্রিয় কথা মানেই 'সত্য কথা' নয়। অপ্রিয় সত্যভাষণ এবং প্রিয় অসত্যভাষণে দুস্তর ব্যবধান। পরের মনোদুঃখ উদ্রেককারী কথা না বলতে লেখক যে উপদেশ দিয়েছেন তার সারসূত্র পূর্বাংশে — অপ্রিয় সত্যভাষণ কোর না।

প্রশ্ন হল — লেখক নিজে কি এই উপদেশ মেনে চলেছেন? কয়েকটি বাক্য পুনরুদ্ধার করা যাক্। ১. 'কাণাকে কাণা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না, তাহা বলিলে তাহারা মনে দুঃখ পাইবে।' (পৃ ২০) ২. '.... যাহার পা বিকল সেই খোঁড়া।' (পৃ. ২৩) ৩. 'যাহার হাত নাই সে কিছুই করিতে পারে না তাহাকে নুলো বলে।' (পৃ. ২৩) ৪. 'যে কথা কহিতে পারে না লোকে তাকে বোবা বলে।' (পৃ. ২৪) ৫. 'যাহার চক্ষু নাই সে কিছুই দেখিতে পায় না। আহা কাণা বড় দুঃখী।' (পৃ. ২৫) ৬. 'কালারা কিছু শুনিতে পায় না।' (পৃ. ২৫) ৭. 'যাহার নাক নাই সে ফুলের বাস পায় না, ও দেখিতে কদাকার।' (পৃ. ২৫) ৮. 'যাহার চুল নাই তাহাকে নেড়া বলে।' (পৃ. ২৬)

তালিকা পড়ে মনে হতে পারে লেখক সম্ভবত বিকৃতাঙ্গ মানুষের সংজ্ঞা রচনা করেছেন। কাণা, খোঁড়া, নুলো, বোবা, কালা, নেড়া ইত্যাদির পর আর কিছুই বাকি থাকে না। লেখক শিশুদের এইসব বিকৃতাঙ্গ মানুষদের চিনিয়েছেন অথচ তাদের সে-নামে না ডাকতে উপদেশ দিয়েছেন। প্রত্যাশিত সংযম লেখক প্রদর্শন না করায় লেখকের সহানুভূতি আমাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। উদ্ধৃত বাক্যসমূহ বর্জিত হলেও রচনার অঙ্গহানি ঘটতো না। বরং 'যে জন যে কথায় মনে পীড়া পায় তাহাকে তেমন কথা কহিবে না' — অংশটুকু সার্থক হতো বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয় ২য়' ভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে। সপ্তম পাঠে বিদ্যাসাগর 'রাম' নামক এক 'সুবোধ' বালকের উদাহরণ দিয়েছেন। 'সে কখনও কাণাকে কাণা, বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিয়া ডাকে না। কাণাকে কাণা, বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিলে, তাহারা বড় দুঃখিত হয়।' বাক্যদ্বয়ের পূর্ব বাক্য — 'যাহা শুনিলে লোকের মনে ক্লেশ হয়, রাম কখনও কাহাকেও সেরূপ কথা বলে না;'

॥ প্রভাত বর্ণন ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের এই কবিতাটি বাঙালির স্মৃতিবাহিত হয়ে দেড়শ বছর পার করেছে। আজও প্রাথমিক স্তরে নানা সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কবিতাটি শিশুদের অবশ্যপাঠ্য। তবে আধুনিক শিশুরা 'পাখী', 'গগণ', 'যুড়ায়' ইত্যাদি বানানের সঙ্গে যেমন পরিচিত নয়, তেমনি 'লোহিত' শব্দটিও তাদের অচেনা। তার পরিবর্তে শিশুরা দেখেছে 'সোনার' শব্দটি।

কততম সংস্করণ থেকে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সবক'টি সংস্করণ না পাওয়ায় তা বলা সম্ভব নয়। এটুকু বলা যায়, 'শিশুশিক্ষা'-র তিনটি খণ্ডেরই স্বত্ব লাভ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাই সম্পাদনা ও পরিমার্জনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিদ্যাসাগরেরই।

কিন্তু শুধু এই 'লোহিত' শব্দ নয়, বিদ্যাসাগর নাকি কবিতার ষষ্ঠ পঙ্ক্তির মধ্যে কয়েকটি শব্দ পালটিয়েছেন — এমন অভিযোগ-সম্বলিত কাহিনী শুনিয়েছেন বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহভাজন 'কবিভূষণ শ্রী পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন'। 'প্রবর্তক' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩৬ সংখ্যায় 'স্বর্গত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি' নামক রচনার প্রথম পাঁচটি অংশ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে প্রথম অংশটি এই অভিযোগ -সম্বলিত কাহিনী। অংশের সূচনায় পাদটীকায় তিনি বলে নিয়েছেন — "মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জামাতা 'আর্য্যদর্শন' সম্পাদক, স্বর্গত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মুখে এই গল্পটী শুনিয়াছিলাম। 'আমি যখন বাল্যকালে নিজ জন্মভূমি 'ভদ্রকালীর' বাঙ্গালা স্কুলে মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' (৩য় ভাগ) পড়িতাম, তখনও আমি পড়িয়াছিলাম, 'মধুকর মধু লোভে আসিয়া জুটিল।' বিদ্যাসাগর মহাশয় পরে ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপ পাঠ রাখিয়াছেন, — 'পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল।' "

এবার সেই কাহিনীটি শোনা যাক। কিছুটা দীর্ঘ, তবু দুষ্প্রাপ্য এবং প্রয়োজনীয় বলে পুরোটা অবিকৃত উদ্ধার করা হচ্ছে।

'সুবিখ্যাত সুপণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার পরম বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পত্নী রোদন করিতে করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মুখে পতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন "আপনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। আপনি ত চলিলেন। আমার অবস্থা কি হইবে।" দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধু-পত্নীর দুঃখে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিয়া কহিলেন, "মদন। তোমার 'শিশুশিক্ষা' (৩য় ভাগ) বইখানা আমাকে দাও। আমি তোমার ব্রাহ্মণীকে ৫০্টাকা করিয়া মাসহারা দিব।" মদন হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "ভাই ঈশ্বর। আমার ব্রাহ্মণী রহিলেন, তুমি ইহাঁর ভরণপোষণ করিও।" বিদ্যাসাগর মহাশয় সেইদিনেই একখানি 'শিশুশিক্ষা' আনিয়া ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন। পুস্তক ছাপা হইয়া গেল, — এদিকে মদনও সুস্থ হইয়া উঠিলেন। মদনের 'প্রভাত বর্ণনায়' এরূপ লেখা ছিল — 'মধুকর মধুলোভে আসিয়া জুটিল।' বিদ্যাসাগর ইহা কাটিয়া দিয়া এইরূপ করিলেন, — 'পরিমল-লোভে অলি আসিয়া জুটিল।' মদন তখন সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ অর্থ-বিরুদ্ধ দুষ্ট পাঠান্তর দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বলিলেন, 'ঈশ্বর। আমার পাঠ বিশুদ্ধ ছিল। তুমি ইহা কাটিয়া অশুদ্ধ করিলে কেন? তুমি 'অমরকোষের' মাথা খাইয়াছ। মনে পড়ে না কি 'বিমর্দ্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহর?' ঘর্ষণ-জনিত সুগন্ধকেই পরিমল বলে। পরিমল শব্দের অর্থ 'মধু' কোথায় পাইয়াছ? বিদ্যাসাগর মহাশয় তীব্রতেজাঃ লোক ছিলেন। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া কহিলেন, 'তুমি যখন এই বইখানা আমাকে দিয়াছ, তখন আমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারি।' বিদ্যাসাগরের মুখে এইরূপ অসঙ্গত কথা শুনিয়া স্নিগ্ধমূর্ত্তি মদনমোহন অবাক্ হইয়া রহিলেন। বস্তুতঃ মদনমোহন মহাশয়ের পাঠ বিশুদ্ধ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঠ অশুদ্ধ। ঘর্ষণ-জনিত সুগন্ধের নাম 'পরিমল'। 'মধু' অর্থে পরিমল শব্দের ব্যবহার সংস্কৃত মহাকাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধু-অর্থে পরিমল-শব্দের ব্যবহার ততটা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। মধুকর মধুপান করিবার নিমিত্তই পুষ্পে আসিয়া বসে। সুগন্ধ আঘ্রাণ করিবার নিমিত্ত আসে না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে কোটী কোটী মধুকর মনোহারী দোকানে ঢুকিয়া অটো-ডি-রোজের শিশির উপর গিয়া বসিত। এখন 'শিশুশিক্ষার' বয়স ৮০ বৎসর। প্রায় ৫৪ বৎসর হইতে এই দুষ্ট পাঠ চলিয়া আসিতেছে।'

পূর্ণচন্দ্রের এই কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের বক্তব্য সূত্রাকারে সাজিয়ে দেওয়া হল।

১. 'প্রভাত বর্ণন' কবিতাটি 'শিশুশিক্ষা'-র ৩য় ভাগ নয়, ১ম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর বাল্যকালে এই কবিতাটি ১ম ভাগে পড়েছেন এবং বিদ্যাসাগরও মদনমোহনের কাছে ১ম ভাগের স্বত্ব চেয়েছিলেন (যদি সত্যিই চেয়ে থাকেন!)।

২. আমরা 'শিশুশিক্ষা' ১ম ভাগের ২য় সংস্করণ পেয়েছি, যার প্রকাশ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে।

২য় সংস্করণে বেথুন সাহেবের কাছে লিখিত মদনমোহনের একটি নিবেদনপত্র ছাপা হয়, যার তারিখ ২২ ভাদ্র ১৯০৭ সংবৎ, ইংরেজি ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫০। অর্থাৎ এই সংস্করণের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের। এই সংস্করণেই 'প্রভাত বর্ণন' কবিতায় আমরা 'পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল' অংশটুকু দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং ২য় সংস্করণে যদি 'মধুকর মধুলোভে'-র পরিবর্তে 'পরিমল লোভে অলি' ব্যবহৃত হয়েই থাকে, তবে তা করেছেন স্বয়ং মদনমোহন। বিদ্যাসাগরের কোন ভূমিকাই এখানে নেই।

৩. 'শিশুশিক্ষা'-র ২য় ও ৩য় ভাগ লিখিত হয়েছিল ১৮৫০ সালে। ওই বছরই নভেম্বর মাসে মদনমোহন মুর্শিদাবাদে জজ পণ্ডিতের চাকরি নিয়ে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন। অতএব গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১ম ভাগের স্বত্ব বিদ্যাসাগরের হাতে তুলে দিলেন, বিদ্যাসাগর তাতে পরিবর্তন সাধন করলেন এবং মদনমোহনও ২য় সংস্করণের নিবেদনপত্র সবকিছু মেনে নিয়ে লিখে দিলেন — একথা কি মেনে নেওয়া যায়?

৪. যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বলেছেন — তিনি নাকি 'মধুকর মধুলোভে' পড়েছেন। পরে বিদ্যাসাগর তাকে পরিবর্তিত করেন 'পরিমল লোভে অলি'-তে। প্রশ্ন জাগে, যোগেন্দ্রনাথ আপন শ্বশুরমশাই মদনমোহনের জীবনচরিত লিখেছেন ১৮৭১/৭২ খ্রিস্টাব্দে — সেখানে তিনি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছেন, এমনকি 'পাখী সব করে রব' উদ্ধৃতিও দিয়েছেন, তবুও এমন গুরুতর অভিযোগ বিষয়ে তিনি নীরব রইলেন কেন?

৫. পূর্ণচন্দ্রের স্মৃতিকথার রচনাকাল ১৯৩০। রচনাটিতে তিনি লিখেছেন যে 'প্রায় ৫৪ বৎসর হইতে এই দুষ্ট পাঠ চলিয়া আসিতেছে।' অর্থাৎ 'দুষ্ট পাঠ' শুরু হওয়ার সময় ১৮৭৬। আমরা স্মরণে রাখবো, মদনমোহনের প্রয়াণকাল ১৮৫৮। হিসেব অনুযায়ী, 'দুষ্ট পাঠ' মদনমোহনের দেখে যাওয়ার কথা নয়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এ ব্যাপারে বাক্-বিতণ্ডা হওয়ারও কথা নয়।

৬. অতএব আমরা মনে করি ১ম সংস্করণে যদি 'মধুকর মধুলোভে' অংশটুকু থেকেও থাকে, ২য় সংস্করণে মদনমোহন স্বয়ং তা পরিবর্তিত করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ 'মধুকর মধুলোভে' অংশটুকু পড়তে পারেন না। কারণ ১৮৫০-এই ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং সেখানে 'পরিমল লোভে অলি' অংশই আছে। তাই পূর্ণচন্দ্র-লিখিত কাহিনীর কোন সারবত্তা ও যৌক্তিকতা নেই।

৭. আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাস গৌরচন্দ্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন —

'চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু / ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই / অহনিশি রহত অগোর।।'

— এখানে 'পরিমল' অর্থ অবশ্যই 'সুগন্ধ'। ফুলের সুগন্ধে ভ্রমণ আকৃষ্ট হয়। মধুপান পরবর্তী পদক্ষেপ। পণ্ডিতকবি গোবিন্দদাস এর অর্থ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন নিশ্চয়ই।

'প্রভাত বর্ণন' কবিতাটির প্রকৃতিচিত্র কয়েকটি উপাদানের সাহায্যে গড়ে উঠেছে। উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়েছে প্রাণিজগত, প্রকৃতিজগত ও মনুষ্যজগত থেকে। প্রত্যেকটি উপাদান স্ব-স্ব ক্রিয়ার দ্বারা চিত্রিত। সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে। আবার, তিন জগতের উপাদান আন্তঃসম্পর্কে আবদ্ধ। একটু বিশ্লেষণ করে বিষয়টি দেখা যেতে পারে।

ক. প্রাণিজগত — পাখি , ক্রিয়া — রব করা।
— গরু , ক্রিয়া — মাঠে যাওয়া।
— অলি , ক্রিয়া — ফুলে উড়ে বসা।

খ. প্রকৃতিজগত — ফুল , ক্রিয়া — ফোটা।

— গগন , ক্রিয়াহীন। সূর্যের অবস্থান-স্থান।
— সূর্য , ক্রিয়া — আলোকবিতরণ।
— বাতাস , ক্রিয়া — বহমানতা।
— পাতা , ক্রিয়াহীন। পাতায় শিশিরপতন।
— শিশির , ক্রিয়া — পাতায় পতন।
গ. মনুষ্যজগত — রাখাল , ক্রিয়া — গরুর পাল-সহ মাঠে গমন।
— শিশু , ক্রিয়া — পাঠে মনোনিবেশ।

রাত পোহানো বা প্রভাত সূচনার প্রতিক্রিয়ায় পাখির ডাক, গরুর পাল সহ রাখালের মাঠে গমন এবং কাননে ফুল ফোটা। ফুল ফোটার প্রতিক্রিয়া সৌরভ প্রকাশ। তার পুনঃপ্রতিক্রিয়া ভ্রমরের আগমন। প্রভাতের পরিণতি আকাশে রক্তবর্ণ সূর্যোদয়। তার প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের আলোকপ্রাপ্তি। পুনঃ-প্রতিক্রিয়া মানস পুলক প্রাপ্তি। ভোরের অনুষঙ্গ শীতল বাতাস বহা এবং পাতায় পাতায় শিশিরপাত। সমগ্র ছবিটি প্রভাত-সূচনার সঙ্গে একতারে বাঁধা। লক্ষণীয়, অসংযুক্তাক্ষর শব্দচয়নে প্রভাতের কোমল ও মৃদুভাবটিকে সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে।

বারো পঙ্‌ক্তির এই কবিতায় প্রথম দশ পঙ্‌ক্তির সৌন্দর্যই আমাদের বর্তমান আলোচ্য। দশ পঙ্‌ক্তির মধ্যে শব্দ-নৈঃশব্দের জগতটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেক'টি ক্রিয়াপদ কবিতাটিকে ঘিরে আছে (পাখির রব করা, ফুল ফোটা, রাখালের গরুর পালসহ মাঠে যাওয়া, শিশুদের পাঠ করা, অলির ফুলে বসা, সূর্যোদয়, বাতাস-প্রবাহ, শিশিরপাত) তার মধ্যে তিনটি সরব, বাকি পাঁচটি নীরব। অর্থাৎ নীরবতাব প্রাধান্য।

।। শিশুশিক্ষা - ৩ ।।

প্রসঙ্গ ঃ সিংহ

১. একসময ভাবতীয় সিংহ গ্রিসদেশ থেকে শুরু করে আরব মধ্যপ্রাচ্য হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত দেখা যেত। বর্তমানে পশ্চিমভারতের গুজরাট রাজ্যের গির অরণ্য ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল থেকে তাদের বিলুপ্তি ঘটেছে। ১৯৭৮ সালে গির অঞ্চলে সিংহের সংখ্যা ২০০-র কম ছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০০। সিংহের এই সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ Lio Project। সিংহের বিজ্ঞানসম্মত নাম Panthera leo persica।

২. শুধু ঘাড়ে নয়, পুরুষ সিংহের মাথায় গলায় ও ঘাড়ে লম্বা লম্বা লোম হয়, যাকে কেশর বলে।

৩. পুরুষ সিংহের দেহের দৈর্ঘ্য ২৬০-২৯৫ সে.মি. ও সিংহীর দেহের দৈর্ঘ্য ২০০-২৭৫ সে.মি.। ওজন প্রায় ২২৫-২৫০ কে.জি.।

৪. সিংহ দলবদ্ধভাবে বাস করে। এক এক দলে প্রায় ২০টি সিংহ থাকে। ঐ দলে একাধিক সিংহ, সিংহী ও তাদের শাবক থাকে। সিংহ দিনের বেলায় ঝোপঝাড়ের আড়ালে বিশ্রাম নেয়। দিনান্তে ও ভোরবেলায় তারা শিকারের সন্ধানে বের হয়।

৫. সিংহীর গর্ভধারণ কাল প্রায় ১১৬ দিন। সিংহী সাধারণত ২-৩টি শাবক প্রসব করে। কখনও কখনও পাঁচটি শাবক প্রসব করতেও দেখা যায়। শাবকের জন্মের পর পুরুষ সিংহ সর্বদাই পরিবারের সঙ্গে থাকে। শিকার সংগ্রহ ও শাবকদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। সাধারণত ১৮ মাস থেকে ২ বছর অন্তর সিংহী শাবক প্রসব করে। প্রায় আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যে সিংহীর শাবকধারণ ক্ষমতা হয়।

প্রসঙ্গ ঃ হস্তী

১. এটি একটি প্রাচীন প্রবাদ মাত্র।

২. হাতির শুঁড়ের আগায় যে ছিদ্র আছে, সেটি তার নাসাছিদ্র।

৩. হাতির জীবনকালে গজদন্ত ছাড়া উপরের ও নিচের চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে সাতটি করে দাঁত দেখা যায়। গজদন্ত বিহীন পুরুষ হাতিকে 'মাখনা' বলে। তারা বিশালাকৃতি।

৪. হস্তিনীর গর্ভধারণকাল প্রায় ২০ মাস।

৫. বর্তমানে বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় হাতির সন্তান প্রসবের ঘটনা জানা যায়। সুতরাং 'পোষা হাতির সন্তান হয় না' — মন্তব্যটি সঠিক নয়। হাতির জীবৎকাল বিষয়ে লেখকের মন্তব্যটি সঠিক নয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন প্রাকৃতিক পরিবেশে হাতি প্রায় ৭০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। ভারতীয় হাতির বিজ্ঞানসম্মত নাম Elephas maximus।

প্রসঙ্গ ঃ ব্যাঘ্র

১. বাঘের বিজ্ঞানসম্মত নাম Panthera Tigris। বাঘ অসহায়, শিকারে অসমর্থ, আহত ও বয়স্ক হলে কখনও মানুষখেকো হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও হয়।

২. বাঘিনী সাধারণত ২-৩টি সন্তান প্রসব করে। কখনও সংখ্যাটি ৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বাঘিনীর গর্ভাবস্থাকাল ১৫-১৬ সপ্তাহ। বাঘ চার বছর বয়সে এবং বাঘিনী তিন বছর বয়সে যৌন পরিপূর্ণতা লাভ করে। বাঘের জীবৎকাল প্রায় ২০ বছর।

প্রসঙ্গ ঃ ভালুক

১. প্রকৃত তথ্য হল, ভালুকের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ঘ্রাণশক্তি ও স্পর্শশক্তির তুলনায় দুর্বল।

২. বিভিন্ন প্রজাতির ভালুকের গর্ভধারণকাল বিভিন্ন। সাধারণত এটি ৭ থেকে ৮ মাস পর্যন্ত হয়।

৩. এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। প্রকৃতপক্ষে ভালুকের সামনের পায়ের থাবাগুলি মানুষের হাতের মত ভিতরের দিকে ঘোরানো যায়। এ কারণে ভালুক যখন কোন প্রাণীকে আঘাত করার জন্য আক্রমণ করে তখন সামনের পায়ের থাবা দিয়ে বেষ্টন করে তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আঘাত করতে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে এর ফলে মনে হয় ভালুক দৃঢ় আলিঙ্গন করে আক্রান্ত প্রাণীকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে হত্যা করে।

প্রসঙ্গ ঃ গণ্ডার

১. স্ত্রী গণ্ডারের গর্ভধারণকাল ১৬ মাস। পুরুষ গণ্ডার ৭ বছর বয়সে এবং স্ত্রী গণ্ডার ৪ বছর বয়সে যৌন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

২. লেখকের এই মন্তব্যটি সঠিক নয়। গণ্ডারের শৃঙ্গের গড় দৈর্ঘ্য ২০সে.মি. (৮ইঞ্চি)। আসামে প্রাপ্ত দীর্ঘতম শৃঙ্গটির দৈর্ঘ্য ৬১সে.মি. (২৪ ইঞ্চি)। গণ্ডারের শৃঙ্গ খসে গেলে পুনরায় তা গজিয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গ ঃ উষ্ট্র

১. চারটি পাকস্থলী নয়, পাকস্থলীর চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে।

২. প্রকৃত তথ্য — উটের পাকস্থলীর তিনটি প্রকোষ্ঠ, যার মধ্যে ২টিতে থলির মত জলধারণ কোষ থাকে।

৩. প্রমাণ আছে উট একাদিক্রমে ২-৩ সপ্তাহ এক বিন্দু জল পান না করে ৫০০ কি.মি. পর্যন্ত যেতে পারে।

৪. কখনও কখনও দুটি সন্তান হতেও দেখা যায়।

কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্গ্রন্থ সমালোচনা।

LIFE OF THE LATE

MADANA MOHANA TARKA'LANKA'RA

AND A CRITICISM OF HIS WORKS.

The New Indian Press.

কলিকাতা।

৬৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট্, নূতন ভারত যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৮

মূল্য ।৵ আনা।

গ্রন্থ কর্ত্তার জীবন চরিত।

"মদনমোহন তর্কালঙ্কার[১] খৃঃ ১৮১৭ শকে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রাম* নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায়[২] কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের একজন লিপিকর ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ ৫টী সন্তান ছিল। দুই পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম মদনমোহন ও গোপীমোহন। মদনমোহন প্রথম সন্তান ও গোপীমোহন চতুর্থ সন্তান। রামধন চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত কালেজের কার্য্য হইতে অবসৃত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরতন চট্টোপাধ্যায় উক্ত কালেজের লিপিকরের পদ প্রাপ্ত হন। তর্কালঙ্কারের অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি পিতৃব্য রামরতন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কলিকাতায় আনীত ও সংস্কৃত কালেজে অন্তর্নিবিষ্ট হন। তথায় অতি অল্প দিন থাকিয়াই তিনি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া বাটী গমন করেন। বাটীতে রামদাস ন্যায়রত্ন, বনমালী বিদ্যারত্ন ও শিবনাথ সিদ্ধান্ত এই পণ্ডিত মহোদয়গণের নিকট ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন বাটীতে বিদ্যাধ্যয়নের পর তিনি আবার কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট হন। সংস্কৃত কালেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হওয়ার পর হইতে তাঁহার আদ্যোপান্ত বিদ্যালয়-জীবন সংস্কৃত কালেজের রিপোর্ট পুস্তক হইতে গৃহীত হইল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তর্কালঙ্কার দ্বিতীয়বার সংস্কৃতকালেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার তৎকালে বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজে প্রথম প্রবিষ্ট হন। তাঁহার বয়স তৎকালে দশবৎসর। তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর একশ্রেণীতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উদারচিত্ত ও অসাধারণ প্রতিভায় উভয়ের কেহ কাহারও ন্যূন ছিলেন না। প্রথম পুরস্কার ইঁহাদিগের দুইজন ব্যতীত অপর কেহ পাইতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর পরস্পরের প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব অতি গাঢ় ও গভীর ছিল। দুইজনে প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে, পরস্পরের উন্নতিতে পরস্পরের মনে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা কিন্তু তাঁহাদের উদারচিত্ত পরস্পরের উন্নতিতে বিন্দুমাত্র কাতর হইত না। বরং উভয়ের সাহায্যে উভয়েই উন্নত হইতে লাগিলেন। তিন বৎসরকাল ব্যাকরণশ্রেণীতে মুগ্ধবোধ পাঠ করিয়া উভয়েই সাহিত্য শ্রেণীতে উঠিলেন। তর্কালঙ্কারের রচনা প্রণালী অতি সুললিত ও প্রাঞ্জল ছিল। বিশেষতঃ এই অল্প বয়সেই তিনি আপনার অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বহু সংখ্যক অতি উৎকৃষ্ট ২ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। এইজন্য সাহিত্য শ্রেণীতে তিনি অধ্যাপকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আদরভাজন হইয়াছিলেন। তৎকালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহার এই আশ্চর্য্য কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারিতেন না। দুই বৎসর সাহিত্য শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া উভয় বন্ধুই অলঙ্কার শ্রেণীতে অলঙ্কার পাঠ আরম্ভ করেন। সুধীবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তৎকালে অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন। তর্কালঙ্কারের অসীম সহৃদয়তা ও ভাবগ্রাহিতায় তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার উপর অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। এই অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন সময়েই সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তর্কালঙ্কার রসতরঙ্গিণী নামক কবিতা গ্রন্থে বঙ্গভাষায় তাঁহার বিচিত্র কবিত্ব শক্তির প্রথম পরিচয় দেন।[৩] রসতরঙ্গিণীর রচনা এত সুমধুর ও প্রাঞ্জল যে আদিরস পূরিত না হইলে বোধহয় ইহা আবালবৃদ্ধ সকলেরই হৃদয় মন হরণ করিত। আমার বাক্যের পোষকতা সমর্থনের নিমিত্ত দুই এক স্থান হইতে

* লেখক 'বিল্বগ্রাম' শব্দটি সর্বত্র এই বানানে লিখেছেন।

শ্লোকচয় উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের নিকট ধারণ করিতেছি। তাঁহারা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে বঙ্গভূমি কিরূপ রত্ন হারাইয়াছেন।

"নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে।
দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভাগে।।
ইহা দেখে বিধি কৈল রমণীর মুখ।
দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টিমাত্রে সুখ।।
অতএব একবারে বিজ্ঞ হওয়া ভার।
দেখিয়া শিখিয়া হয় নৈপুণ্য সবার।।"
"বরং দিবস ভালো নিশা যেন হয় না।
অথবা নিশাই ভালো দিন যেন রয় না।।
কিংবা এ উভয় সখি! প্রাণে আর সয় না।
প্রিয় বিনে আর মনে কিছু ভালো লয় না।।"

রসতরঙ্গিণী হইতে যে দুইটী শ্লোকচয় উদ্ধৃত হইল ইহা যে ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ তাহা নহে। সমুদায় রসতরঙ্গিণীর মধ্যে ঐ দুইস্থান অনশ্লীল বলিয়াই তাহা উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ রসতরঙ্গিণী আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে তর্কালঙ্কারের কবিত্ব শক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন না। যে কবি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এরূপ রমণীয় কবিতা লিখিতে পারিয়াছিলেন, তিনি পরিণত বয়সে কবিতা লিখিলে যে কতদূর চমৎকার হইত তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। পাঠকগণের ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তর্কালঙ্কারের লেখনী হইতে যৎকালে রসতরঙ্গিণী বহির্গত হয় তখন আধুনিক অন্য কোন লেখকের লেখনী হইতে কিছুই বিনির্গত হয় নাই।[৪]

অলঙ্কার শ্রেণীতে দুই বৎসর পাঠ করিয়া তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর কিছুদিন জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করেন। জ্যোতিষের পর কিছুদিন দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া স্মৃতি শ্রেণীতে স্মৃতি পাঠারম্ভ করেন।

স্মৃতি শ্রেণীতে উঠিয়াই তর্কালঙ্কার মহাশয় বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাসবদত্তা[৫] রচনা করেন। এরূপ শুনিতে পাই যে ভারতচন্দ্রকে পরাজয় (পরাজিত) করাই তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বাসবদত্তা সমাপ্ত হইলে তর্কালঙ্কার মহাশয় বাসবদত্তা ও বিদ্যাসুন্দর উভয় পুস্তকের রচনা প্রণালী সমালোচনা করিয়া বিদ্যাসুন্দর উৎকৃষ্ট হইয়াছে স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আর কখন কবিতা লিখিবেন না। তদবধি প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার শেষ ভাগের কবিতাগুলি ব্যতীত জীবনে আর কবিতা লিখেন নাই। এই প্রবাদ যদি সত্য হয় তবে ইহা অতিশয় শোচনীয় ঘটনা বলিতে হইবে। কারণ যে কবি বিংশবৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন প্রায় ভারতের তুল্য হইয়াছিলেন তিনি যে পরিণত বয়সে ভারতকে পরাজয় করিতে পারিতেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

স্মৃতি শ্রেণীতে তিনবৎসর অধ্যয়ন[৬] করিয়া তৃতীয় বৎসরের শেষে স্মৃতি শাস্ত্রে পরীক্ষা দেন। একশত একবিংশ প্রশ্নের মধ্যে তিনিই কেবল অষ্ট চত্বারিংশ প্রশ্নের উৎকৃষ্ট রূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার উর্দ্ধ আর কেহ পারেন নাই। তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর উভয়েই এই স্মৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজপণ্ডিতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।[৭] এই পরীক্ষার পর ১৮৪২ খৃঃ অব্দে তর্কালঙ্কার বিদ্যালয় জীবন সমাপ্ত করেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া প্রথমত কলিকাতায় বঙ্গবিদ্যালয়ের[৮] প্রধান শিক্ষক হন। পরে বারাসতের গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের প্রথম পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন।[৯] বারাসতে এক বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া ফোর্ট উইলিয়ম্ কালেজের অধ্যাপকের পদে[১০] আরোহণ করেন। তথায় দুই বৎসর অতি সুচারুরূপে অধ্যাপনা কার্য্য সমাধান করেন। ইংলণ্ডীয় ছাত্রেরা তাঁহাকে এত ভক্তি করিত যে বিল্বগ্রামের নাম শুনিলে কর উত্তোলন করিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিতেন। ফোর্ট উইলিয়ম্ কালেজে দুই বৎসর অবস্থিতি করিয়া কৃষ্ণনগর কালেজ

সংস্থাপিত হওয়ার পর[১১] তথাকার প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণনগর কালেজের প্রায় অধিকাংশই তাঁহার নিকট বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। উক্ত কালেজের প্রধান পণ্ডিতের আসন এক বৎসর অলঙ্কৃত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে অভিষিক্ত হন।[১২] তাঁহার যশঃ শশাঙ্ক ঐ সময়েই পূর্ণকল হয়। সংস্কৃত কালেজ তাঁহার অবস্থিতিতে অতি উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার সুমধুর বচনবিন্যাস ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ছাত্রগণের শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিত। সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন মনে করিতেন। নিরহঙ্কারতা, বালক-সদৃশসারল্য ও অমায়িকতা তাঁহাকে সকলের নিকট প্রিয় করিয়াছিল।[১৩] তাঁহার যশঃ সৌরভ ইংরাজ মণ্ডলীতে ক্রমে ক্রমে বিধৃত হইতে লাগিল। তখনকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ বঙ্গ-কামিনীজন-পরম সুহৃৎ পণ্ডিত-শিরোমণি বেথুন্ সাহেব[১৪] তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিলেন। ইঁহাদের উভয়েরি মন বঙ্গীয় অবলাগণের উন্নতিসাধনে একান্ত ব্যগ্র ছিল। এক্ষণে উভয়ের সাহচর্য্যে সেই ব্যগ্রতা দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল। বেথুন্ সাহেব শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর। তাঁহার যে অভিলাষ সেই কার্য্য। বঙ্গবালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তিনি বেথুন্-বালিকা বিদ্যালয়[১৫] নামে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন।[১৬] পাঠকগণ! শিমলার হেদোর উত্তর পশ্চিম কোণে যে রমণীয় অট্টালিকা[১৭] দেখিতে পান উহা সেই বেথুন্ সাহেবের কীর্ত্তিস্তম্ভ। ঐ অট্টালিকার ভিত্তি পত্তন দিবসে[১৮] তর্কালঙ্কার ও বেথুন্ উভয়ে[১৯] সমবেত হইয়া ভিত্তির নিম্নে নবরত্ন[২০] নিখাত করেন। অট্টালিকা নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইল।[২১] কিন্তু আপন আপন কন্যা পাঠাইতে কেহই অগ্রসর হইলেন না।[২২] তর্কালঙ্কার মহাশয় ভুবনমালা ও কুন্দমালা নামক আপনার দুই কন্যাকে সর্ব্বপ্রথমে[২৩] বেথুন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া বঙ্গ দেশে বালিকা বিদ্যালয়ের সৃষ্টিকর্তা[২৪] বলিয়া জগন্মান্য হইলেন। হাইকোর্টের বিগত বিচারপতি অনরেবল্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত[২৫] ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ব্যাকরণের অধ্যাপক পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়[২৬] প্রভৃতি তর্কালঙ্কারের সাধু দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিলেন। ক্রমে বেথুন্ বিদ্যালয়ে বালিকা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।[২৭] বালিকা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল বটে কিন্তু তখন বঙ্গভাষায় বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগি কোন পুস্তক না থাকায় শিক্ষাকার্য্যের অতিশয় ব্যাঘাত হইতে লাগিল।[২৮] এরূপ দুরূহ শিক্ষাকার্য্যের ভার তর্কালঙ্কার ব্যতীত আর কেহ লইতে সক্ষম ছিলেন না বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপরই উহা অর্পিত হইয়াছিল। শুদ্ধ মুখে শিক্ষা দিলে বালিকারা তাহা ধারণা করিতে পারিবে না বলিয়া শিক্ষাকার্য্যের সৌকর্য্য বিধানের নিমিত্ত তর্কালঙ্কার ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত শিশুশিক্ষা ভাগত্রয় রচনা করেন।[২৯] প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা তিনি বেথুন্ সাহেবকে উৎসর্গ করেন সেই উৎসর্গ পত্রটী সাধারণের জ্ঞাপনার্থ এখানে সমুদ্ধৃত হইল।

মহামহিম মান্যবর শ্রীযুত জে, ই, ডি, বীটন
ভারতবর্ষীয় রাজসমাজসদস্য
শিক্ষাসমাজাধিপতি মহাশয়েষু।

সমুচিত সম্মানপূর্ব্বক — সবিনয় — নিবেদনম্

অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কি ছোট কি বড়, গ্রন্থকার মাত্রেই আপনার গ্রন্থ, যত তুচ্ছ হউক না কেন, কোন মহানুভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামানুগৃহীত করিয়া লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া থাকেন। এই বিশ্বজনীন ব্যবহার দর্শনে বাসনা হইয়াছে, আমারও পুস্তক সকল আপনকার নামাক্ষরসংযুক্ত হইয়া প্রচারিত হয়।

আপনি শিক্ষাসমাজের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া অস্মদ্দেশীয় লোকের বিদ্যা, বিনয়, শীল, সুনীতি সম্পাদনার্থে যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, বিশেষতঃ এতদ্দেশের হতভাগ্য নারীগণের দুরবস্থাদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অজ্ঞানান্ধকূপ হইতে তাহাদের উদ্ধার করিবার মানসে যে অশেষ প্রয়াস পাইতেছেন, আমি আপনার সেই সমস্ত বিশুদ্ধ গুণে মুগ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আপনকার সুপ্রতিষ্ঠিত নাম সংযোজন - সাহসে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে যদি আমি অনুযোজ্য হই, ভাবিয়াছি, আপনকার মহানুভব স্বভাব ও অলোকসামান্য গুণগ্রাম আমার পক্ষে সপক্ষতা করিবেক সন্দেহ নাই।*

আহা! কি মনোহর পদবিন্যাস! ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে যখন বঙ্গভাষার দুরবস্থার পরিসীমা ছিল না, যখন বঙ্গভাষা কিরূপে পুস্তক পড়িয়া শিক্ষা করিতে হয় তাহা লোকে জানিত না,[৩০] তখন আর কাহার লেখনী হইতে এরূপ অমৃতধারা নিঃসৃত হইয়াছিল? যখন বঙ্গভাষা প্রলয় নিদ্রায় অভিভূত ছিল তখন আর কে এরূপ পুস্তক পরম্পরা — লিখনোদ্যম — সাহসে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন? শোচ্যা বঙ্গভাষা! যে তাহার পিতা শিক্ষাবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবহার বিভাগে বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হন। আহা! তাহা না হইলে বঙ্গভাষা এত দিন কত রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইত। বস্তুতঃ ও বঙ্গভাষা তাঁহার যেরূপ প্রিয় ছিল, বঙ্গভাষার দুরবস্থাপনয়নে তিনি যেরূপ দৃঢ় সংকল্প ছিলেন, তাহা বাসবদত্তার প্রথমাংশের বন্দনাদির রচনা কৌশল দর্শন করিলে বিলক্ষণ জানিতে পারা যায়। সেরূপ পদযোজনা ক্ষমতা দেখিলে, বোধ হয় তিনি সংস্কৃত কবিতা অতি সুন্দর ও অতি মধুর ভাবে লিখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে প্রয়াস না করিয়া নিতান্ত অনুন্নতাবস্থা বঙ্গভাষার উন্নতি সম্পাদনে উদ্যত হইয়াছিলেন। যে পদযোজনাপ্রণালী অধুনাতম লোকদিগের বিশেষ চিত্তহারিণী নয়, অথচ সংস্কৃতে তাহা সমধিক গুণোপধায়িণী হইত কিন্তু তিনি তাহা লিখিয়াছেন, সে পদ-যোজনা-কৌশল বঙ্গভাষায়ই দেখাইয়াছেন। অথচ সেই দোষও তিনি স্বীয় স্কন্ধে লইয়াছিলেন। সে সব কেন? এই হতভাগ্য তৎকালে অপকৃষ্ট-দশাপন্ন বঙ্গভাষারই জন্য। বঙ্গ ভাষার শোচনীয় দুরবস্থা দর্শনে তিনি তাহা উন্মোচন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। শুদ্ধ বঙ্গভাষারই কেন? এই উৎসর্গ পত্রটী পাঠ করিলে এতদ্দেশের হতভাগ্য নারীগণের ও দুরবস্থা দর্শনে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের হৃদয় যে নিরতিশয় ব্যথিত হইত তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি স্ত্রী-জাতির শুদ্ধ শিক্ষা-বিধান কবিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এরূপ নহে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল।[৩১] তিনি যে শুদ্ধ এরূপ ইচ্ছা করিতেন এমন নয়, তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যেও পরিণত হইত।

শিশুশিক্ষা তিনখানির রচনা এরূপ মধুর ও সরল যে বঙ্গভাষায় বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগি ঈদৃশ পুস্তক আর দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশুশিক্ষার অনুবর্ত্তনে এখন শিশুগণের পাঠোপযোগি যে সকল পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে বিনির্গত হইতেছে তাহার এক খানিও সরলতায় ও মাধুর্য্যে অনুকৃত গ্রন্থের সদৃশ হয় নাই। বরং দুই একখানি এরূপ দুরূহ-শব্দ-সংঘটিত যে তৎপাঠে শিশুগণের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হইয়া বরং নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় যদি শুদ্ধ প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা লিখিয়া যাইতেন তাহা হইলেও তিনি জগতে সুকবি বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিতেন। পাঠকগণ! দেখুন দেখি —

(পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।। ইত্যাদি।)

বঙ্গভাষায় এরূপ কবিতা কি আর লিখিত হইয়াছে? ইহা পাঠ করিলে আপনাদের রমণীয় বাল্যকাল আবার চিত্রপটে কি অঙ্কিত হয় না, আবার আপনাদের মনে কি সেই বাল্যকাল-সুলভ মনোহর ভাবের

* নিবেদনপত্রটির যতিচিহ্ন এবং শুদ্ধ পাঠের জন্য মূল গ্রন্থের নিবেদনপত্রটি দ্রষ্টব্য।

সঞ্চার হয় না? তিনি যে স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা কি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না?

দ্বিতীয় ভাগ শিশুশিক্ষায় প্রত্যেক সংযুক্ত অক্ষরের উদাহরণ স্বরূপ যে সকল উপদেশবাক্য বিন্যস্ত হইয়াছে সেই সকল সুকুমারমতি শিশুগণের কোমল হৃদয়ে গুরূপদিষ্ট নীতিমালার ন্যায় আশৈশব বদ্ধমূল হইয়া থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শিশুশিক্ষা পাঠে শিশুগণ বিদ্যারম্ভের কঠোরতা কিছুই অনুভব করিতে পারে না। বরং এরূপ সরল কবিতামালা পড়িতে তাহাদের নবীন হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইতে থাকে। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষায় তাহাদের ভূয়ান অনুরাগ জন্মে। বিদ্যামন্দিরে প্রবিষ্ট হওয়ার এরূপ সহজ উপায় সত্ত্বেও অতি কঠোর উপায় কেন অবলম্বিত হইতেছে বলিতে পারি না। পুস্তকের গুণাগুণ বিচার না করিয়া শুদ্ধ নামে মুগ্ধ হওয়া বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়কদিগের উচিত নহে। তৃতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা কি অভিপ্রায়ে রচনা করেন তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহা তৃতীয়ভাগের মুখবন্ধে* স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

> তৃতীয়ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানা বিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল। কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ নির্ম্মলচিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণডিম্বপ্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থালী ও কাষ্ঠভার দর্শন ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন, পুরস্কার লোভে বক কর্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয়-মধুর-স্বর পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বন্ধ অবাস্তবিক বিষয় সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্বন্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বন্ধ করা গেল।

এই মুখবন্ধটি পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তর্কালঙ্কার মহাশয় অতি গভীর মানব-হৃদয়-তত্ত্ববিৎ ছিলেন। কিরূপে শিশুগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হয় তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। বঙ্গবাসিগণ সহজেই অতিশয় কল্পনাশক্তি-প্রবণ, তাহাতে যদি বাল্যাবস্থা অবধি তাহারা কাল্পনিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনা সকলে দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের কল্পনাশক্তি অনৈসর্গিক উত্তেজনা পাইয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে, ইহা তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তৃতীয়ভাগের গল্পগুলি বাল্যকালে যখন পড়িতাম তখন মনে কতই নব নব ভাবের উদয় হইত বলিতে পারি না। অদ্যাপিও সেই সকল গল্পগুলির মধুরতা ভুলিতে পারি নাই।[৫২]

শিশুশিক্ষাত্রয় রচনাতে বেথুন্ সাহেব তর্কালঙ্কারের উপর এত প্রীত হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার উপকার করিবার জন্য সতত ব্যগ্র থাকিতেন। একদা বেথুন্ সাহেব তর্কালঙ্কারকে বলিলেন "মদন! তোমার শিশুশিক্ষা রচনায় আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। আমি তোমার কোন উপকার করিতে ইচ্ছা করি। বল কি উপকার করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও।" তর্কালঙ্কারের উন্নত ও তেজস্বী মন ইহা সহিতে পারিল না। তিনি উত্তর করিলেন "মহাশয়! আপনি বিপুল জলধি পার হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গ কামিনীগণের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তন্মোচনের চেষ্টায় এই বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। আমি বঙ্গবাসী। বিদেশীয় মহাত্মা আমাদের দেশীয় রমণীগণের দুরবস্থা মোচনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমি তাঁহার চেষ্টার সাহায্যমাত্র করিয়াছি। ইহাতে আমি কিসে পুরস্কারের যোগ্য?" বেথুন্ সাহেব লজ্জিত হইয়া আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু প্রকারান্তরে তর্কালঙ্কারের উপকার করা তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প রহিল। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার নিমিত্ত তিনি তর্কালঙ্কারকে বেতন লইতে অনুরোধ করিলেন। তর্কালঙ্কার তাহাতে সম্মত না হইয়া পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সেই পদ প্রদান

* মুখবন্ধের শুদ্ধ পাঠের জন্য মূল গ্রন্থের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

করিলেন। বেথুনের উদ্দেশ্য বিফল হইল। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইল। এরূপ শুনিতে পাই বেথুন্ তর্কালঙ্কারকে এই পদ গ্রহণে অনুরোধ করেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ঐ পদের যোগ্যতর বলিয়া বেথুনের নিকট আবেদন করায়, বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তর্কালঙ্কারের ন্যায় সদাশয়, উদারচিত্ত ও বন্ধু-হিতৈষী ব্যক্তি অতি কম ছিলেন। হৃদয়ের বন্ধুকে আপন অপেক্ষা উচ্চতর পদে অভিষিক্ত করিয়া তর্কালঙ্কার বন্ধুত্বের ও ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

তর্কালঙ্কার স্বভাবতঃ উদরাময়-রোগ-প্রবণ ছিলেন। কলিকাতা তৎকালে অতি জঘন্য স্থান ছিল। বহুকাল কলিকাতায় থাকাতে তাঁহার পীড়া ক্রমে অচিকিৎস্যভাব ধারণ করিতেছিল। তিনি তিন বৎসরকাল সংস্কৃত কালেজে অবস্থিতি করিতেছিলেন এমন সময়ে মুর্‌শিদাবাদের জজ্‌পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। তর্কালঙ্কার কলিকাতায় থাকিয়া অতিশয় ক্ষীণবল হইয়াছিলেন, এইজন্য তিনি স্থান-পরিবর্তনমানসে বেথুনের নিকট ঐ পদে অভিষিক্ত হওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করেন। বেথুন্ সাহেব তর্কালঙ্কারের জন্য লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরকে এতদূর অনুরোধ করিয়াছিলেন যে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর পূর্ব্বেই তৎপদে নিয়োজিত এক ব্যক্তিকে কর্ম্মান্তরে নিয়োগ করিয়া তাঁহাকেই সেইপদে প্রতিনিবেশিত করেন।[৩৩] তর্কালঙ্কার ১২৫৭ সালে মুরশিদাবাদে যাত্রা করেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার সুবিখ্যাত নাম মুরশিদাবাদের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তিনি মুরশিদাবাদে পৌঁছিয়া চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় সর্ব্বত্র সমাদরে পরিগৃহীত হইলেন। তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি, মধুর বচন ও গভীরবুদ্ধি আবালবৃদ্ধ সকলেরই নিকট তাঁহাকে প্রিয় করিয়াছিল। জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্, কলেক্টর সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তদ্দত্ত ব্যবস্থা কেহই খণ্ডন করিতে পারিতেন না। তর্কালঙ্কারের বক্তৃতা শক্তি মুর্‌শিদাবাদে প্রথম বিকশিত হয়। তিনি মুরশিদাবাদে বহুল সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং বক্তৃতা করিয়া দেশের হিতার্থে লোকের মন বিনত করিতেন। বিধবা ও অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য মুরশিদাবাদে তিনি এক দাতব্যসভা সংস্থাপন করেন। অদ্যাপিও অনেক বিধবা ও দরিদ্রবালক বালিকারা সেই দাতব্যসভা হইতে জীবিকা প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি মুরশিদাবাদে একটি অতিথিশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় কাণখঞ্জ প্রভৃতিরা অন্নাচ্ছাদনাদি প্রাপ্ত হইত। পাঠকগণের মনে করিয়া দেখা উচিত যে এরূপ দাতব্য সভা ও অতিথিশালাদি সাধারণ্যে সংস্থাপন করার প্রথা পূর্ব্বে বড় প্রচলিত ছিল না। সুতরাং তর্কালঙ্কারকে ঐ সকল সাধারণ হিতকরী প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা বলিলেও বলা যাইতে পারে।

তিনি মুরশিদাবাদে ছয় বৎসর কাল জজ্‌পণ্ডিতের পদ অধিকার[৩৪] করিয়া দেখিলেন তাঁহার মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত চালনা অভাবে নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। কারণ তৎকালে হিন্দু-ব্যবহার-বিষয়িণী ব্যবস্থার বিতর্ক উপস্থিত হইলেই জজ্‌পণ্ডিত প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক ধর্ম্মাধিকরণে আহুত হইতেন। অন্য সময় জজ্‌পণ্ডিতকে গৃহে বসিয়াই কালক্ষেপ করিতে হইত। তর্কালঙ্কার সেই জন্য ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের পদের নিমিত্ত আবেদন করেন এবং মুর্‌শিদাবাদেই ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন।[৩৫] পণ্ডিত শ্রী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তর্কালঙ্কার-পরিত্যক্ত জজ্ পণ্ডিতের পদে মনোনীত হন। এই সময় বিধবা-বিবাহের প্রথম আন্দোলন উপস্থিত হয়।[৩৬] শ্রীশ বাবু প্রথম বিধবা-পরিণেতা। তর্কালঙ্কারের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। তর্কালঙ্কার তাঁহার বিবাহের সম্পূর্ণ যোগাযোগ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম পরিণীতা বিধবা বালিকার সংযোজন-কর্ত্তা। ঐ বিধবাবালা, মাতার সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শ্বশুরালয়ে প্রায় সততই গমনাগমন করিত। তাঁহারই বিশেষ প্রযত্নে মাতা ও কন্যা কলিকাতায় প্রেরিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিদ্যালয়ে সর্ব্ব প্রথমে কন্যা সম্প্রদান ও প্রথম বিধবা বিবাহের সাহায্য করায়, স্বদেশীয় লোকের বিশেষ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। অধিক কি এই দুই কার্য্যের নিমিত্ত তিনি ৮/৯ বৎসর সমাজচ্যুত ছিলেন। যে সমাজ সংস্কারক বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, এবং যিনি তজ্জন্য আজীবন সমাজ কর্ত্তৃক উপক্রত হইয়াছেন,[৩৭] সেই মহাত্মা আমাদের পরম-ভক্তিভাজন সন্দেহ নাই।

তর্কালঙ্কার যৎকালে মুরশিদাবাদে অবস্থিতি করেন তখন তাঁহার পরম বন্ধু মহাত্মা বেথুনের মৃত্যু হয়।[৩৮] বেথুনের শোকে তর্কালঙ্কার নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। তিন দিন তিনি অবিশ্রান্ত রোদন করিয়াছিলেন। বেথুনের মৃত্যু তর্কালঙ্কারের হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা হইতেই পারে! বেথুন্ তর্কালঙ্কারকে যেরূপ ভাল বাসিতেন এরূপ ভালবাসা বিদেশীয় ও স্বদেশীয়ের মধ্যে প্রায় ঘটে না। তিনি তর্কালঙ্কারের কন্যাদ্বয়কে আপনার কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। তাহাদিগকে দেখিলে তিনি আহ্লাদে পুলকিত হইতেন। তিনি প্রায়ই স্বভবন গমনকালে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে উভয় কক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয়াবাসে লইয়া যাইতেন। তাহাদের বালিকা-সুলভ জুগুপ্সিত অত্যাচার সকল তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক সহ্য করিতেন। ভুবনমালা ও কুন্দমালা বেথুনের এতদূর স্নেহভাজন হওয়াতে লেডি ড্যালহাউসি প্রভৃতিও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন।[৩৯] বেথুন এরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন যে তর্কালঙ্কারের গুণগ্রাম তিনি কখনই ভুলিতে পারেন নাই। তিনি এক সময় কোন কার্য্যোপলক্ষে তর্কালঙ্কারের বিষয়ে তাঁহার এরূপ মত প্রকাশ করেন যে "He will never require service but service will ever require him" তিনি কখন কার্য্যপ্রার্থী হইবেন না কিন্তু কার্য্য সততই তৎপ্রার্থি রহিবে। এরূপ বন্ধু বিয়োগে তর্কালঙ্কারের যে এতদূর কষ্ট হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

তর্কালঙ্কার মুরশিদাবাদে এক বৎসর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে অধিরূঢ় ছিলেন। তাহার পর তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়াতে শরীরের স্বাস্থ্য পুনঃ সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি ময়ূরাক্ষী - নির্ঝরিণী - তীরবর্ত্তি - কান্দীনগর যাত্রার অভিলাষ প্রকাশ করেন। মুরশিদাবাদের জজ্, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে তর্কালঙ্কারের নিমিত্ত কান্দীতে নূতন মহকুমা সংস্থাপনের অনুরোধ করেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে তর্কালঙ্কারকে কান্দীতে প্রথম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনুগ্রহ আর অতি অল্প লোকের প্রতি করিয়াছেন।

কান্দী তর্কালঙ্কারের কীর্ত্তির চরমস্থান। কান্দীতে তিনি যৎকালে প্রথম আসেন তখন সেখানে রাস্তা, ঘাট, বিদ্যালয় প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তিনি আসিয়া এই সকলের প্রথম সৃষ্টি করেন। মুরশিদাবাদের ন্যায় কান্দীতেও একটী অনাথমন্দির সংস্থাপন করেন। কত দীন দরিদ্র তাঁহার দাতব্যে জীবন ধারণ করিত বলা যায় না তিনি অনাথদিগের মা রূপ ছিলেন। কত কত পরিত্যক্ত বালক বালিকাকে তিনি পথ হইতে কুড়াইয়া লইয়া গৃহে আনিয়া স্বীয় যত্নে প্রতিপালিত করিতেন। বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন।[৪০] তথায় স্বীয় দুহিতাগণ ও অপর অপর লোকের কন্যারা বিদ্যাশিক্ষা করিত। তিনি স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ইহা ভিন্ন কান্দীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়েরও ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা। তর্কালঙ্কারের মনুষ্য-প্রেম মানবজাতির জীবদ্দশাতেই পর্য্যবসিত হইত এরূপ নয়; প্রাণাপগমেও ইহা সহচরের ন্যায় তাহাদিগের অনুগমন করিত। দীন দরিদ্রেরা অর্থাভাবে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিরও মৃতদেহ অযথাস্থানে নিক্ষেপ করিয়া যাইত। তিনি শকুনী গৃধিনী প্রভৃতির করাল কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্বব্যয়ে তাহাদের অগ্নি-সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

কান্দীতে কিছুদিন অবস্থিতির পর তর্কালঙ্কার শুনিলেন যে মাকালতোড় নামক স্থানে একটী কৃত্রিম যুদ্ধ হইবে। ঐ স্থানে দুই দুর্দ্দান্ত মুসলমান্ জমিদার ছিল। বিশেষ পর্ব্বাহ উপলক্ষে ঐ দুই রাজার সেনাদল গ্রামের নিকটবর্ত্তি প্রান্তরে সমবেত হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। ঐ যুদ্ধে প্রতিবৎসর অনেক লোক হত ও আহত হইত। এই প্রথা বহুকাল অবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। একবার একজন ইংরেজ মেজিষ্ট্রেট্ ইহা নিবারণ করিতে গিয়া হত হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তথাপিও স্থির করিলেন যে এই যুদ্ধ প্রতিরোধ করিবেন। কারণ প্রতিবৎসর এত নরহত্যা উপেক্ষা করা রাজ প্রতিনিধির উচিত নয়। তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসাধনকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর মনে করিতেন। সেইজন্য তিনি মনে করিলেন যে তিনি যে পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কর্ত্তব্য শান্তিরক্ষা, সেই কর্ত্তব্য সাধন জন্য প্রাণের

ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেখানে যাইবেন স্থির করিলেন। প্রিয়তম আত্মীয় পরিজনের ক্রন্দন ও শতশত অনুরোধ না মানিয়া যুদ্ধের দিন তিনি পুলিস সৈন্য সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইলেন। এই অশ্বটী যুদ্ধের অশ্ব। সে উভয় সৈন্যকে রণসজ্জায় সজ্জিত দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বল্‌গাকৃষ্ট হইয়াও বেগে সেনাব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিল। পুলিশ সৈন্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের অনুবর্তন করিতে সাহস করিল না। কেবল হরিসিংহ নামক একজন প্রভু-পরায়ণ-দ্বারবান্ প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইল। অশ্ব উভয়দল সেনার মধ্যে প্রবেশ করিল। ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটকে মধ্যবর্ত্তী দেখিয়া উভয়দলই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ঘোটক পদদেশে আঘাত পাইয়া ভূতলে পতিত হইল। অশ্বের পতনবেগে আরোহীও ভূপতিত হইলেন। প্রভু-পরায়ণ ভৃত্য অমনি, নিজ শরীর দ্বারা স্বামীর শরীর, ও চর্ম্ম দ্বারা তাঁহার মস্তক, আবরণ করিল। ভৃত্য আহত হইল। প্রভু মূর্চ্ছিত রহিলেন, সেনারা পলায়ন করিল। তাহারা পলায়ন করিলে, পুলিশের লোকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্‌কে নিকটবর্তী কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে লইয়া গেল। তথায় গিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইল। কিন্তু তাঁহার মন একবারে ভগ্নোদ্যম হইল। ভাবিলেন, যে, এরূপ দুর্দ্দান্ত জমিদারেরা রাজপ্রতিনিধিকে আক্রমণ করিয়াও যদি নিষ্কৃতি পায় তাহা হইলে ইহাদিগের দৌরাত্ম্যে এ প্রদেশে লোকের বাস করা দায় হইবে। তিনি রাজ প্রতিনিধি হইয়া যদি তাহাদিগকে শাসন করিতে না পারেন তবে আর কে করিবে, এই ভাবিয়া তাঁহার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইল। তিনি কিছু সুস্থ হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। দুই এক দিন বাটী থাকিয়াই লোক জন সমভিব্যাহারে মাকালতোড়ে পুনরায় আগমন করিলেন। তথায় অপরাধিদিগকে ধৃত করিয়া তাহাদিগকে আদালতে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু জমিদারদিগের এরূপ শাসন যে কেহ সত্য সাক্ষ্য দিল না। এজন্য বিশেষ প্রমাণাভাবে অপরাধিরা উচ্চ বিচারালয়ে মুক্তিলাভ করিল। তর্কালঙ্কার এই ঘটনায় নিরতিশয় কাতর হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "আজ আমার অর্দ্ধ মৃত্যু হইল।" তিনি এখন হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, যে, যত শীঘ্র পারেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। কারণ এরূপ দুর্দ্ধর্ষ জমিদারেরা যখন উচ্চ আদালত হইতে এরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইল তখন তাহারা তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্তও সংহার করিতে চেষ্টা করিতে পারে ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ সে স্থলের শান্তি রক্ষা করা তাঁহার প্রধানতম উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য ছিল। জমিদারেরাই সেইরূপ যুদ্ধের ও নর-হত্যার মূলীভূত কারণ ছিল। এক্ষণে তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া আরও প্রশ্রয় পাইবে, আরও দুর্দ্দান্ত হইবে। শান্তি সেখানে কখনই রক্ষিত হইবে না। আবার শান্তিরক্ষার জন্যে সেরূপ ঘটনায় পুনর্ব্বার সেখানে গেলে তাঁহাকে অকৃতকর্ম্মা হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। তিনি দমনের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে দেখিলেন তাহাতে তিনি কৃত-কার্য্য হইতে পারিবেন না। কেননা উচ্চ আদালতকে আর তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না — দেখিলেন প্রকৃত প্রমাণাভাবে অসত্যও রক্ষিত হইতে পারে — দেখিলেন এরূপ স্থলে প্রকৃত প্রমাণের অসদ্ভাব; জমিদারেরা সেখানকার প্রধান লোক, সকলেই তাহাদের বশীভূত। সুতরাং আর তাহাদিগকে দমন করিতে পারিবেন না, দুর্দ্দান্তেরা দণ্ডিত হইল না, এই ভাবিয়াই তিনি নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ ও দুর্ম্মনায়মান হইলেন, মনে করিলেন, নিশ্চয়ই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। তিনি পরিবারবর্গের নিকট আপনার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। "জীবনে আর কখন কবিতা লিখিব না" এ প্রতিজ্ঞা তাঁহার এখন শিথিলবল হইল। তিনি এক্ষণে স্থির করিলেন যে অন্ততঃ বৃক্ষতলে বসিয়াও কবিতা লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। তথাপি, এ জীবনে, এ পদে, এ সম্মানে আর কায (কাজ) নাই; কিন্তু মৃত্যু তাঁহার সকল সঙ্কল্প বিফল করিল। অপরাধীরা মুক্তি লাভ করাতে তর্কালঙ্কারের মনে নিরতিশয় অপমান বোধ হইয়াছিল। তিনি সেই অবধি স্নান ভোজনাদি অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকার্য্যেও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। শরীর ও মন দিন দিন নিস্তেজ হইতে লাগিল। এই সময়ে কান্দীতে ওলাউটা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তর্কালঙ্কার ঐ শোচনীয় ঘটনার প্রায় দুই মাস পরে ১২৬৪ সালের ফাল্গুণ মাসের সপ্তবিংশ দিবসে ঐ ভয়ঙ্কর রোগের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন।

কান্দীতে উপযুক্ত চিকিৎসকাভাবে তাঁহার যথারীতি চিকিৎসা হইল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর নীলিমা প্রাপ্ত হইল ও কণ্ঠস্বর ভগ্ন হইল। পত্নী শয্যা পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতেছিলেন। তিনি গুরু শোকে ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। রোগীর পাছে কষ্ট হয় এই জন্য তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে পরিলেন না। কিন্তু অনিবার্য্য ধারা তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। চতুর্দ্দিকে কেবল অকূল-দুখসাগরের পরিবেশমণ্ডল দেখিতে লাগিলেন। দশমবর্ষীয়া বালিকা ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালকের সহিত পরিণয়সূত্রে সম্বন্ধ হন। সেই অবধি তাঁহাদের পরস্পর প্রেম দিন দিন উপচীয়মান হইতেছিল। পূর্ণ বৃদ্ধির সময় এই ভীষণ বিপৎপাত! আশৈশব, কি সম্পদে, কি বিপদে, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, ছায়ার ন্যায় যে স্বামীর অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, মদনাধিক-সৌন্দর্য্য সেই স্বামী তাঁহাকে অনাথিনী করিয়া অপুনরাগমনের নিমিত্ত পরলোক গমন করিবেন, একে এই ভাবনায় তাঁহার হৃদয় অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছিল, আবার স্বামীর আদরিণী কিশোরবয়স্কা দুহিতাগণ পিতৃবিয়োগে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে এই চিন্তায় তাঁহার অর্দ্ধ দগ্ধ হৃদয় পূর্ণ দগ্ধ হইল। অশ্রুযুগলের নীরন্ধ্র-ধারা-পটল-সন্দর্শনে রোগীর মন গলিত হইল। তিনি কাতরস্বরে বলিলেন "তুমি কেঁদোনা, তোমার চির সহচর তোমায় ফেলিয়া পলায়ন করিতেছে বটে কিন্তু তাহার প্রাণসখা ঈশ্বর তোমায় সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দিবে। তাহার জীবদ্দশায় তুমি ও আমার প্রাণসমা কন্যাগণ কোন কষ্ট পাইবে না। আমার আর এক প্রার্থনা আছে, আমি তোমাদের নিকট কৃতঞ্জলিপুটে এই ভিক্ষা চাই যেন আমি প্রশান্তভাবে মরিতে পাই; মৃত্যুর পূর্ব্বে যেন আমায় শয্যা হইতে মৃত্তিকায় নামান না হয়।"

এই বলিতে বলিতে সেই অমৃতভাষিণী জিহ্বা নিস্তব্ধ হইল। যে রসনা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পত্নী, দুহিতা, ধনী, দীন সকলেরই কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিত সেই রসনা এ জীবনের মত বাক্যস্ফুরণ ক্লেশ হইতে অবসৃত হইল। যে মদন-মোহন মূর্ত্তি আবাল বৃদ্ধ সকলেরই চিত্তহারিণী ছিল, মৃত্যুর করস্পর্শে তাহা আর সেরূপ চিত্তহারিণী রহিল না। দৃষ্টি রহিত হইল। গাত্রে যেন কে জল ঢালিয়া দিল। চতুর্দ্দিকে রোদন ধ্বনি উঠিল। সমুদায় কান্দী নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল।

পিতাকে মৃত্যু শয্যায় শয়ান দেখিয়া পিতৃ-সোহাগিনী শিশু কন্যাগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহাদের রোদনে পশু পক্ষীরও চক্ষু হইতে শোকাশ্রু নির্গত হইল। শয়নে, অশনে ও ভ্রমণে যাহারা পিতা বই আর কিছুই জানিত না সেই আদরিণী বালিকারা আজ পিতৃবিয়োগিনী হইল। কে আর তাহাদিগকে সেরূপ পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিবে? বঙ্গাঙ্গনাদের আদর আর কে বুঝিবে? তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আর কাহার হৃদয় দগ্ধ হইবে? বঙ্গীয় রমণীগণ! তোমাদের পরমবন্ধু আজ সংসারলীলা সম্বরণ করিলেন। এখন কি তোমরা নিশ্চিন্ত ও উদাসীন থাকিবে? এস সকলেই শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করি। এদিকে পত্নী ধরাশয্যায় শয়ান। ঘন ঘন বিবর্ত্তনে তাঁহার অঙ্গ ধূলি-ধূসরিত ও কেশপাশ আলুলায়িত হইতেছিল। কে তাঁহায় সান্ত্বনা দিবে? কি বলিয়াই বা সান্ত্বনা দিবে? এ অকূল বিপদ্‌সাগরের কূল কে দেখাইয়া দিবে? এমন কর্ণধার কে আছে? যে মোহনকান্তি পূর্ব্বে দেখিবামাত্র হৃদয় ও মন আনন্দে পুলকিত হইত সেই মোহনকান্তির মোহিনীশক্তি এখন অন্তর্হিত হইল। এক্ষণে ইহা দেখিবামাত্র কেবল শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠে। সেই শোচনীয় দৃশ্য অধিকক্ষণ আর কে দেখে? তাঁহার আস্থান ময়ূরাক্ষীর তটেই। যে ময়ূরাক্ষীর সুস্নিগ্ধ সমীরণ তর্কালঙ্কারের শ্রান্ত শরীর সুশীতল করিত, যাহার কাকচক্ষু সদৃশ জল পান করিয়া স্বাস্থ্য পুনঃসংস্থাপন করিবেন বলিয়া তর্কালঙ্কার মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই প্রিয়তমা ময়ূরাক্ষীর ক্রোড়ে তিনি অনন্তনিদ্রায় অভিভূত রহিলেন। যিনি বঙ্গভাষার জীবন প্রদান ও বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত করিয়াছেন সেই মহাত্মা ময়ূরাক্ষীতীরে অজ্ঞাতবাসে চির নিদ্রা যাইতেছেন, বঙ্গবাসিগণ অনেকেই ইহা অবগত নন্। যদি উপকারকের প্রত্যুপকার করা উচিত হয় তবে বঙ্গবাসিগণ! আসুন্ আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার বিলুপ্তপ্রায় নাম বঙ্গের চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করি।

জ্যেষ্ঠাকন্যা ভুবনমালা পিতার সহিত ঐ করাল রোগে আক্রান্ত হন। তিনি এই সময়ে পূর্ণগর্ভা ছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পরও একদিন কি দুই দিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এরূপ পিতৃপরায়ণ ছিলেন যে পিতার মৃত্যুর পর একমুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। পিত্রনুগমন তাঁহার স্থিরসংকল্প হইল। সুচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কান্দী হইতে বহরমপুরে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু বহরমপুর আসিয়াই তিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন।

তর্কালঙ্কার সহধর্ম্মিণীকে তিনমাস অন্তঃসত্ত্বা রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন।[৪১] এই গর্ভে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ ৮ কন্যা ও তিন পুত্র হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় যে তিন পুত্র ও দুই কন্যা শৈশবাবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করে। অবশিষ্ট ছয়কন্যার মধ্যে পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে জ্যেষ্ঠা পিতার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। এক্ষণে পাঁচ কন্যামাত্র জীবিত আছেন, তর্কালঙ্কার কন্যাদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। কেহ কন্যা বলিয়া ঘৃণা করিলে তিনি তাহা সহিতে পারিতেন না। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁহাদিগের যথাবিধি শিক্ষাবিধান করিতেন। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, শিক্ষণীয়তিযত্নতঃ" কন্যাশিক্ষা - বিধায়িণী এই নীতির সার্থকতা প্রথমেই তিনি সম্পাদন করেন। কন্যাগণ রূপে ও বুদ্ধিতে পিতৃসদৃশা। পিতার অকালমৃত্যু না হইলে, বোধহয়, তাঁহারা এতদিন বিদ্যা ও গুণে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়া বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিতেন। তাঁহার এক্ষণকার তৃতীয়কন্যা যে পিতৃসম্বন্ধিনী কবিত্ব-শক্তির কিঞ্চিৎ ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। পাঠকগণ তাঁহার রচিত নিম্ন লিখিত পদ্যটী পাঠ করিলে ইহা বুঝিতে পারিবেন।

"করিতে পদ্যরচনা, হতেছে মনে বাসনা,
কিন্তু কেমনে রসনা করিবে বর্ণন?
ইচ্ছা হয় সযতনে, গাঁথি কাব্য, সাধুজনে
ভক্তি-সহ করিতে প্রদান।
কেমনে রচিব হায়! সহজে অবলা তায়,
নাহি কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞানের প্রভাব।
নাহি মম বোধোদয়, কিসে হবে বোধোদয়?
যেগুণে লিখিব কাব্য, তাহার অভাব॥
নাহি জানি অলঙ্কার, কি দিয়া গাঁথিব হার,
যাহে সুধীজন-মন করিব হরণ?
ন্যায়ে নাহি অধিকার, কেমনে করি বিচার
যাহে ভাল মন্দ পারি করিতে বর্ণন।
বিপিনে কুরঙ্গীচয় বৃথা মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
জলভ্রমে মরু যথা করয়ে ভ্রমণ।
সেই মত মম আশ, না হইবে পরকাশ
ভাবি তাই; ভেবে তাই কাঁদি অনুক্ষণ॥
দয়াময় কৃপাগুণে, করুণা প্রকাশ দীনে
সুপ্রভাত কর আজি যাম॥
কোথা দেবি বীণাপাণি! ও চরণ হৃদে আনি,
নানা মতে করিগো বন্দন।
কোথা গো শরদাননে! বাক্যদান কর দীনে,
তব পদে এই নিবেদন॥
বিতর করুণা-কণা, যেন না হই বঞ্চনা।
সুধাদানে ক্ষুধা মম হর।

করিব গ্রন্থ সূচনা, ক'রো নাকো প্রবঞ্চনা,
ধর মম ক্ষুদ্র উপহার॥"

যদিও এই রচনাটী এখানে উদ্ধৃত করা নিতান্ত সমীচীন নহে তথাপি তাঁহার অদ্ভুত স্ত্রীশিক্ষা-কৌশল, দেখাইবার জন্যই এটী এখানে দেওয়া গেল।

দেখুন, অষ্টাদশবর্ষীয়া বালা এরূপ অশিক্ষিত অবস্থায় যখন এমন কবিতা রচনা করিয়াছেন, তখন যে তিনি পিতার স্বাভাবিকী কবিত্ব শক্তির কিছু অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্যান্য কন্যাগণ বিশেষতঃ বর্ত্তমান দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যাও উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে অক্ষমা নন্। বিশেষ বাহুল্য ভয়ে এখানে আর ইঁহাদিগের রচনা দেওয়া গেল না।

তর্কালঙ্কারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীমোহনও কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনিও অতি ধীরবুদ্ধি ছিলেন। কিন্তু দুরন্ত ওলাউটা রোগ অতি অল্পবয়সেই তাঁহার প্রাণসংহার করে। সুতরাং তর্কালঙ্কার পতিহীনা জননীর একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। কান্দীতে তাঁহার যৎকালে মৃত্যু হয় তখন তাঁহার অভাগিনী মাতা স্বদুহিতৃগণ সমভিব্যাহারে বিল্লগ্রামে বাস করিতেছিলেন। বহরমপুর হইতে বিল্লগ্রামে প্রত্যাগত পুত্রবধূর রিক্ত হস্ত তাঁহাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্তে ফেলিয়া দিল। তাঁহার একমাত্র অন্ধের যষ্টি কে হরিয়া নিল? একমাত্র পুত্রশোককাতরা বৃদ্ধা জননীর হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদে পাষাণও দ্রবীভূত হইয়াছিল। তর্কালঙ্কার ভগিনীগুলিকে প্রায় স্বহস্তেই প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এত ভাল বাসিতেন যে তাঁহাদের অনভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে কখন শ্বশুরালয়ে পাঠান্ নাই। ভগিনীপতি দিগকে বাটী আনিয়া তাঁহাদের ক্ষমতানুসারে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বিধান করিয়া দিতেন।* সুতরাং ভগিনীরা ভ্রাতৃবিয়োগে যে শুদ্ধ ভ্রাতৃবিহীনা হইলেন এরূপ নয়; তদ্বিয়োগে তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হইলেন।

গুরুব্যবসায়োপজীবী বিল্লগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তর্কালঙ্কারের উচ্চাশয়তা কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই। তিনি অধুনা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না বলিয়া তাঁহারা গ্রামের হিতকরী তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল করিতেন। তর্কালঙ্কার বিল্লগ্রামে রাস্তা, ঘাট, বিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার পরমবন্ধু বেথুন্ শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তর্কালঙ্কারের অনুরোধে তিনি কি না করিতে পারিতেন? প্রত্যুত তর্কালঙ্কারের কথামাত্রে বিল্লগ্রামে অপূর্ব্ব বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু ভট্টাচার্য্য-মহাশয়দিগকেএরূপ বিশ্বাস ছিল যে তর্কালঙ্কার বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া গ্রামের বালকদিগের কেবল খৃষ্টান্ করিবেন। বিল্লগ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপনের যৎকালে প্রথম আন্দোলন হয় তখন পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভারতবর্ষীয় ডিমস্থেনিস মৃত মহাত্মা বাবু রামগোপাল ঘোষ, সুধীবর মৃতমহাত্মা তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তর্কালঙ্কারের বন্ধুবর্গ বিল্লগ্রাম নিবাসী পণ্ডিতগণকে সদ্যুক্তিদ্বারা বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে সম্মত করিতে বিল্লগ্রামে গমন করেন। পণ্ডিত মহাশয়েরা এরূপ কর্কশভাষী ছিলেন যে উক্ত মহোদয়গণের অন্যতমকে অতি বীভৎসগালি দিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। উক্ত পণ্ডিতবর্গ যদি বিল্লগ্রামের বর্ত্তমান দুরবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন তর্কালঙ্কার বিল্লগ্রামের কতদূর হিতৈষী ছিলেন। যে তর্কালঙ্কার হইতে বিল্লগ্রামের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে, এবং যতদিন বঙ্গে বিদ্যানুশীলন থাকিবে ততদিন যে তর্কালঙ্কারের নামের সহিত বিল্লগ্রামের নাম বঙ্গের চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইবে সেই তর্কালঙ্কারের মহিমা বিল্লগ্রাম নিবাসী মহোদয়েরা কখন অনুভব করিতে পারিলেন না ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে।

* 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' দ্রষ্টব্য

বঙ্গভাষার পরমবন্ধু কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের অমূল্য জীবন-চরিত সমাপ্ত করার পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন এবং পুস্তক সংস্করণ ও মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত কিছু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। ১২৫৪ সালে যখন বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রায় ছিল না[৪২] সেই সময় তিনি সংস্কৃত যন্ত্র নামক অধুনা সুবিখ্যাত মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করেন।[৪৩]

ভারত-রচিত অন্নদামঙ্গল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে এই যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।[৪৪] সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী, চিন্তামণি-দীধিতি, বেদান্ত-পরিভাষা এই তিনখানি পুস্তকের সংস্করণ ও প্রথম মুদ্রাঙ্কন দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের বিলক্ষণ উপকার করিয়া গিয়াছেন। শব্দশক্তি প্রকাশিকা ও বোপদেবের ধাতুপাঠ এই দুই খানি ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং কাদম্বরী, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত এই তিনখানি সাহিত্যগ্রন্থ সংশোধিত ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণ সংসারে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।[৪৫] সংস্কৃত পুস্তক সকলের সংস্করণ ও মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে তিনি প্রথম পথ-প্রদর্শক। সংস্কৃত ভাষায় অধুনা যে ভূরি ভূরি গ্রন্থ সংস্কৃত ও মুদ্রিত হইতেছে তিনিই তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি "সর্ব্বশুভকরী" নামে এক অতি অপূর্ব্ব সংবাদ পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৪৬] সর্ব্বশুভকরীর সময় "রসরাজ" ও "প্রভাকর" ব্যতীত বঙ্গভাষায় অন্য সংবাদ পত্র প্রায় ছিল না।[৪৭] রসরাজ ও প্রভাকর গদ্য-পদ্য মিশ্রিত। কিন্তু শুদ্ধ গদ্যে সংবাদপত্র ইহার পূর্ব্বে আর প্রকাশিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। সুতরাং তর্কালঙ্কার এই নব্য আকারে সংবাদ পত্র প্রচলিত করার প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতাল পঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচর লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।[৪৮] বিদ্যাসাগর রচনা বিষয়ে তর্কালঙ্কারের উৎকর্ষ এতদূর অবগত ছিলেন, যে শকুন্তলা রচনা করিয়া তর্কালঙ্কারকে উপহার স্বরূপ একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দিয়া এরূপ লিখিয়াছিলেন যে ভ্রাতঃ! যদিও ইহা তোমায় উপহার দিবার যোগ্য নয়, তথাপি আমার এরূপ বিশ্বাস যে বন্ধুর শ্রমের ধন বলিয়া তুমি অনুপযুক্ত হইলেও ইহাকে অবশ্য সাদরে গ্রহণ করিবে। এরূপ লেখকের লেখনী, মুর্শিদাবাদ যাত্রার পর অবধি কেন নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল, আমাদের ভাবিতে অতিশয় কষ্টবোধ হয়। তাঁহার পরিবারবর্গের মুখে শুনিতে পাই যে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একখানি বৃহৎগ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুশোকে তাঁহারা যখন নিতান্ত অভিভূত ছিলেন সেই সময় সেই গ্রন্থখানি অপহৃত বা বিনষ্ট হয়। তর্কালঙ্কারের জীবনের শেষ ভাগের রচনা অতি চমৎকার হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সাধারণে তাঁহার অমৃতময়ী রচনার শেষ ফল ভোগ করিতে পাইলেন না।

তর্কালঙ্কারের জীবন-চরিতের সহিত তাঁহার তেজস্বিতা ও ধর্ম্মবিষয়ক বিশ্বাস নিতান্ত অসম্বদ্ধ নহে। তিনি এরূপ তেজস্বী[৪৯] ছিলেন যে কখন কাহারও তোষামোদ্ করিতে পারিতেন না। তাঁহার তেজস্বিতার একটী উদাহরণ দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। যৎকালে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন একদিন একজন সিবিলিয়ান্[৫০] অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "পণ্ডিত মহাশয়! আপনি এরূপ বাঙ্গালা কোথা হইতে শিক্ষা করিয়াছেন?" তর্কালঙ্কার উত্তর করিলেন, "তুমি জান না, ও বাঙ্গালা আমি বিলাত হইতে শিখিয়া আসিয়াছি?" ধর্ম্মবিষয়ে তর্কালঙ্কারের কিরূপ বিশ্বাস ছিল তাহা স্থির বলা যায় না; তবে কন্যাগণকে একেশ্বরবাদিনী করিবার নিমিত্ত তিনি যেরূপ চেষ্টা পাইতেন তাহাতে এরূপ অনুমান হয় যে অন্ততঃ কার্য্যতঃ তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তর্কস্থলে তিনি বর্ত্তমান অনিশ্চিতবাদীদিগের (Sceptics) ন্যায় মত প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বর তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস অনির্ণীত থাকিলেও মনুষ্যজাতির হিতসাধন যে তাঁহার জীবনের এক মাত্র ব্রত ছিল ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

॥ প্রাসঙ্গিক সংযোজন ॥

১. মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রথমে 'কবিরত্ন', পরে 'তর্কালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত হন। [পু.প্র., পৃ.১৪৯]

২. মদনমোহনের মাতার নাম বিশ্বেশ্বরী দেবী।

৩. 'রসতরঙ্গিণী' যে প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি আদিরসাত্মক সংস্কৃত শ্লোকের পদ্যানুবাদ, তা যোগেন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। আদিরসের আধিক্যজনিত কারণেই সম্ভবত স্বনামে এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশে মদনমোহন সঙ্কুচিত ছিলেন। তাঁর এক ভগ্নিপতির নামে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর ১২৬৯ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৬২) রামদাস সেন কবির নামে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত করেন। ১৮৭১ সালে নিউ ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকাটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সা.সা.চ.-এ উদ্ধার করেছেন।

৪. অতিপ্রশংসা ও অতিভক্তির আতিশয্যে যোগেন্দ্রনাথ যে বাংলা সাহিত্যের এক বড় অংশের কথা, এমনকি আধুনিকযুগের সূত্রপাতের কথাটুকুও অস্বীকার করেছেন বা গোপন করেছেন, সে কথা সাহিত্যের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন।

৫. সুবন্ধু-রচিত সংস্কৃত গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা' অবলম্বনে মদনমোহন এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। রচনাকাল ১৭৫৮ শকাব্দ (১৮৩৬-৩৭)। ড. সুকুমার সেন মনে করেন 'কাব্যটি বোধ হয় ১৮৩৮ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল'। [বা.সা.ই.-২, পৃ. ৫৩৪] কাব্যপরিচয় প্রসঙ্গে ড. সেন জানিয়েছেন পুরোন কাব্যের রীতিতে গানের ধরনে বাসবদত্তা রচিত। পদের শীর্ষে এবং বর্ণনা অংশের শীর্ষেও রাগ তালের উল্লেখ আছে। শেষে ভণিতা আছে। পরিচ্ছেদ বিভাগ নেই পদবিভাগ আছে। গণেশ, সূর্য, শিব, জয়দুর্গা, সরস্বতী বন্দনা ও গুরু বর্ণনার পর গ্রন্থাবতরণিকা। তা থেকে জানা যায় যশোর জেলার ইশফ্পুর পরগণায় সবপাড়া-নিবাসী শিবচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র কালীকান্ত রায়ের অনুরোধে বইটি লেখা। সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও মিশ্র হিন্দিতে পদগুলি রচিত। [ঐ, পৃ. ৫০০] কৃষ্ণকমলের মতে মদনমোহন বাসবদত্তা'য় 'অতি সরল প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষার চমৎকার নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন।' [পু.প্র., পৃ. ২৯]

৬. যোগেন্দ্রনাথ মদনমোহনের দ্বিতীয়বার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হওয়ার সাল (১৮২৯) উল্লেখ করলেও পরবর্তী সালগুলি উল্লেখ করেন নি। দেখা যাচ্ছে ১৮২৯-৩১ ব্যাকরণ শ্রেণী, ১৮৩১-৩৩ সাহিত্যশ্রেণী, ১৮৩৩-৩৫ অলঙ্কার শ্রেণী, ১৮৩৫-৩৭ পর্যন্ত জ্যোতিষবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র পাঠ। ১৮৩৭-এ তিনি স্মৃতি শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮৩৭-৪০ এই তিনবছর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নকাল। সেসময় তিনি থাকতেন রামতনু লাহিড়ীর বাড়িতে তাঁর দুই কাকার সঙ্গে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কলকাতায় এসেছিলেন মেডিক্যাল কলেজে পড়ার বাসনা নিয়ে। আশ্রয় নিয়েছিলেন রামতনু লাহিড়ীর বাড়িতে ঐ একই সময়ে। দেওয়ানজী লিখেছেন- 'নূতন বান্ধবগণের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়দ্বয়ের মিত্রতালাভে বড়ই সুখী হইলাম। ...... আমি রামতনুবাবুর অংশের এক প্রকোষ্ঠে কালীর সহিত একত্রে থাকিতাম। মদনের সহিত প্রণয় হইলে তিনিও আমাদের সঙ্গে থাকিতেন। তিনি ও বিদ্যাসাগর তৎকালে সংস্কৃত কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন।' [আত্মজীবনচরিত, পৃ. ৪৭] স্মৃতি শ্রেণীতে পড়বার সময় ১৮৩৯ সালে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন যথাক্রমে ১৮০ টাকা ও ১০০ টাকা করে পারিতোষিক পেয়েছিলেন। [স.দ., ৮.৬.১৮৩৯; স.সে.ক.-২, পৃ.১১]

৭. যোগেন্দ্রনাথ দুটি পরীক্ষাকে একত্র করে ফেলেছেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মদনমোহন স্মৃতি শ্রেণীতে পাঠ সমাপ্ত করেন। আদালতের জজ-পণ্ডিতের সার্টিফিকেট পাবার জন্য দিতে হত হিন্দু ল

কমিটির পরীক্ষা। সে পরীক্ষা বিদ্যাসাগর দেন ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে আর মদনমোহন দেন ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে। সে বছরই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রজীবন শেষ করেন।

৮. এই বঙ্গ বিদ্যালয় হল হিন্দু কলেজ পাঠশালা। এটি স্থাপনের পিছনে ছোট ইতিহাস আছে। হিন্দু কলেজের ধর্মসংস্রবহীন শিক্ষায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখ সমাজনেতা। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমুখী হিন্দু কলেজের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন আরও নিবিড় করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত হয় কলেজ-অধীনস্থ এই পাঠশালাটির। প্রতিষ্ঠার কাল ১৮ জানুয়ারী ১৮৪০। বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা অভিধানকার, বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের দীক্ষাদাতা, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান পণ্ডিত। ১৮৪২ খ্রি. ১ জানুয়ারি তিনি সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁরই স্থানে চাকরি করতে এলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। এখানে তিনি দু'মাস চাকরি করেছেন।

এই নিয়োগের পশ্চাতে নাকি বিদ্যাসাগরের হাত ছিল। চণ্ডীচরণ লিখেছেন.— 'তাঁহারই (বিদ্যাসাগর) চেষ্টায় তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথমে কলিকাতা বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন।' [বিদ্যাসাগর, পৃ. ৬৫]

৯. বারাসত গবর্নমেন্ট স্কুল (তখন বারাসত জিলা স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার 'ফার্স্ট বুক' রচয়িতা প্যারীচরণ সরকার। সরকারি নথি বলছে ঃ 'Baraset School – this school was opened on the 1st January 1846 and soon attained a high position among the schools in Bengal' [R.P.I., 1860-61; প্যারীচরণ সরকার-নবকৃষ্ণ ঘোষ গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২২] এখানে যোগেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে বারাসত গবর্নমেন্ট স্কুলে একবছর শিক্ষকতা করে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মদনমোহন শিক্ষকতায় যোগ দেন। যোগেন্দ্রনাথের তথ্যটি বিদ্যাসাগর-গবেষকবৃন্দ এবং মদনমোহন-আলোচকবৃন্দ নির্বিচারে মেনে নিয়েছেন। নথি অনুসারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মদনমোহনের কার্যকাল ১৮৪৩-এর এপ্রিল থেকে ১৮৪৫-এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। এর আগে মদনমোহন চাকরি করেছেন হিন্দুকলেজ পাঠশালায়। [দ্র. স.সে.ক.- ২, পৃ. ৭০০] এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য, বারাসত গবর্নমেন্ট স্কুলে প্রথম কয়েক বছরের শিক্ষক-তালিকায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম নেই। অর্থাৎ তিনি কোন দিনই ওই স্কুলে শিক্ষকতা করেন নি।

১০. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মদনমোহনের শিক্ষকপদ প্রাপ্তিও নাকি বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যের ফল। চণ্ডীচরণ বলেছেন — 'কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে সাহেবদিগকে সম্পত্তিবিষয়ক আইন পড়াইবার জন্য ৪০টাকা বেতনে এক পদ শূন্য হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত পদ প্রাপ্ত হন।' [পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫]

১১. ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিন্‌জ-এর অনুমোদনক্রমে কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৪৬-এর ১ জানুয়ারি। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ক্যাপ্টেন ডেভিড রিচার্ডসন। কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলও এর সংযুক্ত ছিল। স্কুল ও কলেজের সূচনাকালে শিক্ষক-অধ্যাপক ছিলেন তিনজন ইউরোপীয় ও দশজন ভারতীয়। দশজন ভারতীয়ের একজন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ১৮৪৬-এর জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত তিনি এখানে চাকরি করেছেন।

১২. ১৩ এপ্রিল, ১৮৪৬ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রয়াত হন। সে সময় বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ৫০টাকা বেতনের সহকারী সম্পাদক এবং মদনমোহন কৃষ্ণনগর কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত ৯০ টাকা বেতনের অধ্যাপকপদটি বিদ্যাসাগরকে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু কোন বিশেষ কারণবশত

বিদ্যাসাগর নিজের পরিবর্তে ঐ পদটি বন্ধু মদনমোহনকে দেবার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করেন। তারপর ১৮৪৬-এর ২৭ জুন তারিখে মদনমোহন সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হন। [এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য — নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস]

কৃষ্ণনগর কলেজের কাজ ছেড়ে সংস্কৃত কলেজে যোগ দিতে মদনমোহনের কয়েকদিন দেরি হয়। ওই ক'দিন বিদ্যাসাগর শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কলকাতায় এসে মদনমোহন বিদ্যাসাগরের বাসায় উঠলেন। সেখানে বন্ধুর কাছে পাঠ্যবিষয়ের যে যে স্থানে সন্দেহ ছিল তা ভঞ্জন করে নিলেন। এরপর বন্ধুর পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করে কাজে নেমে পড়লেন।

কেমন ছিলেন শিক্ষক-মদনমোহন? খুব কড়া ধাতের মানুষ হলেও গল্প করতে ভালবাসতেন। মুখে মুখে শেখাতেন বাংলা ব্যাকরণ। ছাত্রদের কলেজ-পালানো আটকাতে নিজের জন্য আলাদা এক রেজিস্টার খাতা করেছিলেন। ১৮৪৭-এ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হবার পর মদনমোহনের ওপরেই সেটি পড়ানোর ভার পড়ে। [পু.প্র., পৃ. ১৪৯]

এছাড়া পড়াতেন 'মেঘদূতম্'। একদিন এক ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের কাছে অভিযোগ করলেন যে, কলেজের ছাত্ররা তার বাড়ির দিকে সবসময় তাকিয়ে থাকে বলে বাড়ির মহিলারা ছাদে উঠতে পারে না। বিদ্যাসাগর কথাটা মদনমোহনকে বললেন। মদনমোহন উত্তর দিলেন — এই বসন্তকালে 'মেঘদূত' পড়ানো হচ্ছে। আর পড়াচ্ছেন স্বয়ং মদন। সুতরাং তারা চঞ্চল হলে তাদের আর দোষ কোথায়? — বিদ্যাসাগর এই উত্তরে না হেসে পারেন নি। [হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, সেকালের সংস্কৃত কলেজ]

১৮৪৬-এর জুন মাস থেকে ১৮৫০-এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে মদনমোহন ছিলেন মধ্যাহ্নের সূর্য। এই সময়কালের মধ্যে তিনি পড়িয়েছেন, সমাজ-সংস্কারের কাজে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করেছেন, প্রেস স্থাপন করেছেন, গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন, বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, অবিস্মরণীয় গ্রন্থত্রয় (শিশুশিক্ষা-৩ ভাগ) রচনা করেছেন ইত্যাদি। এর পাশাপাশি একটি চমকপ্রদ খবরও পাচ্ছি। সংস্কৃত কলেজে পড়ানোর সময় শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য কলেজের হলঘরে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত কুস্তি ও ব্যায়ামের আখড়ায় নিয়মিত যোগ দিতেন। [ক.সা.বি., পৃ. ১৪৭]

১৩. ২৭ জুন ১৮৪৬ থেকে ১৫ নভেম্বর ১৮৫০ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে মদনমোহনের কার্যকাল। কলেজের সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে বিদ্যাসাগর ১৮৪৭-এর এপ্রিল মাসে সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়ে পদত্যাগপত্র পাঠালেন। তখন কলেজের শিক্ষক ও পণ্ডিতকুল সেক্রেটারি রসময় দত্ত ও শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি মোয়াট সাহেবের কাছে পৃথক দুটি আবেদনপত্র পাঠালেন যাতে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গৃহীত না হয়। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতা, কর্মক্ষমতা ও উৎসাহ নিয়ে কলেজের উন্নতির জন্য বহু কাজ করেছেন এবং শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেছেন। তাঁরা জানালেন বিদ্যাসাগরের অভাবে অপূরণীয় ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। — এই নিবেদনপত্রে যে ১৩জন শিক্ষক সই করেছিলেন, তাঁদের একজন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। নিবেদনপত্রের তারিখ ১০ এপ্রিল ১৮৪৭।

১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন তারিখে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মেডিক্যাল কলেজের থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ডেভিড হেয়ারের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী সভা। সভায় হেয়ারের জীবন নিয়ে আলোচনা করেন মদনমোহন।

১৪. বেথুনের পুরো নাম জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। বেথুন নামটি ফরাসি বা ফ্লেমিশ। বেথুন জন্মেছেন ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে স্যালফোর্ড শহরে। তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং

সম্মানিত র‍্যাংলার পদপ্রাপ্ত। অঙ্ক বিজ্ঞান ও আইনে বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ্, সাহিত্যপ্রেমী ও কবি। গভর্নর-জেনারেলের আইন-সচিব হিসেবে ভারতে আসেন ১৮৪৮-এ। এর আগে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে সতী আইনের বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে 'ধর্মসভা' যে আপিল করেছিল, তাতে 'ধর্মসভা'-র পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি কৌঁসুলি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এদেশে এসে পদাধিকার বলে তিনি হন শিক্ষা পরিষদের সভাপতি। এই পদে থাকার সুবাদে এদেশের নারীশিক্ষার সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'শাপগ্রস্তা অহল্যা যেমন যুগযুগান্তর ধরিয়া পাষাণ কলেবরে কালাতিপাত করিতে করিতে সহসা শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে স্বমূর্তি পরিগ্রহ করিল ও নিজ কর্তব্য সাধন মানসে আপনার পথে চলিয়া গেল, তেমনি মানবকুলের মুকুটস্বরূপ দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন বেথুন-সমাগমে শ্মশানভস্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। নূতন উৎসাহে নূতন করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা হইল। বেথুনের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না, তিনি কায়মনোবাক্যে বঙ্গীয় অবলাকুলের কল্যাণ সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।' [বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৬৪]

স্ত্রী-শিক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ বেথুনের প্রতি সমসাময়িক প্রগতিশীল মানুষ এবং মুক্তমনা সংবাদ সাময়িক পত্রাদিও কৃতজ্ঞতায় নতমস্তক ছিল। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ৯.৯.৫০-এ লেখে ঃ 'সাহেব বিদেশীয় হইয়াও আমাদের দেশের উপকারার্থ রাশীকৃত টাকা অকাতরে ব্যয় করিতেছেন অতএব তাঁহার নিকট বঙ্গদেশীয় তাবৎ লোকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত।' [আকাদেমি - ৮, স্বপন বসু; পৃ. ৪৪৫] পরের মাসে ৩০ তারিখে ঐ পত্রিকা আবার লেখে ঃ 'অনারেবিল বেথুন সাহেব এতদ্দেশীয় অবলাকুলের সৌভাগ্যোদয়েই এতদ্দেশে আসিয়াছেন ......।' [পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৫]

১৫. যোগেন্দ্রনাথ 'বেথুন বালিকা বিদ্যালয়' বললেও প্রথমে সে নাম ছিল না। এই স্কুলের নামকরণ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে বেথুন স্বয়ং একে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' নামে অভিহিত করেছিলেন। [দি বেঙ্গল হরকরা, ৮.৫.৪৯] 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ৭মে '৪৯ এবং আরো কয়েকদিন একে 'বিক্টোরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়' নামে উল্লেখ করা হয়। 'বিক্টোরিয়া' বা 'ভিক্টোরিয়া' শব্দটি যুক্ত করার কারণ হল বেথুন নিজেই রানি ভিক্টোরিয়ার নামে বালিকা বিদ্যালয়ের নামকরণ চেয়েছিলেন ডালহৌসিকে লেখা এক চিঠিতে — 'it would give me great satisfaction .... if I could obtain your Lordship's influence .... to address Her Majesty' for leave to call the school by Her name ....'.[স্মরণিকা, পৃ. ৩৮] তবে প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল অংশের সম্ভাব্য বিরুদ্ধতার আশঙ্কাতেই এই নামকরণ করা হয়নি। ৪.৯.১৮৫০-এ কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর পক্ষ থেকে জানানো হল ঃ 'We do not think that the present state of female education is such as to warrant the unusual proceeding of applying for the sanction of Her Majesty's name to the Female School at Calcutta.' [স্মরণিকা, পৃ. ৭০] বিদ্যালয়ের নতুনভবনের ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর তাম্রফলকে Hindu Female School কথাটি লেখা ছিল। বেথুনের মৃত্যুর পর স্কুলটি ধীরে ধীরে 'বেথুন স্কুল' নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৬. যোগেন্দ্রনাথ যত সহজে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেছেন, তত সহজে যে তা নিষ্পন্ন হয়নি, তার আনুপূর্বিক বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। এখানে আমরা দুটি সাময়িকপত্রের উদ্ধৃতি থেকে দেখে নিতে পারি, সেকালে এই বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ৭ই মে, ১৮৪৯-এ সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লেখা হল ঃ

'......অদ্যকার প্রভাত অতি সুপ্রভাত, এই প্রভাতের প্রভাতে এক অব্যক্ত পুলকজনক আলোকের আভা দৃষ্ট হইতেছে.....।

.....ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক তথা বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের অধিপতি করুণাময় ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথিউনি সাহেব বাঙ্গালি জাতির বালিকা বর্গের বঙ্গভাষার অনুশীলন নিমিত্ত বিপুল বিত্ত ব্যয় ব্যসন পূর্ব্বক "বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়" নামক এক অভিনব স্ত্রীবিদ্যাগার স্থাপন করিয়াছেন, অদ্য প্রাতে তাহার কর্ম্মারম্ভ হইবেক, আপাততঃ সিমুলার অন্তঃপাতি সুকিএস্ ষ্ট্রিট মধ্যে দয়ার্দ্রচিত্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানা বাটীতে কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক, পরে তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্থানে এক স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করা যাইবেক, ...। ঐ মহাশয় কিছুদিনের জন্য পাঠশালার কর্ম্ম নির্ব্বাহ নিমিত্ত বিনা বেতনে বাটী দিয়াছেন এবং নূতন বাটী নির্ম্মাণার্থে এককালীন্ ৮০০০ অষ্ট সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, আর সময়ানুসারে সাধ্যমত আনুকূল্য করণে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ...।

উক্ত 'বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে' আপাততঃ অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্র বংশের প্রায় বিংশতি বালিকা অধ্যয়নার্থ নিযুক্তা হইয়াছে, একজন সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহারদিগকে বঙ্গভাষার উপদেশ এবং একজন সুনিপুণা বিবী সূচের কর্ম্মাদি শিল্পবিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিবেন, প্রাতে সাত ঘণ্টা অবধি নয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাঠশালার কর্ম্ম চলিবেক, ...আমরা প্রফুল্লচিত্তে অনুরোধ করিতেছি হিন্দু মহাশয়েরা দেশ শব্যবহৃত ঘৃণিত নিয়ম উচ্ছেদ পূর্ব্বক স্ব স্ব বালিকাদিগকে অধ্যয়ন জন্য তথায় প্রেরণ করুন, ...।

স্ত্রীলোকদিগ্যে বিদ্যাদান করা কর্ত্তব্য, এইক্ষণে প্রায় অনেকেই তাহা মুক্তমুখে স্বীকার করিবেন, তবে কতকগুলীন্ প্রতিবন্ধকতা দেখাইতে পারেন, কিন্তু যদবধি তাহার সংহার হইয়া এ বিষয়ের সঞ্চার না হইবেক তদবধি কোনমতেই আমারদিগের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, নিশ্চয়রূপে কহিতে পারি যে এদেশের অবিদ্যারা বিদ্যাবতী না হওয়াতেই সকল প্রকারে অনিষ্ট হইতেছে। ....

......আহা! সেই দিবস কি সুখের দিবস হইবেক — যে দিবসে জননী এবং ভগিনী পুত্র এবং সহোদরগণকে কুনীতি শিক্ষা দানের বিনিময়ে পুস্তক ধরিয়া বিদ্যাবিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতে থাকিবেন।' [সা.বা.স.- ২,পৃ. ২৪]

চারদিন পর ১১.৫.১৮৪৯ তারিখে 'সংবাদ রসরাজ' পত্রিকায় বালিকা বিদ্যালয়ে সকলের বাড়ির মেয়েদের পাঠানোর আবেদন জানানো হল। উপরন্তু বলা হল - যাঁরা না পাঠাবেন, তাঁদের ব্যবস্থা ওপরওয়ালা করবেন।

'......আমারদিগের বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া জ্ঞানশিক্ষা করিবে, এমত শুভদিন কবে হইবে, আমরা এই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই শুভ দিনমণির প্রায় উদয় হইয়াছে, গত সোমবারে আমারদিগের প্রিয়তমা বালিকারা বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। .....সকলের বাটীর বালিকাগণকে ঐ বিদ্যালয়ে পাঠাইবে।, যদি না পাঠান তবে আমরা দোষ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না, এ বিষয়ে টাকা দিতে হইবেক না, বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যয় গবর্ণমেণ্ট দিবেন, কেবল আপনারদিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই সাহায্য করা হইবে, এমত বিষয়ে যাঁহারা ঔদাস্য করিবেন তাঁহারা নিতান্তই কন্যাদিগের শত্রু হইয়াছেন, অতএব অবলাকুলের শত্রুদমনের উপায় পরমেশ্বর করিবেন।' [আকাদেমি-৮; স্বপন বসু, পৃ.৪৪১]

১৭. হেদুয়ার উত্তর-পশ্চিম কোণে যে অট্টালিকার কথা যোগেন্দ্রনাথ লিখেছেন, বেথুনের **Calcutta Female School** সেখানে যাত্রা শুরু করেনি। ১৮৪৯ এর ৭মে বাহির শিমুলিয়ায় ৫৬ সুকিয়া স্ট্রিটে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠকখানায় মাত্র ১১ জন ছাত্রী নিয়ে এই বিদ্যালয়ের পথ-চলা শুরু। এরপর কিছুদিনের জন্য স্কুলটি উঠে আসে কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এক বাড়িতে, যেখানে আগে ছিল ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙা স্কুল। ইতিমধ্যে মির্জাপুরে স্কুলভবনের জন্য জমি কেনা হয়েছে। কিন্তু নানান অসুবিধার কারণে ঐ পরিকল্পনা

পরিত্যক্ত হয়। অবশেষে হেদুয়ার পশ্চিম দিকে দশবিঘা সরকারি জমিতে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

১৮. Calcutta Female School-এর নিজস্ব গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ৬ নভেম্বর ১৮৫০। ঐদিন বিকেলে নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে বেথুন ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে জমির দলিল প্রদান করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এটর্নি। সেসঙ্গে একটি অশোকগাছের চারাও দেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডেপুটি গভর্নর স্যর জন হান্টার লিটলার। বিদ্যালয়ের স্থপতি মি. গ্রে-র কাছ থেকে তিনি বিদ্যালয়ের নকশাটি গ্রহণ করেন। সন্ধেবেলায় আবহসঙ্গীতের সঙ্গে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। অশোকগাছের চারাটি রোপণ করেন লেডি লিটলার।

ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে 'দ্য মর্নিং ক্রনিকল' ৯ নভেম্বর ১৮৫০ মন্তব্য করে —

"We have recorded the details of the ceremony connected with laying the foundation stone of the Hon'ble Mr. Bethune's Native Female School and we have done so with sincere pleasure. We cannot however allow the opportunity to pass without saying a word or two in commendation of the praiseworthy effort of the Hon'ble gentleman to advance the cause of education amongst the more aristocratic classes of Hindu Female Society. We think Mr. Bethune worthy of all praise for the steady and persevering manner in which he has taken up and so far prosecuted this noble work, and for the princely liberality which he has displayed in his efforts to lay the foundation of an Institution which will hereafter be associated with his name. Few men in his position would have had the courage to undertake the work and fewer still the generosity to do so at such a cost as we understand will be involved in the undertaking and for these reasons we think he is worthy of no small praise. That the plan will be successful we have not a shadow of doubt. Success may not be so ample or speedy as his sanguine mind could desire, but that it will come we cannot doubt or that future ages will mention his memory in concert with other pioneers in this good work with veneration and respect...... We are much gratified to see so many influential native gentlemen present on the occasion; and not less at the large gathering of the elite of Society, who sanctioned the ceremony with their presence. It must have been peculiarly gratifying to Mr. Bethune and encouraging to every friend of Native Female Education to witness so goodly a gathering on so interesting and important an occasion." [স্মরণিকা, পৃ. ৮১]

১৯. যোগেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত বিবরণ পড়ে মনে হতে পারে বেথুন ও মদনমোহনই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন উপস্থিত ছিলেন। ঘটনা তা নয়। অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সমাজের মান্যগণ্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হওয়ার পর অতিথিবর্গ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে সমবেত হন। ৮ নভেম্বর ১৮৫০ তারিখে The Bengal Hurkaru পত্রিকায় এ সম্বন্ধে লেখা হল ঃ

'The building was most tastefully furnished and decorated, and the whole street was splendidly illuminated for the occasion. The Deputy Governor was received by the Baboo at the gate; and among the guests we saw the Hon'ble Sir F. Cussie, the Hon'ble Mr Lowis, the Hon'ble Mr Bethune, Sir Arthur Buller, Sir James Colvile, Mr F. J. Halliday, Mr J. R. Colvin, Mr J. P. Grant, Mr C., R. M. Jackson, Mr Evelyn Gordon, Colonel

Galloway, Dr Mouat, Mr A.F.M. Mills, Capt. Thuillier, Mr C.R. Prinsep, the Hon'ble Mr Campbell, Mr. G. Taylor, Major G. T. Marshall, Captain Colebrooke, Captain Hughes, the Revd. K.M. Banerjea, and several relatives of the Baboo. The company sat down to dinner at about 6.30 P.M. .... The guests separated at about 9 P.M."

লক্ষণীয় এই তালিকায় রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দক্ষিণারঞ্জনের কয়েকজন আত্মীয়ের কথা থাকলেও মদনমোহনের নামোল্লেখ নেই। আরও উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে ভাষণে বেথুন দক্ষিণারঞ্জনকে সম্বোধন করেছেন, ভাষণে কয়েকবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু একবারও মদনমোহনের কথা বলেন নি। [দ্র. স্মরণিকা, পৃ.১৯৩-১৯৮] যদিও ১৫ নভেম্বর ১৮৫০ পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজে কর্মরত ছিলেন। আমরা ধরেই নিতে পারি মদনমোহন অবশ্যই আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন।

২০. ভিতের নিচে নবরত্ন নিখাত করা হয়নি। যোগেন্দ্রনাথের বিবরণে দেওয়া তথ্য ঠিক নয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য তৈরি গর্তে নামিয়ে দেওয়া হয় প্রথমে মুদ্রা-ভর্তি দুটি বোতল এবং জমির দলিল। এরপর তাম্রফলকে খোদিত লিপি পাঠ করে সেটিকে পোঁতা হয়। স্যর লিটলার এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজটি করেন।

২১. বিদ্যালয়ের মূল ভবনটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় ১৮৫১-র সেপ্টেম্বর মাসে।

২২. এখানে তথ্যগত ভ্রান্তি রয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পঠন-পাঠনের কাজ শুরু হয় ৭ মে ১৮৪৯ তারিখে। প্রথমদিন ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১১জন। সূচনায় দক্ষিণারঞ্জনের বাড়ি, তারপর ১৮৫১-তে নিজস্ব ভবন। স্কুল শুরুর আগে ছাত্রী জোগাড়ের ইতিহাস আগেই আলোচনা করেছি। ১৮৫০-এ স্কুলের সম্পাদক পদে আসীন হন বিদ্যাসাগর। ১৮৫১-তে ছাত্রীসংখ্যা হয় ২৮, ১৮৫২-তে ৩৮। স্কুল শুরুর আগে যে ষোলজন তাঁদের কন্যাদের স্কুলে পাঠানোর সম্মতি দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন, রামগোপাল ঘোষ (১জন), ঈশ্বরচন্দ্র বসু (১জন), নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় (১জন), গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত (২জন), দ্বারকানাথ গুপ্ত (১জন), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (২জন), প্যারীচাঁদ মিত্র (১জন), হেমনাথ রায় (১জন), রসিকলাল সেন (২জন), মাধবচন্দ্র মল্লিক (১জন), হরিনারায়ণ দে (১জন), দেবনারায়ণ দে (১জন), হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় (১জন), মদনমোহন (হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার-এ ছাপা হয়েছে - মদনগোপাল) তর্কালঙ্কার (২জন), গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (১জন), হরকুমার বসু (২জন)। এই ২১ জন স্কুলে ভর্তি হলেও প্রথমদিন ১১জন উপস্থিত ছিল বলে বেথুন ডালহৌসিকে এক চিঠিতে জানিয়েছেন। এদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষের মেয়েই সবচেয়ে বড় — ৮ বছর। বাকি সবার বয়স ছিল ৪ থেকে ৬ বছর।

২৩. ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের প্রথম দুই ছাত্রী হিসেবে ভুবনমালা ও কুন্দমালার নাম পাওয়া যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন — 'কুক্ষণে মদনমোহন বীটন সাহেবের মেয়ে স্কুলে নিজের মেয়েকে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে এই প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠান হইল দেখিয়া সাহেবেরা অত্যন্ত খুসী হইলেন।' [পু.প্র., পৃ.২৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কৃষ্ণকমল বলেছেন 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে 'মুকুন্দমালা' শব্দটি ছাপার ভুলে হয়েছে 'কুন্দমালা'। মদনমোহন-কন্যার কথায় বলেছেন 'এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে তিনিও সাহিত্যদর্পণের ছাপার ভুল হইতে কন্যার নামের আভাস পাইয়াছিলেন। তবে কুন্দমালা নামটিও অর্থশূন্য নহে; এমনও হইতে পারে যে তর্কালঙ্কার সাহিত্যদর্পণ হইতে আভাস না পাইয়াও নিজের পছন্দমত মেয়ের নাম দিয়াছিলেন।' [ঐ, পৃ. ৪৪]

২৯ মার্চ, ১৮৫০-এ ডালহৌসিকে এক চিঠিতে বেথুন তিনজন ভারতীয়ের প্রতি আপন অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রথমজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী রামগোপাল ঘোষ, **'who was my principal adviser in the first instance and who procured me my**

first pupils,' দ্বিতীয়জন জমিদার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, যিনি পূর্বে বেথুনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না - কিন্তু বেথুনের পরিকল্পনা শুনে নিজেই এগিয়ে এসে স্কুলের জন্য পাঁচ বিঘা জমি দান করতে চেয়েছেন, আর তৃতীয়জন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 'who not only sent two daughters to the school, but has continued to attend it daily, to give gratuitous instruction to the children in Bengali, and has employed his leisure time in the compilation of a series of elementary Bengali books expressly for their use.' [স্মরণিকা, পৃ. ৭০]

২৪. যোগেন্দ্রনাথের এই উক্তি নিঃসন্দেহে প্রশংসার অতিরেক। বাংলাদেশে (অবিভক্ত) বালিকা বিদ্যালয়ের 'সৃষ্টিকর্তা' কে — এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে হিন্দু বালিকাদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে ধর্মোদ্দেশ্যে চালিত না হয়ে সাড়া জাগানো বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা হিসেবে গৌরব অবশ্যই বেথুনের প্রাপ্য।

'সাড়া জাগানো' শব্দদ্বয় একারণে প্রয়োগ করতে হল যে, বেথুনের স্কুল স্থাপিত (১৮৪৯) হওয়ার পূর্বে ১৮৪৭-এ উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতে প্রখ্যাত ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্রের ভাই কালীকৃষ্ণ মিত্র এবং তৎকালে বারাসত জেলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক ও ফার্স্ট বুক ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল স্থাপিত হয়। মাত্র দু'মাসের মধ্যে ১৬ জন ছাত্রীও জোগাড় হয়। এদের মধ্যে একজন নবীনকৃষ্ণেরই কন্যা স্বর্ণলতা। প্যারীচরণের জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন 'আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বহুল গণ্ডগ্রাম বারাসতে ঐ দেশাচার বিরুদ্ধ নব অনুষ্ঠানের জন্য প্যারীবাবু প্রমুখ ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তাগণকে কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, কত লাঞ্ছনা নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্যারীবাবু, নবীনকৃষ্ণবাবু এবং ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ বারাসতে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।' [প্যারীচরণ, নবকৃষ্ণ ঘোষ; পৃ. ৩৩] একই কথা মদনমোহনও লিখেছেন 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকায় 'স্ত্রী-শিক্ষা' প্রবন্ধে — 'বিদ্যালয় স্থাপনার পরে কতকগুলি ঘোর পাষণ্ড রাক্ষস লোকেরা এই সৎকর্ম্মানুষ্ঠান অসহমান হইয়া সেই সাধুগণের উপর দারুণ উপদ্রব ও ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, ...।' সম্ভবত বেথুন এই স্কুল পরিদর্শনে গিয়েই একটি স্কুল স্থাপনের অনুপ্রেরণা পান। তাঁর কথাই নবকৃষ্ণ বলেছেন — 'একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী সস্ত্রীক বারাসতের বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আসিয়া একটি দুগ্ধপোষ্য বালিকার চিবুকে হাত দিয়া আদর করাতে জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া বারাসতবাসিগণ ঘোটমঙ্গল বসাইয়াছিলেন।' [পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩]

১৮৫০-এর ২৯ মার্চ লর্ড ডালহৌসিকে লেখা এক চিঠিতে বেথুন নিজেই এই স্কুল সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ 'At Barasat some of the most respectable inhabitants have already established one, now attened by more than 20 girls, chiefly Brahminical caste, and what is very remarkable, two of them being already married." [স্মরণিকা, পৃ. ২০১]

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনজনিত কোলাহল বারাসতে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন বারাসত গণ্ডগ্রাম। বিদ্যালয় স্থাপনার সংবাদ কলকাতায় খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় অনেক পরে। সুতরাং বেথুনের স্কুল যে অর্থে মহানগরীতে সাড়া জাগিয়েছিল, চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, অন্য কোন স্কুলের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি।

২৫. শম্ভুনাথ কাকার কাছে মানুষ। লখনৌ-এ উর্দু ও ফারসি শিখেছেন। ১৮৩৪-এ কলকাতায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৪১-এ সদর দেওয়ানি কোর্টের সহকারী রেকর্ড কিপার। ১৮৪৫-এ ডিক্রিজারির মুহুরির পদপ্রাপ্তি। ১৮৪৮-এ আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৮৫৩-তে

জুনিয়ার সরকারি উকিল, ১৮৫৫তে প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের অধ্যাপক। ১৮৬২তে সিনিয়র সরকারি উকিল এবং ১৮৬৩-তে হাইকোর্টে এদেশীয় প্রথম বিচারপতি। শম্ভুনাথ ছিলেন ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। Calcutta Female School প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি তাঁর কন্যাকে ঐ স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। [স.বা.চ.]

২৬. প্রগতিবাদী ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত (১৮০৬-১৮৮৫)। বেথুনের স্কুলে তিনি কন্যা জ্ঞানদা দেবীকে ভর্তি করেছিলেন। বাল্যবিবাহের বিরোধী ও বিধবাবিবাহের সমর্থক এই মানুষকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে' এবং বিদ্যাসাগর-অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁকে 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সংস্কৃত লার্নিং' বলে অভিহিত করেছেন। দেশ-প্রচলিত প্রতিমাপূজায় তাঁর আস্থা ছিল না এবং সমুদ্রযাত্রাকে তারানাথ অশাস্ত্রীয় বলে মনে করতেন না। ১৮৭৫-এ যুবরাজ এডওয়ার্ডের ভারত-আগমনে বাঙালিদের পক্ষ থেকে তিনি রাজপ্রশস্তি রচনা করেছিলেন।

ছাত্রজীবনে চঞ্চল প্রকৃতির তারানাথের বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনায়। সংস্কৃত কলেজ ও কাশীতে শাস্ত্রপাঠ করে ৩১ বছর বয়সে অম্বিকা-কালনায় ফিরে তারানাথ নিজস্ব টোল খোলার পাশাপাশি বিত্তলাভের জন্য স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। কাপড়ের ব্যবসা, কাঠের ব্যবসা এবং ঘিয়ের ব্যবসায় তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেন। বিদ্যাসাগর-অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন — 'বাচস্পতি মহাশয় কেবল বস্ত্রের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি কিছুদিন ঐ ব্যবসা করিতে করিতে কাষ্ঠের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন এবং কাষ্ঠের ব্যবসায়ে প্রায় লক্ষ টাকা উপার্জন করিলেন। ঐ সময়েই তিনি কালনায় প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কালনা গ্রামের মধ্যে ওরূপ প্রশস্ত প্রাসাদ আর কাহারও অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সময়েই তিনি অসংখ্য ঢেঁকি বসাইয়া ধান্য ক্রয় করিয়া তণ্ডুল প্রস্তুত করাইতেন ও ঐ সকল তণ্ডুল বিক্রয় করাইতেন। ঢেঁকির শব্দে প্রতিবেশীবর্গের নিদ্রা হইত না।' [বি.বা.স.-তে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬২]

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণের মৃত্যুর পর ১৮৪৫ সালে ২৩ জানুয়ারি তারানাথ তর্কবাচস্পতি মাসিক ৯০ টাকা বেতনে ওই পদে নিযুক্ত হন। কলেজের অধ্যক্ষ জি.টি. মার্শাল পদটি বিদ্যাসাগরকে নিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাতে অসম্মত হন। সঙ্গে সঙ্গে তারানাথের নাম প্রস্তাব করেন এবং নিজে গিয়ে তারানাথের সম্মতিপত্র সংগ্রহ করেন। ১৮৪৭-এর এপ্রিলে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে বিদ্যাসাগর ইস্তফাপত্র পাঠালে তা গ্রহণ না করার অনুরোধ করে কলেজের ১৩ জন পণ্ডিত-শিক্ষক যে নিবেদনপত্র লেখেন, তার একজন তারানাথ তর্কবাচস্পতি। ১৮৭৩-এর ৩১ ডিসেম্বর ৬২ বছর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগর ও তারানাথের মধুর সম্পর্কে চিড় ধরে বহুবিবাহ বা কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। (বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ড. স্বপন বসু 'সমকালে বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে) দু'জনের মতান্তর এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ' বিষয়ক 'দ্বিতীয় পুস্তক'-এ লেখেন : 'অনেকেই বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই; নানাশাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোন শাস্ত্রে প্রবেশ নাই; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই।'

এখানেই শেষ নয়। 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল' — এ দুটি বেনামী রচনায় বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্বন্ধে বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করে ঝাল মিটিয়েছেন।

তার কয়েকটি দেখা যাক ঃ 'অহঙ্কারী', 'পণ্ডিতমূর্খ', 'বুদ্ধিশুদ্ধিহীন,' 'অতি অপদার্থ', 'বেহুদা পণ্ডিত', 'দুইপদ বিশিষ্ট জন্তু', 'লজ্জা সরম কম', 'গায়ে মানুষের চামড়া নাই', 'লঘুচিত্ত বক্কেশ্বর', 'প্রকৃত বক্কেশ্বর', — ইত্যাদি। দুই পণ্ডিতের বিরোধকে কেন্দ্র করে প্যারীমোহন কবিরত্ন একটি গানও বেঁধেছিলেন। [দ্র. স. কা. বি. , পৃ.৭৭]

অথচ, মদনমোহন ও বিদ্যাসাগরের চরম তিক্ততার সময়ে 'সংস্কৃত প্রেস'-এর স্বত্ব ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য তিন সদস্যের যে সালিশি কমিটি তৈরি হয়েছিল, এই তারানাথ তর্কবাচস্পতি ছিলেন তাঁদের একজন। তারানাথের বই 'শব্দার্থরত্ন' ১৮৫২-তে সংস্কৃত প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ১৮৫২-তে 'ব্যাকরণভূষণসার', ১৮৬৩-তে 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী'-র দুটি খণ্ডও তিনি প্রকাশ করেন। তখন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক। বিদ্যাসাগরও ১৮৫৮-র জানুয়ারি মাসে স্বসম্পাদিত 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ'র ভূমিকায় তারানাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন 'for the material assistance ....'। [দ্র. ক. সা. বি.; পৃ.৬৮৪]

২৭. ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮৫০-এর নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর স্কুলের সম্পাদক হন। তখন ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৫ জন। [স্মরণিকা, ৭১] মতান্তরে ৪৪। [বা. ন. ই., পৃ. ১৭৩] পরবর্তী কয়েক বছরে ছাত্রী সংখ্যার হিসেব পাওয়া যায় এরকম — ১৮৫১-২৮, ১৮৫২-৩৮, ১৮৫৩-৪৩, ১৮৫৪-৪২, ১৮৫৫-৪৫, ১৮৫৬-৫৫, ১৮৫৭-৫১। ১৮৫১ সালের মাঝামাঝি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কন্যা সৌদামিনীকে এই স্কুলে ভর্তি করান। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক চিঠিতে (২৫ আষাঢ় ১৭৭০ শক) তিনি বলেন 'আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।' [আত্মজীবনী/দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; পৃ. ৪৬৪] দেবেন্দ্রনাথ সৌদামিনীকে বেথুনের স্কুলে ভর্তি করেছিলেন ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে, শকাব্দ ১৭৭৩। ১৭৭০ শক মুদ্রণপ্রমাদ। ২৪ আষাঢ় ১২৫৮ বঙ্গাব্দে সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয়তে লেখা হয় —

'...... দেশ হিতৈষী সুবিখ্যাত মান্যবর বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনারবিল মেং বেথুন সাহেবের স্থাপিত 'বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে' আপনার কন্যা ও ভ্রাতৃকন্যাকে বিদ্যানুশীলনার্থ প্রেরণ করিবেন এমত কল্পনা স্থির করিয়াছেন ...। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি সজ্জন, সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞাপরায়ণ এবং সর্ব্বগুণজ্ঞ মহন্মনুষ্য। ..... অস্মদ্দেশের সর্ব্বাগ্রগণ্য প্রধান মহাশয়েরা যদি এ বিষয়ে যথাযোগ্য অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন তবে অবিদ্যাবৃন্দের বিদ্যালাভের কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকে না। ......পরন্তু আর এক আহ্লাদের বিষয় এই যে শ্রীল শ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ এই বিদ্যালয়ের উন্নতি নিমিত্ত এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।' [সা.বা.স.-২, পৃ. ৫৩]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যাকে বেথুনের স্কুলে ভর্তি করানোর বিষয়টি সেকালে যে বেশ আলোড়ন তুলেছিল, ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার ১৭ জুলাই ১৮৫১ সংখ্যা তার প্রমাণ —

"One of the most influential Natives in Calcutta, Debendranath Tagore, has added his own daughter to the long list of eighty female children already receiving instruction in the Institution and the Raja Kalee Krishna Bahadoor, who occupies the most prominent position in Hindoo society in the metropolis, has accepted the office of its president." [স্মরণিকা, পৃ. ৮৪]

২৮. তথ্যগত ভ্রান্তি সহজেই চোখে পড়ে। বিদ্যালয়-ভবন নির্মিত হওয়া — ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি — পাঠোপযোগী পুস্তক না থাকা — ঘটনা এভাবে ঘটে নি। ১৮৪৯ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে বালকপাঠ্য বহু গ্রন্থই রচিত হয়েছে। (বিষয়টি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে — 'বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা'

শীর্ষক গ্রন্থে) সেসময় বালিকাদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল। বিষয়টি প্রভাকর-সম্পাদকের নজর এড়ায় নি। তিনি ১৮৪৯-এর জুলাই মাসে লিখলেন —

'...... স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্তে এ প্রকার পুস্তক সকল প্রস্তুত করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় যাহাতে তাঁহারা এই ছয় বৎসরের মধ্যে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়েন, অপিচ অনুবাদিত পুস্তক সকলের মর্ম্মাবগত হইলেই তাঁহারা অনায়াসে সকল দেশের রীতিনীতি ও আহার (আচার?) ব্যবহার জানিতে পারিবেন।' [সা.বা.স.-২, পৃ. ৩৮]

১৮৪৯-এ ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল শুরু হওয়ার সময়ই এই অভাব চোখে পড়েছিল। 'শিশুশিক্ষা'-র প্রথমভাগের ২য় সংস্করণে বেথুনের কাছে লিখিত নিবেদনপত্রে এই স্বীকারোক্তি ছিল। 'প্রথম পাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথা নিয়মে স্বদেশ ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না।' এই সমস্যার সমাধানেই মদনমোহন 'শিশুশিক্ষা' রচনা করেন।

২৯. তথ্যটি ঠিক নয়। শিশুশিক্ষা'র প্রথম ভাগ ১৮৪৯, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫০, তৃতীয় ভাগ ১৮৫০-এ রচিত হয়।

৩০. প্রশংসা ও স্তুতির প্রাবল্যে যোগেন্দ্রনাথ কিভাবে ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করেছেন তা লক্ষণীয়।

৩১. শুধু স্ত্রী-শিক্ষা নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নারী স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন মদনমোহন। বিধবা-বিবাহের সপক্ষে মুর্শিদাবাদ থেকে ২১.২.১৮৫৬ তারিখে অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনিও সই করে এক আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন ভারত সরকারের কাছে। [বি.বা.স., পৃ. ২৬১] আর প্রথম বিধবা-বিবাহের ঘটকালি যে তিনিই করেছেন, যোগেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে পরে উল্লেখ করেছেন।

৩২. যোগেন্দ্রনাথ ১৮৭১-এ লেখা এই জীবনচরিতে মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা'-র ভূয়সী প্রশংসা করলেও আর মাত্র কয়েকবছর পরে ১৮৭৮ সালেই 'শিশুশিক্ষা'-র দোষ খুঁজে পেয়েছিলেন। সে বছর তিনি স্বরচিত শিশুপাঠ্য বর্ণশিক্ষাগ্রন্থ 'শিক্ষা সোপানাবলী'-র ভূমিকায় লিখলেন — 'সকলেই বিদিত আছেন — শব্দ লালিত্যে, শব্দযোজনার কবিত্বে, ও রচনার মাধুর্য্যে শিশুশিক্ষাত্রয় অতুলনীয়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্য ও নিরবচ্ছিন্ন লালিত্যবশতঃ বালকেরা শিশুশিক্ষা আদ্যন্ত মুখস্থ করিয়া ফেলে। তাহাতে বালকদিগের .....শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে এবং স্মৃতিশক্তির অতিচালনাসহ বুদ্ধিবৃত্তির চালনার কিঞ্চিত অসদ্ভাব হইয়া পড়ে।'

৩৩. মদনমোহন মুর্শিদাবাদে জজ-পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন ১৮৫০-এর নভেম্বরে। কিছুদিনের মধ্যেই এক বিতর্ক দানা বেঁধে ওঠে। বেথুন কি ওই পদটি মদনমোহনের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, নাকি মদনমোহন আপন যোগ্যতায় ওই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন? এ প্রসঙ্গে 'দ্য মর্নিং ক্রনিকল' ২০.১১.১৮৫০-এ দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করে।

"A good deal has been written about the appointment of the pundit Muddun, lately so conspicuously and honorably connected with the Hon. Mr. Bethune's school, to the office of Pundit to the Court at Moorshedabad. The appointment has been traced to Mr. Bethune's desire to serve one who had done eminent service to the caue he has so much at heart. Supposing it had been so, it would have reflected no discredit on either party. How many a man gets a government appointment for far less meritorious services, and we should be glad to learn that the government had been courageous and generous enough to give an appointment to the

man who had been courageous enough to take the lead in the education of the Native Females of the higher classes. Such, however, was not the case. We understand from good authority that the Pundit owes his elevation almost entirely to his own merits and the high sense entertained of him by the Magistrate of the district, who had known him in former times. That gentleman recommended him to the Sudder Board for the appointment, and the Board recommended him to the government, and he has obtained the appointment. The recommendation was given without Mr. Bethune's knowldge and we have good reason to believe that Muddun would have remained at his post in connection with the Female School had not Mr. Bethune urged him to accept an appointment the most honourable he could attain in his profession. That he had Mr. Bethune's influence, if required, we can easily conceive and we have no doubt that in obtaining such an office the Pundit was not without competitors. That he has succeded is true and that very success will naturally excite the jealousy of those who have not been so fortunate. If Mr. Bethune had obtained the appointment for Muddun alone, we should have said it was a good act, for he is in every way worthy of the office he now fills and has done good service to his country in the cause of female education, but since he owes his appointment to his merits as a Pundit, and the high sense entertained of him by his superiors, it is all the more honourable both to the government and to the Pundit, and we only wish all the servants of government had as good a title to preferment as the Moorshedabad Pundit." [স্মরণিকা, পৃ. ৮০]

৩৪. ১৮৫০-এর নভেম্বর থেকে ১৮৫৫-র নভেম্বর মাস পর্যন্ত মদনমোহন মুর্শিদাবাদে ১৫০ টাকা মাসিক বেতনে জজ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ পাঁচ বছর। ১৮৫৫-র ডিসেম্বর মাসে তিনি মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। যোগেন্দ্রনাথ এখানে সময়কাল ঠিক বলেন নি।

৩৫. ব্রহ্মমোহন মল্লিক স্মৃতিকথায় বলেছেন — 'বিদ্যাসাগর এডুকেশন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট বীটন সাহেবকে ধরিয়া বলিলেন — "ইংরাজি হিন্দু কলেজের ছেলেরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়। আমার কলেজের ছেলেরা কেন হয় না?" সেবার দু'জন ডেপুটি হইলেন; মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁহাদের অন্যতম।' [পু. প্র., পৃ. ১৮১]

'বড় আপশোষ' করে কৃষ্ণকমল বলেছেন — 'স্কুলে যত দিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পর আর সে দিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্য-দান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা-সাহিত্যচর্চ্চাও ছাড়িলেন। .... লোকটি নিঃসন্দেহে বিশ্ববলিনী শক্তির (Versatility) অধিকারী ছিলেন।' [পু. প্র., পৃ. ২৮] এরপর আর একধাপ এগিয়ে তিনি বলেছেন — 'তিনি যদি ডিপুটিগিরি চাকরি করিতে না গিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় রত থাকিতেন তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে প্রশংসা পুষ্পাঞ্জলি কেবল বিদ্যাসাগরের চরণে অর্পণ করিতেছি তাহা অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া দুই জনকে দিতে হইত। Genius অর্থাৎ প্রতিভা নামক যে পদার্থ আছে, মদনমোহনের স্বভাবসিদ্ধ তাহা ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অনুশীলনের অভাবে উহার তাদৃশ খোলতা হইতে পারিল না।' [পু.প্র., পৃ. ৭১]

৩৬. বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তর গবেষণা ও গ্রন্থাদি রয়েছে। তবে তথ্যনির্ভর প্রামাণ্য গ্রন্থ — বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ/বিনয় ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর/ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সা.সা.চ.), বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস/স্বপন বসু, সমকালে বিদ্যাসাগর/স্বপন বসু, তৎসহ বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থাদি।

৩৭. বিদ্যাসাগর-জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই কথা বলেছেন ঃ 'দৌরাত্ম্যের ভাগটা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপরেই কিছু অধিক হইয়াছিল। কারণ সকলের মধ্যে তিনিই আবার তাঁহার ভুবনমালা ও কুন্দমালা নাম্নী কন্যাদ্বয়কে সর্বাগ্রে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এজন্য লোকের বিদ্বেষের পরিমাণটা তাঁহাকেই মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।' [বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৬৫]

মদনমোহন দুই মেয়েকে স্কুলে পাঠানোয় সেকালের রক্ষণশীল সমাজে এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল যে তাঁর নামটাই বিকৃত রূপ ধারণ করল। পণ্ডিতকুলের মধ্যে সাক্ষাতে এক ধুয়ো তৈরি হল — 'ওরে মদনা করলে কি? ওরে মদনা করলে কি?' [শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ; ক. সা. বি.-তে উদ্ধৃত, পৃ. ১৮৮]

৩৮. বেথুন প্রয়াত হন ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট। বেথুনের মৃত্যুর কারণ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ '১৮৫১ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে বেথুন গঙ্গার পরপারে প্রায় ৫/৬ ক্রোশ দূরবর্তী জনাই গ্রামের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে সেখানকার বিদ্যালয় পরিদর্শন মানসে গমন করিয়াছিলেন। পথে বহুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও বহুদূরব্যাপী কর্দমময় পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তিনি জনাই গ্রামে উপস্থিত হন। সহৃদয় বেথুন উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই তাঁহার শেষ কার্য হইল। সহসা তাঁহার দুরারোগ্য জ্বরের সূচনা হইল, এবং তিনি সেই পীড়ায় লোকলীলা সংবরণ করিলেন।' [বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৬৬]

তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত প্রভাকর পত্রিকা সম্পাদকীয় লেখে ৩০ শ্রাবণ ১২৫৮ বঙ্গাব্দে। 'আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি এই ভারতবর্ষের পরমবন্ধু ও গুণসিন্ধু অনারেবল মেং বেথুন সাহেব সাংঘাতিক রাজগাঁর রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা সময় পরলোকগত হইয়াছেন। হা বিধাতঃ! এই নিষ্ঠুর সংবাদ লিখনকালীন আমারদিগের করস্থিত কাষ্ঠের লেখনী ক্রন্দন করিতেছে, চিত্ত বিকলিত হইতেছে নয়ন নিঃসৃত বারি দ্বারা বর্ণ সকল বিবর্ণ হইয়া আসিতেছে, আমরা চতুর্দ্দিগ শূন্য সন্দর্শন করিতেছি, বেথুন সাহেব হঠাৎ আমারদিগ্যে পরিত্যাগ করিবেন স্বপ্নেও এমত বিবেচনা করিতে পারি নাই। ......বেথুন সাহেবের ন্যায় সচ্চরিত্র প্রিয়ভাষী, পর-দুঃখে কাতর, বিদ্যানুরাগী, গরিমাশূন্য, নম্র স্বভাব, প্রতিজ্ঞা তৎপর মনুষ্য আমরা আর কোথায় পাইব? তিনি রাজকীয় উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়াও ক্ষণ-কালের জন্য অভিমানের অনুগামী হয়েন নাই। ...... বেথুন সাহেবের ন্যায় সদ্বক্তা, সুপণ্ডিত ব্যক্তি এদেশে অতি অল্প আসিয়াছেন, ...। .... তাঁহার অভাবে স্বভাবের শোভা মলিন দেখিতেছি, বিদ্যালয়ের বালকদিগের বদন বিবর্ণ হইয়াছে, বিদ্যার্থিনী বালিকাগণ ক্রন্দন করিতেছে, ...

অমায়িক কারুণিক, প্রেমিক সুজন।
স্নেহ ক্ষেত্রে প্রেমবীজ, করিল বপন।।
মূলে তার যত্নজল, হইলে সিঞ্চিত।
চারু তরু দৃশ্যমান, হইল কিঞ্চিৎ।।
পল্লব শাখায় তরু, হোলে বদ্ধমূল।
ফুটিল সৌরভযুক্ত, করুণার ফুল।।
ফলিবে সুমিষ্ট ফল, লব আস্বাদন।
কৃতান্ত কীটের দন্তে, হইল নিধন।।' [সা. বা. স-২, পৃ. ১৩৬]

ব্যথিত 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' ২১ আগস্ট ১৮৫১ লেখে ঃ—

"But the object to which his energies were particularly directed, was the Education of Native Females. He was resolved to spare no labour or expense to introduce a beneficial change in the current of popular opinion on this subject, and to induce the influential members of Native Society to elevate the character of their females by means of instruction. The School which he founded, is stated to have cost him 700 Rs. a month. Towards the noble edifice in Comwallis Square, which he endeavoured to raise for this object, he had already paid Rs. 30,000, and before his decease he made over an equal sum towards its completion, and appropriated funds for maintaining it during the next six months. During his last illness, the one peculiar object of his solicitude was the maintenance of this Institution, which he bequethed to government by a codicil to his will." [স্মরণিকা, পৃ. ৮৪]

ডালহৌসি বেথুন সম্পর্কে বলেছিলেন — 'an able, honest and zealous servant of the public, an earnest promoter of all good, kind to all, generous in the extreme, a good friend, and an enemy, I believe, to none.' [স্মরণিকা, পৃ. ৮৫]

বেথুনের মৃত্যুর পর তাঁর অনুরক্ত সহযোগীবৃন্দ একত্র হয়ে বেথুনের স্মৃতিকে বহমান রাখার জন্য এক সোসাইটি স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য উন্নত চিন্তাভাবনার চর্চা করা। সোসাইটির নাম 'বেথুন সোসাইটি'। সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। আহ্বায়ক - প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মিত্র।

৩৯. শিশুশিক্ষায় বেথুন যে মনপ্রাণ নিবেদন করেছিলেন, সেকথা শিবনাথ শাস্ত্রীও উল্লেখ করে গেছেন। 'তিনি সর্বদাই তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন; আসিবার সময় বালিকাদিগের জন্য নানা উপহার লইয়া আসিতেন; মধ্যে মধ্যে বালিকাদিগকে নিজ ভবনে লইয়া গিয়া মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়া গৃহে প্রেরণ করিতেন; কখনও কখনও চারি পায়ে ঘোড়া হইয়া শিশু বালিকাদিগকে পৃষ্ঠে তুলিয়া খেলা করিতেন।' [রা.লা., পৃ. ১৭০]

৪০. ১৮৫৫-র ডিসেম্বর থেকে একবছর মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকার পর ১৮৫৬ বা ১৮৫৭-তে কান্দিতে মদনমোহন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। যোগেন্দ্রনাথের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী ১৮৫৬-র পর কান্দিতে মদনমোহন স্কুল স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় ১.১১.১৮৫০-তারিখে প্রকাশিত সংবাদে দেখি বেথুন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে মদনমোহনের দ্বারা এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। 'আমরা পরম্পরায় শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কলিকাতা নগরে স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপনকারি অনরেবিল বেথুন সাহেব এতদ্দেশের সকল স্থানের সকল বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার উপায় করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ..... সংপ্রতি জনরবে শুনা গেল যে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিচারীয় পণ্ডিতের পদস্থ হওয়াতে উক্ত মহাত্মা তাঁহার দ্বারা তথায় কলিকাতাস্থ স্ত্রী-বিদ্যালয়ের ন্যায় এক বিদ্যালয় স্থাপন করাইবেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার উপযুক্ত পাত্র তাঁহা হইতে এখানকার স্ত্রীবিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে অতএব তাঁহার প্রতি উক্ত মহাশয় মুরশিদাবাদ অঞ্চলে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপনের ভারার্পণ করিলে তাহা সম্পন্ন হইতে পারিবেক ইহাতে সন্দেহ নাই।' [সা.বা.স.-৩, পৃ. ৬৯]

এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে তথ্য পাইনি। তবে কান্দিতে মদনমোহন কর্তৃক স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপনের কোন সংবাদও আমরা পাই নি।

৪১. মদনমোহনের মৃত্যুর তারিখ ৯ মার্চ ১৮৫৮। ১৫ এপ্রিল তারিখে 'অরুণোদয়' পত্রিকায় এই শোকসংবাদ প্রকাশিত হয়। 'আমরা দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়া সমাচার দিতেছি যে বিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মুরশিদাবাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল; এবং যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র২ বাঙ্গলা পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাতে অস্মদ্দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা আমাদিগের পাঠকবর্গ অবগত আছেন।'

৪২. যোগেন্দ্রনাথের মন্তব্যটি একেবারেই সঠিক নয়। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতায় ও আশেপাশের অঞ্চলে, যেমন শ্রীরামপুর, চুঁচুঁড়া, হাওড়া ও অন্যান্য স্থানে বহু ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম ঃ যখন ছাপাখানা এল/শ্রীপান্থ, বটতলা/শ্রীপান্থ, বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস/বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়; এছাড়া রয়েছে লঙের তালিকাসমূহ, ওয়েঙ্গার ও মারডকের তালিকা, 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত সুকুমার সেনের প্রবন্ধ 'বটতলার বেসাতি', 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক'/সবিতা চট্টোপাধ্যায়। আরও বহু গ্রন্থে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ছাপাখানা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছড়িয়ে আছে।

তথ্যের খাতিরে এটুকু উল্লেখ করা যায় যে ১৮৪০-এ শুধুমাত্র কলকাতা শহরেই কমপক্ষে ৫০টি ছাপাখানা ছিল। [সূত্র ঃ ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২৭.২.১৮৪০; বা. ন. ই.-তে উদ্ধৃত]

৪৩. যোগেন্দ্রনাথের বক্তব্য পড়ে মনে হতে পারে, বুঝি মদনমোহন এককভাবে এই প্রেস স্থাপন করেছিলেন। ঘটনা তা নয়। সেসময় বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন দুই বন্ধু হরিহরাত্মা। একজন সংস্কৃত কলেজে তখন সহকারী সম্পাদক, অন্যজন তখন ঐ কলেজেই সাহিত্যের অধ্যাপক। দুজনেই উপলব্ধি করেছিলেন নবযুগের মুক্তির অগ্রদূত হয়ে এসেছে মুদ্রাযন্ত্র। নিজেদের চিন্তাভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে তাঁরা নিজেরাই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করলেন। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা অবশ্যই মদনমোহন। বিদ্যাসাগর নিজে 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস'-এ সেকথা স্বীকার করেছেন। 'যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম; তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়।' ঐ কলেজে দুজনে একত্র থাকার সময় ২৭ জুন ১৮৪৬ থেকে ১৬ জুলাই ১৮৪৭। অতএব সংস্কৃত যন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই সময়ের মধ্যেই। দুই বন্ধু ছিলেন এই প্রেসের সমান অংশভাগী।

এ বিষয়ে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন একটু ভিন্ন কথা বলেছেন ঃ 'এই সময়ে অগ্রজ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সংস্কৃত-যন্ত্র নাম দিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।' তখন প্রেস স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দুজনের কাছে ছিল না। অগত্যা পরমমিত্র নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের থেকে ৬০০ টাকা ধার করা হল। সেই টাকায় প্রেসের প্রতিষ্ঠা। যোগেন্দ্রনাথ এই তথ্য উল্লেখ করেন নি।

অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহধন্য পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র হরিশচন্দ্র পিতার জীবনচরিত লিখতে গিয়ে 'সংস্কৃত যন্ত্র' স্থাপনের গৌরব বিদ্যাসাগরকেই দিয়েছেন। ধার করে প্রেস স্থাপনের কথাও উল্লেখ করেছেন। নতুন কথা যা বলেছেন, তা হল — 'তিনি (বিদ্যাসাগর) পিতৃদেবকেও (গিরিশচন্দ্র) ঐ যন্ত্রের একজন অংশী করিয়া লইলেন। কিন্তু তিন জনের মধ্যে কাহারও সঞ্চিত অর্থ ছিল না, সুতরাং ঋণ করিয়া উক্ত যন্ত্র ক্রয় করিতে হইল; এবং তিনজনেই নূতন নূতন পুস্তক প্রণয়ন বা প্রকাশ করিয়া ঐ মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন .....' [বি.বা.স.-তে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬৭]

৪৪. মদনমোহন-কর্তৃক 'সংশোধিত' 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশের পিছনে একটু ইতিহাস আছে। বিদ্যাসাগর অনুজ শম্ভুচন্দ্র জানিয়েছেন, যে ৬০০ টাকা নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের থেকে ধার করে প্রেস স্থাপন

করা হয়, সেই টাকা অবিলম্বে শোধ দেওয়ার কথা ছিল। সে কারণে 'এক দিবস কথা প্রসঙ্গে অগ্রজ, মার্শাল সাহেবেকে বলেন যে, "আমরা একটি ছাপাখানা করিয়াছি, যদি কিছু ছাপাইবার আবশ্যক হয়, বলিবেন।" ইহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন "বিদ্যার্থী সিবিলিয়ানগণকে যে ভারতচন্দ্রকৃত অন্নদামঙ্গল পড়াইতে হয়, তাহা অত্যন্ত জঘন্য কাগজ ও জঘন্য অক্ষরে মুদ্রিত; বিশেষতঃ অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে। অতএব যদি কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে আদি অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া ত্বরায় ছাপাইতে পার, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য আমি একশত পুস্তক লইব এবং ঐ একশতের মূল্য ৬০০, শত টাকা দিব, অবশিষ্ট যত পুস্তব বিক্রয় করিবে, তাহাতে তুমি যথেষ্টই লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইলে যে টাকা ঋণ করিয়া ছাপাখানা করিয়াছ, তৎসমস্তই পরিশোধ হইবে।" সুতরাং কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া, মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। একশত পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ৬০০, ছয় শত টাকা প্রাপ্ত হন; ঐ টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ হয়।' [পৃ. ৪৩]

শম্ভুচন্দ্রের এই বিবরণে অনেক ফাঁক থেকে গেছে। বিদ্যাসাগর মার্শালকে নিজেদের প্রেস থেকে কিছু ছাপাতে অনুরোধ করেছিলেন মাত্র। অনুরোধ শোনার সঙ্গে সঙ্গে মার্শাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্য অন্নদামঙ্গলের প্রসঙ্গ তুলবেন, তার গুণাগুণ বিচার করবেন, কোথায় মূল পুথি পাওয়া যাবে তার সুলুক-সন্ধান বিদ্যাসাগরের মত মানুষকে জানাবেন, আগাম জানিয়ে দেবেন ১০০ কপি নেওয়ার কথা এবং তার দাম কত দেবেন তাও জানাবেন — এ সব কি বিশ্বাস্য? আরও আছে। লক্ষণীয়, বিদ্যাসাগর যত টাকা ঋণ করেছেন মার্শাল ঠিক তত টাকাই দেবেন বলেছেন। উপরন্তু বিদ্যাসাগর ধার করে প্রেস প্রতিষ্ঠার কথা না বললেও মার্শাল অন্তর্যামীর মত সব জেনে গিয়েছেন — এও কি বিশ্বাসযোগ্য?

আসলে, সরকারি নথি অন্য কথা বলছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি জি.টি. মার্শালকে মদনমোহন ৭.৬.১৮৪৭-এ একটি চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি বলেছেনঃ I presume you are aware that of all the literary works hitherto written in Bengallee those of the Poet Bhaurut Chunder are alone considered the most classical and remains unrivalled in excellence up to this day. It is however greatly to be regretted that the editions of these works at present in circulation differ so materially from the original that the meaning of the author appears in several places to have been either totally or partially destroyed.

Having fortunately obtained the author's manuscript and thinking it very desirable that there should be correct edition of such a valuable production, I have the honor to state, should you be pleased to subscribe for 100 copies of the same that I shall be most happy to undertake to print.

I beg herewith to submit a specimen of the paper and printing for your apporval. The work will contain about 500 pages and be valued at 6 Rupees per copy.' [G.D.P., No-33; UPLV-তে উদ্ধৃত, পৃ. (3)]

চিঠিতে একথা স্পষ্ট যে, মার্শালের কাছে মদনমোহনই ভারতচন্দ্রের অশুদ্ধ সংস্করণের কথা জানিয়ে তাকে 'শুদ্ধ' করার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, 'সৌভাগ্যক্রমে' লেখকের মূল পাণ্ডুলিপি তাঁদের হস্তগত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বইয়ের আকার এবং দাম কত হবে তা জানিয়ে এমন কি নমুনা পর্যন্ত পাঠিয়ে ১০০ কপি বইয়ের আগাম অর্ডার প্রার্থনা করেছিলেন স্বয়ং মদনমোহন।

মার্শাল সরকারের সেক্রেটারি এফ.জে.হ্যালিডের কাছে ঐ চিঠির সুপারিশে বললেন — 'Considering the celebrity of the work referred to and the imperfect manner in which it has before been edited and printed, I would beg to recommenu that the Government should encourage the Pundit who is highly qualified for the undertaking by purchasing 100 copies at the price fixed, namely, 6 Rupees per copy.' [G.D.P., No-32; পূর্বোক্ত, পৃ. (4)]

এরপর ৯ জুন ১৮৪৭-এ মার্শালকে এক চিঠিতে সরকার ৬০০ টাকা দিয়ে ১০০ কপি 'অন্নদামঙ্গল' কেনায় সম্মতির কথা জানালেন। এর কিছুদিন পরে ১১ অক্টোবর ১০০ কপি 'অন্নদামঙ্গল' প্রাপ্তির কথা জানিয়ে মার্শাল সরকারকে এক চিঠি দিলেন। ১৩ অক্টোবর সরকারের তরফ থেকে সাব-ট্রেজারারকে সেই টাকা দেবার অনুমতি দেওয়া হল। [দ্র. U.P.L.V.] মোট কথা, জুন মাসে (১৮৪৭) লেখা চিঠিতে প্রমাণিত, প্রেস স্থাপিত হয়েছিল ১৮৪৭-এ, দ্বিতীয়ত যত তাড়াতাড়ি টাকা শোধ করার কথা হোক না কেন, অক্টোবরের মাঝামাঝির আগে সে টাকা শোধ দেওয়া যায় নি।

৪৫. যোগেন্দ্রনাথ উল্লিখিত বইগুলি ছাড়া মদনমোহন সম্পাদিত আরও কয়েকটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সংস্কৃত যন্ত্র থেকে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৭ থেকে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। জগদীশ তর্কালঙ্কারের 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' মদনমোহন কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৪৭-এ। ১৭২ পৃষ্ঠার বইটির দাম ছিল ৫ টাকা। মদনমোহন-সম্পাদিত রঘুনাথ শিরোমণির 'অনুমান দীধিতি' এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্ত্বচিন্তামণি', শ্রীহর্ষের 'খণ্ডনাখণ্ডন খাদ্য' ১৮৪৯-এ প্রকাশিত হয়। এই বই তিনটির দাম যথাক্রমে আড়াই টাকা, এক টাকা ও দু'টাকা। ১৮৫০-এ বেরিয়েছিল উদয়ন আচার্যের 'আত্মতত্ত্ববিবেক।' ৯৭ পৃষ্ঠার বই, দাম এক টাকা। কালিদাসের 'মেঘদূতম' মদনমোহন সম্পাদনা করেছেন ১৮৫১-তে। ৮০ পৃষ্ঠার বইটির দাম ১ টাকা।

৪৬. ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে (ফাল্গুন) কলকাতার রামচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে 'সর্ব্বশুভকরী সভা' স্থাপিত হয়। এই সভার সভ্যদের উদ্যোগে ঐ বছর আগস্ট মাসে সভার মুখপত্র হিসেবে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' (মাসিক) আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য ঃ '..... বহু কালাবধি আমাদিগের দেশে কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্দ্বারা এতদ্দেশের বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্ব্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাইবেক। ......পত্রিকা প্রচার তৎসমাধানের এক প্রধান উপায় বোধ হওয়াতে এই পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভিলাম।' কৃষ্ণকমল মন্তব্য করেছেন — 'পত্রিকাখানি সংস্কৃতবহুল প্রগাঢ় রচনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল।' [পু.প্র., পৃ. ২৯]

পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় একটি দীর্ঘ রচনা স্থান পেত। প্রথম সংখ্যায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' ও দ্বিতীয় সংখ্যায় 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথমটির লেখক বিদ্যাসাগর ও দ্বিতীয়টির লেখক মদনমোহন তর্কালঙ্কার। এই পত্রিকার সম্পাদকের নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। তবে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহনই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ও অনুপ্রেরণাদাতা। 'স্ত্রী-শিক্ষা' প্রবন্ধটির বিষয়ে রাজনারায়ণ বসু বলেছেন — 'স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত।' ১৮৫১ সালেই পত্রিকাটির প্রচার বন্ধ হয়। ১৮৫৫-তে অবশ্য এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়।

৪৭. স্তুতি ও প্রশংসার অতিরেকে যোগেন্দ্রনাথ বারবার একই দোষে দুষ্ট হয়েছেন। ১৮১৮ থেকে ১৮৫০-এর আগস্ট পর্যন্ত যত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকা দীর্ঘ। উৎসাহী

পাঠক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'বাংলা সাময়িকপত্র' ১ম খণ্ড দেখলেই তা জানতে পারবেন। এটুকু বলা যেতে পারে, 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্রের ইতিহাসে ৯৮তম নাম। ১৮৫০-এ জীবিত সংবাদ-সাময়িক পত্রাদির মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ 'সংবাদ রসরাজ' ও 'সংবাদ প্রভাকরে'র নাম উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অবশ্য-উল্লেখ্য 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (প্রাত্যহিক),'সংবাদ ভাস্কর' (দিনান্তরিক), 'সমাচার চন্দ্রিকা' (অর্ধ-সাপ্তাহিক), 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (সাপ্তাহিক), 'সংবাদ সুধাংশু' (সাপ্তাহিক), 'গবর্নমেন্ট গেজেট' (সাপ্তাহিক), 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' (সাপ্তাহিক), 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' (অর্ধ-মাসিক), 'তত্ত্ববোধিনী' (মাসিক), 'সত্যার্ণব' (মাসিক) ইত্যাদি।

৪৮. যোগেন্দ্রনাথের এই বক্তব্য বিদ্যাসাগর কিভাবে খণ্ডন করেছেন, 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস'-এ তার পরিচয় আছে। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের গাঢ় বন্ধুত্বে কেন ফাটল ধরল সে বিষয়ে অনেকেই জ্ঞাত থাকলেও তাঁরা মৌনাবলম্বন করেছেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর বলেছেন — 'ক্রমে ক্রমে, এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে, তর্কালঙ্কারের সহিত কোনও বিষয়ে সংস্রব রাখা উচিত নহে।' (নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য একবার বলেছেন '১৮৫০ সাল হইতে মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের উৎকট মনোমালিন্য কেন জন্মিল, কেন বিদ্যাসাগর তর্কালঙ্কারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক জোর করিয়া বিচ্ছিন্ন করিলেন, সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে চাহি না।' দ্বিতীয়বার বলেছেন 'মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্যের কারণ কি, সেটি আমি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, প্রকাশ করা উচিত নহে; তবে লেখকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রকাশিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবে।' [পু.প্র., পৃ. ৯৬ ও ২৮০]

বিদ্যাসাগর-জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য একটা কারণের উল্লেখ করেছেন। 'বিষয়কর্মে লিপ্ত হওয়ার পর সংস্কৃত যন্ত্র লইয়া মনোমালিন্যের কারণ উপস্থিত হয়।' [পৃ. ৪৫১] কিন্তু প্রেসের কোন্ দিক, অর্থাৎ গ্রন্থস্বত্ব অথবা প্রেসের মালিকানা বা অন্য কোন কারণ সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে উভয় বন্ধুর বিচ্ছেদ যে কতদূর গড়িয়েছিল, 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস'-এ তার পরিচয় আছে।

১৮৮৮-তে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস'। এর দু'বছর পর যোগেন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে লিখেছেন 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস বিফল।' শেষোক্ত বইটি আমরা দেখবার সুযোগ পাইনি। তাই সে সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। চণ্ডীচরণ দুটি বই পড়েছেন এবং তাঁর মন্তব্য থেকে সে সম্বন্ধে কিছুটা আভাস আমরা পেতে পারি। যোগেন্দ্রনাথ 'শিশুশিক্ষা' ৩টি ভাগের গ্রন্থস্বত্ব মদনমোহনের বিধবা-কন্যা কুন্দমালার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে চেয়েছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যাসাগর সেসময় 'প্রকৃত দানবীরের পরিচয়' দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর বললেন 'তথাস্তু'। 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে'ও একই কথার স্বীকৃতি রয়েছে।

চণ্ডীচরণ মন্তব্য করেছেন 'উভয় পক্ষের কথাই এক। তবে কি কারণে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল?' দুটি পুস্তিকাই পড়ে চণ্ডীচরণের মনে হয়েছে '....বোধ হয় যোগেন্দ্রবাবুর অতিব্যস্ততাই বিদ্যাসাগরের মত পরিবর্তনের কারণ।' যে কারণেই হোক, বিদ্যাসাগরের 'স্থির-প্রতিজ্ঞার যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। তিনি মুখ হইতে যে কথা বাহির করিয়াছিলেন, শত প্রকারে নিগ্রহগ্রস্ত হইয়াও তাহা রক্ষা করিলেই ভাল হইত। কারণ যাহাই হোক, তিনি যে দান করিয়া অথবা দান করিতে চাহিয়া নিজ অভিপ্রায় পরিবর্তন করিয়াছিলেন, ইহা আমাদের পক্ষে অসহনীয়।' চণ্ডীচরণ এই মর্মে সান্ত্বনা লাভ করেছেন — 'তিনি সামান্য কারণে নিজের উক্তির প্রত্যাখ্যান করেন নাই গুরুতর মর্মবেদনায় বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে ঐরূপ মত পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল।' [পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০]

অথচ এই দু'জনের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথই বলেছেন — 'তাঁহাদের বন্ধুত্ব অতি গাঢ় ও গভীর ছিল। ......তাঁহাদের উদারচিত্ত পরস্পরের উন্নতিতে বিন্দুমাত্র কাতর হইত না।' 'বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল শুভানুষ্ঠানের সূচনা করিতেন, মদনমোহন তাহার প্রত্যেকটিতে আগ্রহ সহকারে যোগদান করিতেন। অনেক অনুষ্ঠানে উভয়ের এরূপ আগ্রহ দেখা যাইত যে, কে পরিচালক আর কে পরিচালিত তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন হইত।' [বিদ্যাসাগর, পৃ. ৬৫] মদনমোহনের প্রায় প্রত্যেকটি চাকরির নেপথ্যে বিদ্যাসাগরের অবদান যে ছিল, মদনমোহনের স্বীকারোক্তি তা প্রমাণ করে। এমনতর বন্ধুত্বে 'বিচ্ছেদের ফেনিলরাশি' উত্থিত হলেও জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও মদনমোহন 'ঈশ্বর'-নির্ভরতা বিস্মৃত হন নি। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ক্রন্দনরতা স্ত্রী-র হাত ধরে বলেছেন — 'প্রাণসখা ঈশ্বর তোমায় সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দিবে। তাহার জীবদ্দশায় তুমি ও আমার প্রাণসমা কন্যাগণ কোন কষ্ট পাইবে না।'

সত্যিই পায় নি। 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস'-এ তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এমন কি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরও যাতে তাঁদের কষ্ট না হয় সেজন্য ১৮৭৫ সালে স্বকৃত উইলে বিদ্যাসাগর তার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। মদনমোহনের মা -কে ৮ টাকা, কন্যা কুন্দমালাকে ১০ টাকা, বোন বামাসুন্দরীকে ৩ টাকা হারে মাসোহারা নির্দিষ্ট করে গিয়েছিলেন। [দ্র. ক.সা.বি., পৃ. ৪২৮-২৯]

মদনমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে 'উৎকট মনোমালিন্য' শুরুর সময় ১৮৫০ সাল বলে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দুটি তথ্যের পুনঃস্মরণ প্রয়োজন। (১) মদনমোহন ১৮৫০-এর নভেম্বরে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন এবং মুর্শিদাবাদে জজ পণ্ডিত হন। (২) ১৮৫৫-র ডিসেম্বরে তিনি মুর্শিদাবাদে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ডেপুটি হওয়ার পর শ্যামাচরণ দে-কে এক চিঠিতে মদনমোহন লিখেছিলেন 'ক্রমশঃ পদোন্নতি ও এই ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী পদ প্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলি বিদ্যাসাগরের সহায়তা বলে হইয়াছে, ...।' [দ্র. নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস]

প্রশ্ন হল, ১৮৫০ থেকে 'উৎকট মনোমালিন্য' জন্মানোর পরও কি বিদ্যাসাগর মদনমোহনের জন্য ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবেন? যেখানে পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে তিনি উইলের থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন — এহেন কঠোর মানুষ মনোমালিন্যের পরও বন্ধুকৃত্য চালিয়ে যাবেন দীর্ঘ আরও পাঁচ বছর! কতটা বিশ্বাসযোগ্য?

পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন লিখেছেন 'বিদ্যাসাগর মহাশয় তীব্রতেজাঃ লোক ছিলেন।' তাঁর এই তেজ কতদূর গিয়েছিল তার আর একটা প্রমাণ দিই। যোগেন্দ্রনাথের এই রচনার প্রকাশকাল ১৮৭১/৭২ খ্রিস্টাব্দ। রচনাটি পাঠ করে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতিক্রিয়া লিখিত আকারে প্রথম ব্যক্ত করেন ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-র দশম সংস্করণে। একই বছরে প্রকাশিত হয় 'বর্ণপরিচয়'-২য় ভাগের ৬২তম সংস্করণ। এতদিন 'বর্ণপরিচয়'-২য় ভাগে 'শিশুশিক্ষা' থেকে সংকলন ছিল। সে নিয়ে কোন সমস্যাই দেখা দেয় নি। এবার তিনি সতর্ক হলেন। এর সঙ্গে মিশে গেল ক্রোধ। পাছে গ্রন্থস্বত্ব বিষয়ে কোন উপদ্রব দেখা দেয়, এজন্য 'শিশুশিক্ষা'-র থেকে গৃহীত অংশটুকু পরিহার করলেন। সঙ্গে মন্তব্য করলেন — 'পুস্তকের শেষভাগে, শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কাষিত হইয়াছে।' 'নিষ্কাষিত' শব্দটি অবশ্যলক্ষণীয়।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা স্মর্তব্য। ১৮৪৭-এ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হবার পর গ্রন্থটি অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে হিন্দু কলেজ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। (বিস্তৃত বিবরণ 'বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা' শীর্ষক প্রকাশিতব্য গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে) তখন বিদ্যাসাগর গ্রন্থটির পরিমার্জনা করে ২য় সংস্করণ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনে বলেছিলেন - 'যে যে স্থানে অসংগত ও অপরিশুদ্ধ ছিল সুসংগত ও সংশোধিত হইয়াছে এবং অশ্লীল পদবাক্য উপাখ্যানভাগ পরিত্যাগ করা গিয়াছে।'

আপন গ্রন্থের ক্ষেত্রে 'পরিত্যাগ করা' আর অপরের গ্রন্থের ক্ষেত্রে 'নিষ্কাষণ করা'। 'পরিত্যাগ' এবং 'নিষ্কাষণ' — দুটি শব্দের অর্থগত তাৎপর্যের ভিন্নতা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর অবহিত ছিলেন নিশ্চয়ই! আসলে ক্রুদ্ধ বিদ্যাসাগরের লেখনীতে সেসময় 'নিষ্কাষণে'র পরিপূরক শব্দও আসেনি।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, যে বিদ্যাসাগর মদনমোহনের জন্য এত কিছু করেছেন এবং তা মদনমোহন স্বীকারও করেছেন, সেই বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মদনমোহনের মৃত্যুর পর যোগেন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করলেন কেন। বিহারিলাল সরকার বলেছেন, আসলে পুরো ঘটনাই তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছে যোগেন্দ্রনাথ শুনেছিলেন। আর নির্বিচারে তা বিশ্বাসও করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আমাদের একটু ভিন্ন মত আছে। দু'বার বিপত্নীক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১৮৭১ সালে বিদ্যাসাগরের নির্দেশেই বিয়ে করেছিলেন মদনমোহনের ছোট মেয়ে মালতীমালাকে। তখনও মদনমোহনের মেজমেয়ে কুন্দমালা বিদ্যাসাগরের থেকে দশটাকা করে মাসোহারা পেয়ে যাচ্ছেন। সে বছরই কুন্দমালার জন্য শিশুশিক্ষার তিনভাগের স্বত্ব চাইতে গিয়েছিলেন যোগেন্দ্রনাথ। রাজিও হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের বেফাঁস মন্তব্যে বেঁকে বসেন তিনি। অতএব যোগেন্দ্রনাথও এর শোধ তুলতে বাসনা করলেন। এর শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করা কিংবা খাটো করে দেখানো।

মদনমোহনের জীবনী মনোযোগসহ পড়লে বোঝা যায়, সূচনায় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে দু'চার কথা বললেও পরবর্তী পর্যায়ে মদনমোহনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিদ্যাসাগরের অবদান বিষয়ে যোগেন্দ্রনাথ ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব থেকেছেন। চণ্ডীচরণ মন্তব্য করেছেন — 'শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, বিদ্যাসাগর ও তর্কালঙ্কার কাহিনী বর্ণনায় সর্বত্রই তর্কালঙ্কার মহাশয়কে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিছুমাত্র অগৌরব না হইলেও তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গৌরবও তাহাতে বৃদ্ধি পায় নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় জ্ঞানে ও গুণে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তিনি নিজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি সর্বদা যে আনুগত্যের ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিপিচাতুর্যে সেটুকু অদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াছি।' [বিদ্যাসাগর, পৃ. ৩৬]

দুই বন্ধুর তুলনা করতে গিয়ে কৃষ্ণকমল লিখেছেন — 'বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, ইহ সংসারে উন্নতিলাভের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগিতা অপেক্ষা যাহাকে character (চরিত্র) কহে অর্থাৎ অধ্যবসায়, বিবেচকতা এবং অকুতোভয়তা এই সকল বৃত্তির উপযোগিতা অধিক। বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আস্‌মান জমিন্‌ প্রভেদ। যাহাকে backbone কহে বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়ত Vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হয়েন কি না সন্দেহ।' [পু. প্র., পৃ. ৭১]

সাহিত্যশিল্পী বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকার একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন — 'দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী, তৎপার্শ্বে উপবীতবক্ষে গণেশমূর্ত্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতীস্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ূর চূড়া টেরি কাটা কার্ত্তিকস্বরূপ ঈশ্বরগুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহাদেবতা পিতৃদেব, চালচিত্রে শিবরূপী মদনমোহন, — সাহিত্যে আমি এই মহাপ্রতিমার উপাসক।' [বি. বা. স. -তে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩৫]

বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন — দুই বন্ধুর বিচ্ছেদ বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এক বড় ক্ষতি। 'বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে, পারিবারিক জীবনে বন্দী হয়ে ছিলেন বলে, মদনমোহনের প্রতিভা বাইরে তেমন স্বীকৃতি পায় নি। স্বীকৃতির চেয়েও বড় কথা হল, মদনমোহনের চরিত্রেও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়নি, পারিবারিক পরিবেশের সংকীর্ণতার মধ্যে।

মদনমোহনের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি এইখানে। ......সংকীর্ণ স্বার্থের অন্বেষণে তাঁর চরিত্রের ঐশ্বর্য চূর্ণরশ্মির মতো চারিত হয়ে গেছে, অগ্নিশিখার মতো বহির্জীবনে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠেনি। ....শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে, সামাজিক কুসংস্কার নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে, দুই বন্ধু নির্ভয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। ...... কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনের অভিশাপ অবশেষে দৈত্যের মতো দু'জনের মধ্যে নেমে এল, এবং দু'জনেরই জীবনে গভীর বেদনার ছায়াসঞ্চার করল। .....বিচ্ছেদ হল দুই বন্ধুর জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থান্ধ আত্মীয়স্বজনের জন্য।' [বি. বা. স., পৃ. ১৬৩]

৪৯. একই মন্তব্য করেছেন উমেশচন্দ্র দত্ত। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর মূল্যায়নে মদনমোহন 'মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণী'-র (Vertabrate) অন্তর্ভুক্ত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আর উমেশচন্দ্র তার বিপরীত কথা বলেছেন। 'মদনমোহন খুব তেজস্বী ছিলেন। একদিন একজন বড় সাহেব কর্ম্মচারী পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া আহ্বান করিয়াছিল; পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "খবরদার, ভদ্রলোকের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করিবেন।" সাহেব তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।' [পু. প্র., পৃ.১৪৯]

৫০. উমেশচন্দ্র বলেছেন ওই সাহেবের নাম ইয়েটস্। মদনমোহনের সঙ্গে তাঁর বাংলা ভাষা নিয়ে তর্ক হয়েছিল। ইয়েটস্ 'একটু উত্তেজিতভাবে' তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ওই বাংলা তিনি কোথায় শিখেছেন। সম্ভবত এই ঘটনাটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মদনমোহনের চাকরিরত অবস্থায় ঘটেছিল।

এর সঙ্গে বাগ্মী মদনমোহনের কিছুটা পরিচয় দেওয়া সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তখন তিনি মুর্শিদাবাদে চাকরিরত। ১৮৫০-এর পরের কথা। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। পুরোন 'তীর্থক্ষেত্র' ভুলতে পারেন না। সংস্কৃত কলেজে বেড়াতে আসেন। একবার তিনি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তর্কবাগীশ জিজ্ঞাসা করলেন — 'ও দেশের লোকজন কেমন? ভদ্রলোকের মতন বটে? মদনমোহনের উত্তর — 'মহাশয়, সে কথা বলিবেন না, অধিকাংশ লোক এরূপ যে, শাঠ্য, লাম্পট্য, কাপট্য, ব্যতিরেকে পদবিন্যাসটিমাত্র নাই।' — ঘটনাটি বর্ণনা করে কৃষ্ণকমলের মন্তব্য 'ফলতঃ সংস্কৃত সুদীর্ঘ শব্দঘটা যেন মদনমোহনের তুণ্ডাগ্রে সর্ব্বদা বিদ্যমান ছিল। তিনি যেন সে বিষয়ে একজন স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন।' নমুনা দিয়েছেন কৃষ্ণকমল — 'তিনি একবার সর্ব্বশুভকরী পত্রিকাতে 'অসামান্য শেমুসীসম্পন্ন' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। বোধহয় বিদ্যাসাগরও শেমুসী (আভিধানিক শব্দ = বুদ্ধি) শব্দ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন।' [পু. প্র., পৃ. ২৮]

প্রতিবাদী মদনমোহনের সামান্য পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর নানান সমস্যার সঙ্গে নতুন এক সমস্যার উদ্ভব হল 'ভাবনা' নামে এক মেয়েকে কেন্দ্র করে। হরকরা পত্রিকায় এ নিয়ে অভিযোগ উঠল। প্রত্যুত্তর এল ক্রিশ্চিয়ান অ্যাডভোকেট, মর্নিং ক্রনিকল পত্রিকায়। সঙ্গে সঙ্গে মদনমোহনও ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় দীর্ঘ প্রতিবাদপত্র পাঠালেন ৩ অক্টোবর ১৮৫০ তারিখে। পরের দিনই মর্নিং ক্রনিকল পত্রিকায় মদনমোহনের পত্রের উল্লেখ করে মন্তব্য প্রকাশিত হয়। মদনমোহনের দীর্ঘ প্রতিবাদপত্র সেসময় বেশ আলোড়ন তুলেছিল বোঝা যায়। (সমস্ত চিঠিপত্র বাহুল্যভয়ে এখানে উদ্ধৃত হল না। আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন — 'বেথুন স্কুল ও নারীশিক্ষার দেড়শো বছর' - পৃ. ৭৩-৭৭)।

নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

কলিকাতা
সংস্কৃত যন্ত্র
১২৯৫ সাল।

বিজ্ঞাপন

সপ্তদশ বৎসর অতীত হইল, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ., তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা উপলক্ষে, আমার উপর, পরস্বহারী বলিয়া যে দোষারোপ করেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের অভিলাষে, তদ্বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য, লিপিবদ্ধ করিয়া, পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় ছিল। নানা কারণে, তৎকালে সে অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারি নাই; এবং, এত দিনের পর, আর তাহা সম্পন্ন করিবার অণুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিতে পাই, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর আরোপিত দোষের উল্লেখ করিয়া, অদ্যাপি অনেক মহাত্মা আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এজন্য, কতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, স্বীয় বক্তব্য মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে হইল।

যে মহোদয়েরা, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, আমি পরস্বহারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এই পুস্তকে একবার দৃষ্টিসঞ্চারণ করেন; তাহা হইলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, যোগেন্দ্রনাথ বাবু, উচিতানুচিত বিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া, আমার উপর যে উৎকট দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা, কোনও মতে, সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

যোগেন্দ্রনাথ বাবু স্বীয় শ্বশুরের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ জীবনচরিতে তিনি আমার বিষয়ে যাদৃশ বিসদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে, এই পুস্তকের শেষ ভাগে, তাহাও পরিদর্শিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে বাবু দীননাথ বসু উকীলের দুইখানি পত্র প্রকাশিত, এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই পত্রের আবশ্যক এক এক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। প'ছে কেহ এরূপ মনে করেন, এই সকল পত্র কৃত্রিম; এজন্য লিথগ্রাফি প্রণালীতে মুদ্রিত ও পুস্তকের শেষে যোজিত হইল। যাঁহারা তাঁহাদের হস্তাক্ষর জানেন, অন্ততঃ তাঁহারা, এই সকল পত্র কৃত্রিম বলিয়া, আমার উপর দোষারোপ করিতে পারিবেন না।

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা

১লা বৈশাখ, ১২৯৫ সাল।

নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস

যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম; তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায়, তিনি ও আমি, উভয়ে সমাংশভাগী ছিলাম। কতিপয় বৎসর পরে, তর্কালঙ্কার, মুরসিদাবাদে জজ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া, কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। কিছু দিন পরে, তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়েন।

ক্রমে ক্রমে, এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে, তর্কালঙ্কারের সহিত কোনও বিষয়ে সংস্রব রাখা উচিত নহে। এজন্য উভয়ের আত্মীয় পটোলডাঙ্গানিবাসী বাবু শ্যামাচরণ দে দ্বারা, তর্কালঙ্কারের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাই, হয় তিনি, আমার প্রাপ্য আমায় দিয়া, ছাপাখানায় সম্পূর্ণ স্বত্ববান্ হউন, নয় তাঁহার প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া, ছাপাখানার সম্পর্কছাড়িয়া দিউন, অথবা উভয়ে ছাপাখানার যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া লওয়া যাউক। তদনুসারে তিনি, আপন প্রাপ্য লইয়া, ছাপাখানার সম্পর্কত্যাগ স্থির করেন। অনন্তর, উভয়ের সম্মতিক্রমে, বাবু শ্যামাচরণ দে, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই তিন ব্যক্তি, হিসাব নিকাস ও দেনা-পাওনা স্থির করিয়া দিবার নিমিত্ত, সালিস নিযুক্ত হয়েন, এবং খাতা পত্র দেখিয়া, হিসাব নিকাস ও দেনা-পাওনার মীমাংসা করিয়া দেন। তাঁহাদের মীমাংসাপত্রের প্রতিলিপি তর্কালঙ্কারের নিকট প্রেরিত হইলে, তিনি পত্রদ্বারা শ্যামাচরণ বাবুকে জানান, আমি এক্ষণে যাইতে পারিব না; আদালত বন্ধ হইলে, কলিকাতায় গিয়া, আপন প্রাপ্য বুঝিয়া লইব। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহার পত্নী কলিকাতায় আসিয়া, ছাপাখানা সংক্রান্ত স্বীয় পতির প্রাপ্য বুঝিয়া লয়েন।

কলিকাতায়, মুরসিদাবাদে ও কাঁদিতে কর্ম্ম করিবার সময়, তর্কালঙ্কারের পরিবার তাঁহার নিকটে থাকিতেন; তাঁহার বৃদ্ধা জননী বিল্বগ্রামের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর, তাঁহার পরিবার বিল্বগ্রামের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে, তর্কালঙ্কারের মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় আগমন করিলেন, এবং নিরতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, বিলাপ ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র হইয়াছিল। কনিষ্ঠটি, কিছুকাল পূর্ব্বে , কাল গ্রাসে পতিত হয়েন। জ্যেষ্ঠ তর্কালঙ্কার জননীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। জননীর দুর্ভাগ্যবশতঃ, তিনিও মানবলীলার সংবরণ করিলেন। এমন স্থলে, জননীর যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে, তাহা অনায়াসেই সকলের অনুভবপথে আসিতে পারে। দুই তিন দিন পরে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তর্কালঙ্কার আপনকার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, মদন আমার কোনও ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। বধূমাতা, আপন কন্যাগুলি লইয়া, স্বতন্ত্র আছেন। আমার দিনপাতের কোনও উপায় নাই; এজন্য তোমার নিকটে আসিয়াছি। যদি তুমি দয়া করিয়া অন্ন বস্ত্র দাও, তবেই আমার রক্ষা; নতুবা আমায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক। এই বলিয়া, তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, তর্কালঙ্কার যথেষ্ট টাকা রাখিয়া গিয়াছেন; অথচ তাঁহার বৃদ্ধা জননীকে, অন্ন বস্ত্রের জন্যে, অন্যের নিকটে ভিক্ষা করিতে হইতেছে। যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, তিনি বলিলেন, মাস মাস দশ টাকা পাইলে, আমার দিনপাত হইতে পারে। এই সময়ে, রোগ, শোক, আহার-ক্লেশ প্রভৃতি কারণে, তাঁহার শরীর সাতিশয় শীর্ণ হইয়াছিল; অধিকন্তু, চক্ষুর দোষ জন্মিয়া ভাল দেখিতে পাইতেন না। তিনি বলিলেন, শরীর সুস্থ থাকিলে, ও চক্ষুর দোষ না জন্মিলে, পাঁচ টাকা হইলেই আমার চলিতে পারিত। কিন্তু শরীরের ও চক্ষুর যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে একটি পরিচারিকা ব্রাহ্মণকন্যা না

রাখিলে, আমার কোনও মতে চলিবেক না। আমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি অধিকদিন বাঁচিব না; সুতরাং অধিক দিন তোমায় আমার ভার বহিতে হইবেক না। এই সকল কথা শুনিয়া, আমি তাঁহাকে মাস মাস দশ টাকা দিতে সম্মত হইলাম; এবং, মাসে মাসে, তাঁহার নিকটে টাকা পাঠাইয়া দিতে লাগিলাম।'

কিছু দিন পরে, তিনি পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিলেন। কি জন্যে আসিয়াছেন, এই জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন, বাবা! তুমি আমার অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ দূর করিয়াছ। আর এক বিপদে পড়িয়া, পুনরায় তোমায় জ্বালাতন করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন, অমুকের অত্যাচারে আমি আর বাটীতে তিষ্ঠিতে পারি না। বিশেষতঃ পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আমাদের বাটীতে আসিলে, তাহাদের সমক্ষে, তিনি অকারণে আমার এত তিরস্কার করেন, যে প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে আমি তোমার নিকটে আসিলাম। তখন আমি বলিলাম, মা আপনকার এ অসুখের নিবারণ করা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, আমি বলিলাম, আপনি যেরূপ বলিতেছেন তাহাতে আর আপনকার সংসারে থাকিবার কোনও আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে না। আমার বিবেচনায়, অতঃপর কাশীবাস করাই আপনকার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। আমার পিতৃদেব কাশী বাসী হইয়াছেন; যদি মত করেন, আপনাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিই। তিনি বাসা স্থির করিয়া দিবেন; সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিবেন; আপনকার পরিচর্য্যার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণ কন্যা স্থির করিয়া দিতে পারিবেন; তাঁহার নিকট হইতে মাস মাস দশ টাকা পাইবেন; যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে মাসিক দশ টাকাতে, সেখানে সচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারিবেন। তিনি সম্মত হইলেন; তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি অদ্যাপি কাশী বাস করিতেছেন। এবং আমার নিকট হইতে, মাস মাস, দশ টাকা পাইতেছেন।

একদা, তর্কালঙ্কারের পত্নী ও বিধবা মধ্যমা কন্যা কুন্দমালা কলিকাতায় আসিলেন। একদিন কুন্দমালা তাঁহার জননীর সমক্ষে, আমায় বলিল, দেখ, কাকা! পিতা অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন; মা বুঝিয়া চলিলে, আমাদের সচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারিত। কিন্তু উনি বিবেচনা করিয়া চলিতেছেন না, সকলই উড়াইয়া ফেলিতেছেন। আর কিছুদিন পরে, আমাদিগকে অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইতে হইবেক। উঁহার অদৃষ্টে যাহা আছে, হউক; কিন্তু আমি অল্পবয়স্কা ও অনাথা; আমায় অধিক দিন বাঁচিতে হইবেক। আমার অদৃষ্টে কত কষ্টভোগ আছে, বলিতে পারি না। এই বলিয়া, নিতান্ত শোকাকুল হইয়া, কুন্দমালা অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে নিরতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন আমি কুন্দমালাকে বলিলাম, বাছা! রোদন করিও না; আমি যত দিন জীবিত থাকিব, তুমি অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না। আমি তোমাকে মাস মাস দশ টাকা দিব; তাহা হইলেই তোমার অনায়াসে দিনপাত হইতে পারিবেক। এই বলিয়া, সেই মাস অবধি, আমি কুন্দমালাকে, মাস মাস, দশ টাকা দিতে আরম্ভ করিলাম। সে অদ্যাপি, আমার নিকট হইতে মাস মাস দশ টাকা পাইতেছে।

এস্থলে ইহাও উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক, ছাপাখানা স্থাপিত হইবার কিছু দিন পরে, একটি সরকার নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়। তর্কালঙ্কারের ভগিনীপতি মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতিকষ্টে দিনপাত করিতেন, ইহা আমি সবিশেষ অবগত ছিলাম; এজন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলাম। তর্কালঙ্কার প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না; অবশেষে, আমার পীড়াপীড়িতে, তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। মাধবচন্দ্র, মাসিক দশ টাকা বেতনে, নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল কর্ম্ম করিয়া, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তর্কালঙ্কারের ভগিনী, কলিকাতায় আসিয়া, আমার নিকটে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং সাতিশয় কাতর বচনে বলিলেন, দাদা! কাল কি খাইব, তাহার সংস্থান নাই। অতএব, দয়া করিয়া, আমার কোনও উপায় কর। নতুবা, ছেলে মেয়ে লইয়া, আমায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক। তর্কালঙ্কারের ভগিনী যাহা বলিলেন, তাহা কোনও অংশে অপ্রকৃত নহে; এজন্য তর্কালঙ্কারের নিকট প্রস্তাব করিলাম, যত দিন

তোমার ভাগিনেয়টি মানুষ না হয়, তাবৎ, ছাপাখানার তহবিল হইতে তোমার ভগিনীকে মাস মাস দশটাকা দিতে হইবেক। তর্কালঙ্কার নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, সম্মত হইলেন। তাঁহার ভগিনী ছাপাখানার তহবিল হইতে, মাস মাস দশটাকা পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে, তর্কালঙ্কার মুরসিদাবাদ হইতে, লিখিয়া পাঠাইলেন, আমার ভগিনীকে ছাপাখানার তহবিল হইতে, মাস মাস যে দশ টাকা দেওয়া হয়, তাহা আমি, আগামী মাস হইতে, রহিত করিলাম। এই সংবাদ পাইয়া, তাঁহার ভগিনী, কলিকাতায় আসিয়া, আমার নিকটে রোদন করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, ছাপাখানার তহবিল হইতে আর আমি তোমায় টাকা দিতে পারিব না। আমি এইমাত্র করিতে পারি, আমার অংশের পাঁচ টাকা তুমি মাস মাস, আমার নিকট হইতে পাইবে; ইহার অতিরিক্ত দেওয়া আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, আমার নিকট হইতে, মাস মাস, পাঁচ টাকা পাইয়া, কোনও রূপে দিনপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তদীয় পুত্রটির প্রাণত্যাগ ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয়া বিধবা কন্যা, যত দিন জীবিত ছিলেন, আমার নিকট হইতে মাস মাস দুই টাকা লইয়া, দিনপাত করিয়াছিলেন।

এক দিন, তর্কালঙ্কারের জামাতা শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, তর্কালঙ্কারের বিধবা মধ্যমা কন্যা কুন্দমালার উল্লেখ করিয়া, আমায় বলিলেন, মেজ দিদি বলেন, কাকা, দয়া করিয়া, আমায় মাস মাস দশ টাকা দিতেছেন; তাহাতে আমার দিনপাত হইতেছে। যদি তিনি, দয়া করিয়া, শিশুশিক্ষার তিন ভাগ আমায় দেন, তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ঠ উপকার হয়। এই কথা শুনিয়া, আমি যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে বলিলাম, কুন্দমালাকে বলিবে, আমি, তাহার প্রার্থনা অনুসারে, শিশুশিক্ষার তিনভাগ তাহাকে দিলাম। আজ অবধি, সে ঐ তিন পুস্তকের উপস্বত্বভোগে অধিকারিণী হইল। যোগেন্দ্রনাথ বাবু কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর আমায় বলিলেন, দেখুন আপনি পুস্তক তিনখানি দয়া করিয়া তাঁহাকে দিতেছেন, এরূপ ভাবিবেন না। সালিসেরা যে মীমাংসাপত্র লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে শিশুশিক্ষার কোনও উল্লেখ নাই; সুতরাং, শিশুশিক্ষা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি। এই কথা শুনিয়া, আমি চকিত হইয়া উঠিলাম; এবং, সহসা কিছুই অবধারিত বুঝিতে না পারিয়া, যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে বলিলাম, তবে শিশুশিক্ষার বিষয় আপাততঃ স্থগিত থাকুক। সবিশেষ অবগত না হইয়া, আমি এ বিষয়ে কিছু বলিতে ও করিতে পারিতেছি না। যদি এরূপ হয়, আমি পরকীয় সম্পত্তি অন্যায়রূপে অধিকার করিতেছি, তাহা হইলে, কেবল পুস্তক তিন খানি দিয়া, নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না; যে কয় বৎসর ঐ তিন পুস্তক আমার অধিকারে আছে, সেই কয় বৎসরের যে প্রকৃত উপস্বত্ব হইবেক, তাহাও, পুস্তকের সহিত, তর্কালঙ্কারের উত্তরাধিকারীদিগকে দিতে হইবেক। অতএব, তুমি কিছু দিন অপেক্ষা কর; আমি, এ বিষয়ের সবিশেষ তদন্ত করিয়া, প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তোমায় জানাইব।

এই কথা বলিয়া, সে দিন যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে বিদায় করিলাম; এবং, অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, উপস্থিত বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। সর্ব্বাগ্রে সালিস মহাশয়দিগের মীমাংসাপত্র বহিষ্কৃত করিলাম; তাহাতে শিশুশিক্ষার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। পরে, সালিস মহাশয়দিগকে, উপস্থিত বিষয় অবগত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, এ বিষয়ে আপনাদের কিছু স্মরণ হয় কি না। তাঁহারা বলিলেন, বহু বৎসর পূর্ব্বে, আমরা সালিসি করিয়াছিলাম; এক্ষণে তৎসংক্রান্ত কোনও বিষয়ের কিছুই স্মরণ হইতেছে না। অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর, শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, আমার ঠিক কিছুই মনে পড়িতেছে না; তবে আপাততঃ এই মাত্র স্মরণ হইতেছে, তুমি তোমাদের রচিত পুস্তকের বিষয়ে কোনও প্রস্তাব করিয়াছিলে। মদন, সে বিষয়ে, আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন। যদি সে পত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে, বোধ করি, আর কোন গোল থাকে না।

আমি যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম। তিনি, তাহা না করিয়া, আমায় ভয় দেখাইয়া, সত্বর কার্য্যশেষ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে, বাগবাজার নিবাসী বাবু দীননাথ বসু উকীলের নিকটে গমন করিলেন। দীননাথ বাবু, তাঁহার মুখে যেরূপ শুনিলেন, তদনুসারে আমায় নিম্নদর্শিত পত্র

লিখিলেন,

"Pundit Isswar Chunder Bidyasagor.

My Dear Sir,

The widow and children fo the late lamented Mudun mohun Turkalankar are in difficulty in consequence of your having stopped their allowance for profit in Turkalankar's works and preventing their publication by them. I hope you will please do something for them to avoid scandal and future botheration. The matter has been brought into my notice by persons interested for the family of Turkalankar and I have assured them that there will be no difficulty for them to get back their rights. Kindly try to settle the matter amicably as soon as possible lest it grows serious by delay. Hoping you are well.

I remain

Yours V Sincerely

17' May 71. DINONATH BOSE"

পত্রের অনুবাদ

"আপনি মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত পুস্তকের উপস্বত্ব হিসাবে তাঁহার পরিবারকে যাহা দিতেন, তাহা রহিত করিয়াছেন; এবং তাঁহাদিগকে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিতেছেন না; এজন্য তাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন। আমি আশা করি, আপনি এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবেন; নতুবা আপনাকে দুর্নামগ্রস্ত ও উৎপাতে পতিত হইতে হইবেক। তর্কালঙ্কারপরিবারের হিতৈষী ব্যক্তিরা এ বিষয় আমার গোচর করিয়াছেন; এবং আমি তাঁহাদিগকে অবধারিত বলিয়াছি, তাঁহাদের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইতে তাঁহাদিগকে ক্লেশ পাইতে হইবেক না। আপনি দয়া করিয়া, যত সত্বর পারেন, এ বিষয়ের আপোশে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবেন, বিলম্ব করিলে আপনাকে কষ্ট পাইতে হইবেক।"

আমি তর্কালঙ্কারের পরিবারকে, তাঁহার পুস্তকের উপস্বত্ব হিসাবে, যাহা দিতাম, তাহা রহিত করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিতেছি না; যোগেন্দ্রনাথ বাবু, কোন বিবেচনায় দীননাথ বাবুর নিকট, এরূপ অলীক নির্দ্দেশ করিলেন, বলিতে পারি না। তর্কালঙ্কারের পরিবার, পুস্তকের উপস্বত্ব বলিয়া, তাঁহাদিগকে কখনও কিছু দিই নাই। আর তাঁহারা ঐ পুস্তক ছাপাইতে চাহেন, আমার নিকট কখনও এরূপ কথার উত্থাপন হয় নাই। এমন স্থলে, আমি পুস্তকের উপস্বত্ব দান রহিত করিয়াছি, এবং পুস্তক ছাপাইতে দিতেছি না, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে, মহামতি যোগেন্দ্রনাথ বাবু ব্যতীত অন্যের তাহা বুঝিবার অধিকার নাই। ফলকথা এই, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ অলীক ও কপোলকল্পিত। তিনি, তর্কালঙ্কারের মধ্যমা কন্যা কুন্দমালার নাম করিয়া, আমার নিকটে, ভিক্ষাস্বরূপ, শিশুশিক্ষা প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে, কখনও, কোনও সূত্রে, কোনও আকারে, শিশুশিক্ষার কোনও উল্লেখ হয় নাই।

যাহা হউক, দীননাথ বাবুর পত্র পাইয়া, আমি সাতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। শ্যামাচরণ বাবুও, পত্রার্থ অবগত হইয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে, ইহার তিন চারি দিন পরেই, তর্কালঙ্কারের পত্র হস্তগত হইল। পত্রপাঠ করিয়া, সমস্ত বিষয় আমার ও শ্যামাচরণ বাবুর স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। সে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই —

সালিস মহাশয়েরা হিসাব নিকাসে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, আপনাদিগকে দুই প্রকার হিসাব করিতে হইবেক; প্রথম এই, অন্যান্য পুস্তকের ন্যায়, আমাদের উভয়ের রচিত পুস্তকের ছাপার খরচ ধরিয়া লইয়া, ছাপাখানার হিসাব করিতে হইবেক; দ্বিতীয় এই, আমাদের রচিত পুস্তকের, ছাপার ও বিক্রয়ের খরচ বাদে, যে মুনাফা থাকিবেক, তাহার স্বতন্ত্র হিসাব করিতে হইবেক। ছাপাখানার মুনাফায় উভয়ে তুল্যাংশভাগী হইব; এবং, ছাপার ও বিক্রয়ের খরচ বাদে, কাপিরাইট হিসাবে আমরা

স্ব স্ব পুস্তকের উপসত্ব পাইব। শ্যামাচরণ বাবু পত্রদ্বারা তর্কালঙ্কারকে এই বিষয় এবং আর কতিপয় বিষয় জানাইলে, তর্কালঙ্কার তদুত্তরে এ বিষয়ে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান, —

> "Copyright বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছ তদ্বিষয়ে কয়েক কথা বক্তব্য আছে, আমি যে পর্য্যন্ত ছাপাখানার কার্য্য করিয়াছিলাম তৎকাল পর্য্যন্ত কাপিরাইটের কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত ছিল না, এবং আমার যেন এইরূপ স্মরণ হইতেছে, বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল হইলেন তখনি মৃত মহাত্মা বীটন সাহেব তাঁহাকে ছাপাখানার ব্যবসায় বিষয়ক কি Hint দিয়াছিলেন অথবা দত্তবংশীয়েরা তাঁহার উপর কোন কলঙ্কারোপ না করিতে পারে এই বিবেচনা করিয়া ফলে আমার সে কথা ঠিক স্মরণ পড়িতেছে না, বিদ্যাসাগর ভায়া ছাপাখানার অংশীদার থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি আর ছাপাখানার অংশ গ্রহণ করিবেন না, যে সকল পুস্তক তিনি রচনা করিয়া দিবেন, তাহার কাপিরাইট তিনি লইবেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য উপস্বত্বের ভাজন আমাকে করিবেন এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ফলে বিদ্যাসাগরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি তাহার সবিস্তার বৃত্তান্ত তোমাদিগে জানাইতে পারিবেন, অতএব উক্ত সময় হইতে কাপিরাইটের হিসাব করা উচিত হয়, তাহার পূর্ব্বে যে কথা ছিল না ও হয় নাই, সে কথার নূতন প্রসঙ্গ করা উচিত হয় না।"

তর্কালঙ্কারের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সালিস মহাশয়েরা আমায় জিজ্ঞাসিলেন, এক্ষণে আমরা কিরূপ করিব, বল। আমি বলিলাম, তর্কালঙ্কার যেরূপ বলিতেছেন, তাহা, আমার বিবেচনায়, কোনও মতে, সঙ্গত ও ন্যায়ানুগত নহে। কিন্তু তাহাতে আপত্তি করিতে গেলে, কার্য্য শেষ হইবার পক্ষে, অনেক বিলম্ব ঘটিবেক। যত সত্বর হয়, তর্কালঙ্কারের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব রহিত হওয়া আমার সর্ব্বতো-ভাবে প্রার্থনীয়। অতএব, আপনারা, তদীয় অভিপ্রায় অনুসারেই, সত্বর, কার্য্য শেষ করিয়া দিউন। তখন তাঁহারা বলিলেন, তবে তর্কালঙ্কার যে সময় হইতে কাপিরাইটের হিসাব করা উচিত হয় বলিতেছেন, তাহার পূর্ব্বে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, তাহার একটি ফর্দ্দ, আর তাহার পরে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহার একটি ফর্দ্দ করিয়া দাও। আমি দুইটি ফর্দ্দ করিয়া দিলাম। প্রথম ফর্দ্দে তর্কালঙ্কারের উল্লিখিত সময়ের পূর্ব্বে লিখিত পুস্তকের, দ্বিতীয় ফর্দ্দে ঐ সময়ের পরে লিখিত পুস্তকের বিবরণ রহিল। তর্কালঙ্কারের অভিপ্রায় অনুসারে, প্রথম ফর্দ্দ নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলি[২] ছাপাখানার সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল; সুতরাং ঐ সমস্ত পুস্তকের উপস্বত্ব ছাপাখানার উপস্বত্বের অর্ন্তভূত হইয়া গেল। এই সমবেত উপস্বত্বে উভয়ে তুল্যাংশভাগী হইয়াছিলাম।

আমি, তর্কালঙ্কারের পত্র লইয়া, প্রথমতঃ, অনরবল জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়ের নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সবিশেষ সমস্ত তাঁহার গোচর করিলাম। তিনি তর্কালঙ্কারের পত্র পাঠ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তর্কালঙ্কার যে সময় হইতে কাপিরাইটের হিসাব করা উচিত হয় বলিতেছেন, তাঁহার শিশুশিক্ষা তাহার পূর্ব্বে অথবা পরে লিখিত। আমি বলিলাম, শিশুশিক্ষা তাহার বহুবৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, তর্কালঙ্কারের মীমাংসা অনুসারে, শিশুশিক্ষা ছাপাখানার সম্পত্তি হইয়াছে; সে বিষয়ে তদীয় উত্তরাধিকারীদের আর দাবি করিবার অধিকার নাই; আপনি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না। এইরূপে আশ্বাসিত ও অভয় প্রাপ্ত হইয়া, আমি বাবু দীননাথ বসু উকীলের নিকটে উপস্থিত হইলাম; এবং, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিয়া, তর্কালঙ্কারের পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিলাম। পত্র পাঠ করিয়া, এবং বারংবার জিজ্ঞাসা দ্বারা সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, দীননাথ বাবু, কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর আমায় বলিলেন, যোগেন্দ্রনাথ বাবু যে এরূপ চরিত্রের লোক, তাহা আমি জানিতাম না। আপনি তর্কালঙ্কারের পরিবারকে তদীয়

পুস্তকের উপস্বত্ব হিসাবে যাহা দিতেন, তাহা রহিত করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিতেছেন না, আমার নিকটে এরূপ অলীক নির্দ্দেশ করা, তাঁহার মত সুশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে, নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে; আর, আমিও, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, আপনাকে ওরূপ পত্র লিখিয়া, নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন। তৎপরে তিনি আমায় বলিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন; এজন্য আর আপনকার উদ্বিগ্ন হইবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। তর্কালঙ্কারের মীমাংসা অনুসারে, তদীয় পরিবারের শিশুশিক্ষায় আর অধিকার নাই। আমি যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে এ বিষয়ে নিরস্ত হইতে বলিব, এবং তিনি যেরূপ বলেন, তাহা আপনাকে জানাইব।

এইরূপে উভয় স্থানে অভয় প্রাপ্ত হইয়া, আমি যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে, নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে পটোলডাঙ্গার শ্যামাচরণ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইতে বলিয়া পাঠাইলাম। যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যোগেন্দ্রনাথ বাবু এবং তর্কালঙ্কারের শ্যালক শ্রীযুত বাবু রামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায়, উভয়ে উপস্থিত আছেন। তাঁহাদিগকে তর্কালঙ্কারের পত্র দেখাইলাম। পত্র পাঠ করিয়া, যোগেন্দ্রনাথ বাবু, বিষণ্ণ বদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে আমায় বলিলেন, তবে আপনি দয়া করিয়া যেরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, সেই রূপই দেন। আমি বলিলাম, তুমি কুন্দমালার নাম করিয়া প্রার্থনা করাতে, আমি, দ্বিরুক্তি না করিয়া, পুস্তক তিনখানি দিতে সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু তৎপরে তোমরা যে ফেসাৎ উপস্থিত করিয়াছ, তাহাতে আর আমার দয়া করিবার ইচ্ছাও নাই, আবশ্যকতাও নাই। তোমরা উকীলের চিঠি দিয়াছ, নালিশের ভয় দেখাইয়াছ, এবং, আমি ফাঁকি দিয়া পরের সম্পত্তি ভোগ করিতেছি বলিয়া, নানা স্থানে আমার কুৎসা করিয়াছ। আমাদের দেশের লোক নিরতিশয় পরকুৎসাপ্রিয়; তোমার মুখে আমার কুৎসা শুনিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন; এবং তত্ত্বানুসন্ধানে বিমুখ হইয়া, আমার কুৎসাকীর্ত্তন করিয়া, বিলক্ষণ আমোদ করিতেছেন। এমন স্থলে, আর আমার দয়া করিতে প্রবৃত্তি হইবেক কেন? তবে কুন্দমালাকে বলিবে, আমি তাহাকে, মাস মাস, যে দশ টাকা দিতেছি, অনেকে, তোমাদের আচরণদর্শনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহা রহিত করিবার নিমিত্ত আমায় পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু কুন্দমালা নিতান্ত অনাথা; আর, আমি যত দূর বুঝিতে পারিতেছি, এ বিষয়ে তাহার কোনও অপরাধ নাই। এজন্য, আমি তাহাকে মাস মাস যে দশ টাকা দিতেছি, তাহা দিব, কদাচ তাহা রহিত করিব না। এই বলিয়া, আমি তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলাম।

ইহার কিছু দিন পরে, বাবু দীননাথ বসু উকীলের নিকট হইতে নিম্নদর্শিত পত্র পাইয়াছিলাম।

"পরমপূজনীয় শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু

প্রণাম শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ ঃ—

মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবার পরেই ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জামাতা আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকল কথা কহাতে অনেক বাদানুবাদের পর তেঁহ অত্র বিষয় সালিস দ্বারা নিষ্পত্য করা ভাল বলিয়া প্রকাশ করাতে আমি তাঁহাকে তদ্বিষয়ে ধার্য্য ও তাহাতে আপনকার কিরূপ অভিরুচি হয় তাহা জানিবার কথা কহাতে তিনি তাহার স্থির করিয়া আমাকে কহিবেন বলিয়া যান। তদবধি আমি তাহার কোন সংবাদ না পাওয়ায় অত্র বিষয়ে কোন উত্তেজনা করি নাই। আমার নিজ মঙ্গল মহাশয়ের শারীরিক কুশলসংবাদে তুষ্ট রাখিবেন। ইহা নিবেদনেতি তারিখ ২৬ জ্যৈষ্ঠ।

সেবক শ্রী দীননাথ দাস বসু

মোঃ বাগবাজার।"

যোগেন্দ্রনাথ বাবু সালিস দ্বারা নিষ্পত্তির কথা আমার নিকটে উপস্থিত করেন নাই। বোধ হয়, তর্কালঙ্কারের পত্র দেখিয়া, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ বিষয়ে নালিস অথবা সালিস দ্বারা নিষ্পত্তির

চেষ্টা করিলে, ইষ্ট সিদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নাই; এই জন্যই, হতোৎসাহ হইয়া, আমার নিকটে সালিস দ্বারা নিষ্পত্তির প্রস্তাব উপস্থিত না করিয়া, "তবে আপনি দয়া করিয়া যেরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপই দেন", এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহার পর, যোগেন্দ্রনাথ বাবু, অথবা তর্কালঙ্কার পরিবারের অন্য কোনও হিতৈষী আত্মীয়, আমার নিকটে, আর কখনও, কোনও আকারে, শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত কোনও কথার উত্থাপন করেন নাই।

যোগেন্দ্রনাথ বাবু, শ্বশুরপরিবারের হিতসাধনবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, আমার পক্ষে যাদৃশ ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দর্শিত হইল। তিনি, শ্বশুরের গৌরব বর্দ্ধনবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, আমার পক্ষে যাদৃশ ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শনার্থ, বেতালপঞ্চবিংশতির দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হইতেছে।

"১৯০৩ সংবতে, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রথম প্রচারিত হয়। ২৫ বৎসর অতীত হইলে, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা, শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. তদীয় জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে —

"বিদ্যাসাগব প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচবের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।"

যোগেন্দ্রনাথ বাবু, কি প্রমাণ অবলম্বন পূর্ব্বক, এরূপ অপ্রকৃত কথা লিখিয়া প্রচারিত করিলেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি, বেতালপঞ্চবিংশতি মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলাম। শুনাইবার অভিপ্রায় এই যে, কোনও স্থল অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হইলে, তাঁহারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন; তদনুসারে, আমি সেই সেই স্থল সংশোধিত করিব। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, কোনও কোনও উপাখ্যানে, একটি স্থলও তাঁহাদের অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হয় নাই; সুতরাং সেই সেই উপাখ্যানের কোনও স্থলেই কোনও প্রকার পরিবর্ত্ত করিবার আবশ্যকতা ঘটে নাই। আর, যে সকল উপাখানে তাঁহারা তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই উপাখ্যানে, স্থানে স্থানে, দুই একটি শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন ও তর্কালঙ্কার ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই। সুতরাং, বেতালপঞ্চবিংশতি তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে ইহা উভয় বন্ধুর রচনা বলিলেও বলা যাইতে পারে, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর এই নির্দ্দেশ কোনও মতে সঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয় নাই। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। তিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজে সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক। এ বিষয়ে, তিনি আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে যে পত্র লিখিয়াছেন, ঐ উত্তরপত্র, আমার জিজ্ঞাসাপত্রের সহিত, নিম্নে নিবেশিত হইতেছে।

"অশেষগুণাশ্রয়

শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভ্রাতৃ প্রেমাস্পদেষু

সাদরসম্ভাষণমাবেনম্

তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিছু দিন হইল, সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" বেতালপঞ্চবিংশতি সম্প্রতি পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। যোগেন্দ্রনাথ

বাবুর উক্তি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ব্যক্ত করিব, স্থির করিয়াছি। বেতালপঞ্চবিংশতির সংশোধন বিষয়ে তর্কালঙ্কারের কত দূর সংস্রব ও সাহায্য ছিল, তাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহা জান, লিপি দ্বারা আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। তোমার পত্রখানি, আমার বক্তব্যের সহিত, প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় আছে, জানিবে ইতি।

ত্বদেবশর্ম্মশর্ম্মণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

১০ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল।

কলিকাতা।

"পরমশ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপ্রতিমেষু

শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. প্রণীত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত; আমার বিবেচনায়, এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্রনাথ বাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত এই — আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে, আমার অথবা তর্কালঙ্কারের, এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্র খানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি।

কলিকাতা সোদরাভিমানিনঃ

১২ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল। শ্রী গিরিশচন্দ্রশর্ম্মণঃ"

যোগেন্দ্রনাথ বাবু স্বীয় শ্বশুরের জীবনচরিত পুস্তকে, আমার সংক্রান্ত যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এইরূপ অমূলক। দৃষ্টান্তস্বরূপ আর একটি স্থল প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —

"সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইল। এরূপ শুনিতে পাই, বেথুন তর্কালঙ্কারকে এই পদ গ্রহণে অনুরোধ করেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ঐ পদের যোগ্য বলিয়া বেথুনের নিকট আবেদন করায়, বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তর্কালঙ্কারের ন্যায় সদাশয় উদারচরিত ও বন্ধুহিতৈষী ব্যক্তি অতি কম ছিলেন। হৃদয়ের বন্ধুকে আপন অপেক্ষা উচ্চতর পদে অভিষিক্ত করিয়া তর্কালঙ্কার বন্ধুত্বের ও ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।"

গ্রন্থকর্তার অলৌকিক কল্পনাশক্তি ব্যতীত এ গল্পটির কিছুমাত্র মূল নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ মাত্র, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েন; ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের নবেম্বর মাসে, মুরশিদাবাদের জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রস্থান করেন। তর্কালঙ্কারের নিয়োগ সময়েও, যিনি (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তর্কালঙ্কারের প্রস্থান সময়েও, তিনিই (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফলতঃ, তর্কালঙ্কার যতদিন সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় মধ্যে, এক দিনের জন্যেও, ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয় নাই। সুতরাং, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়াতে বেথুন সাহেব মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, তর্কালঙ্কার, ঔদার্য্যগুণের আতিশয্য বশতঃ, আমাবে ঐ পদের যোগ্য বিবেচনা করিয়া, ও বন্ধুস্নেহের বশীভূত হইয়া, বেথুন সাহেবকে আমার জন্য অনুরোধ করাতে, আমি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে, তাহা মহামতি যোগেন্দ্রনাথ বাবুই বলিতে পারেন।

আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কালেজেব অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই — মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষাসমাজের তৎকালীন সেক্রেটারি, শ্রীযুক্ত ডাক্তার মোয়েট সাহেব, আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।[৩] আমি, নানা কারণ দর্শাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি বলিয়াছিলাম, যদি শিক্ষাসমাজ আমাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি। তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লেখাইয়া লয়েন। তৎপরে, ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছু দিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা পদ পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অবস্থা ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কালেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া, শিক্ষাসমাজ আমাকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা কার্য্য, সেক্রেটারি ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি, এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল; ঐ দুই পদ রহিত হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্ট হইল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে, আমি সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।

যোগেন্দ্রনাথ বাবুর কল্পিত গল্পটির মধ্যে, "এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়," এই কথাটি লিখিত আছে। যাঁহারা বহু কাল অবধি, সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত আছেন, অথবা যাঁহারা কোনও রূপে সংস্কৃত কালেজের সহিত কোনও সংস্রব রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও এরূপ জনশ্রুতি কর্ণগোচর করেন নাই। যাহা হউক, যদিই দৈবাৎ ঐরূপ অসম্ভব জনশ্রুতি, কোনও সূত্রে, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর হইয়াছিল, ঐ জনশ্রুতি অমূলক অথবা সমূলক, ইহার পরীক্ষা করা তাঁহার আবশ্যক বোধ হয় নাই। আবশ্যক বোধ হইলে, অনায়াসে তাঁহার সংশয়চ্ছেদন হইতে পারিত; কারণ, আমার নিয়োগবৃত্তান্ত সংস্কৃত কালেজ সংক্রান্ত তৎকালীন ব্যক্তি মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। যোগেন্দ্রনাথ বাবু সংস্কৃত কালেজের ছাত্র; যে সময়ে তিনি আমার নিয়োগের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, বোধ হয়, তখনও তিনি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। যদি, সবিশেষ জানিয়া, যথার্থ ঘটনার নির্দ্দেশ করা তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, আমার নিয়োগ সংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকিত না।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন।[৪] আমি বিশিষ্ট হেতু বশতঃ, অধ্যাপকের

পদগ্রহণে অসম্মত হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করি।[৫] তদনুসারে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। এই প্রকৃত বৃত্তান্তটির সহিত, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর কল্পিত গল্পটির, বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে।

আমি তর্কালঙ্কারের সংস্রবত্যাগে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলে, তিনি পটোলডাঙ্গার শ্যামাচরণ বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়ৎ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে। এই উদ্ধৃত অংশ দৃষ্টিগোচর করিলে, আমি ও তর্কালঙ্কার, এ উভয়ের চাকরী বিষয়ে পরস্পর কিরূপ সম্পর্ক, তাহা অনায়াসে যোগেন্দ্রনাথ বাবুর হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবেক।

"ভ্রাতঃ! ক্রমশঃ পদোন্নতি ও এই ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী পদ প্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলি বিদ্যাসাগরের সহায়তা বলে হইয়াছে, অতএব তিনি যদি আমার প্রতি এত বিরূপ ও বিরক্ত হইলেন তবে আর আমার এই চাকরি করায় কাজ নাই, আমার এখনি ইস্তফা দিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হয়। শ্যাম হে! কি বলিব ও কি লিখিব, আমি এই সবডিভিজনে আসিয়া অবধি যেন মহাসাপরাধীর ন্যায় নিতান্ত ম্লান ও স্ফূর্ত্তিহীনচিত্তে কর্ম্মকাজ করিতেছি, অথবা আমার অসুখের ও মনোগ্লানির পরিচয় আর কি মাথা মুণ্ড জানাইব, আমার বাল্যসহচর, এক হৃদয়, অমায়িক, সহোদরাধিক, পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ৬ ছয় মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই, আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি। শ্যাম! তুমি আমার সকল জান, এই জন্যে তোমার নিকট এত দুঃখের পরিচয় পাড়িলাম।"

পাদটীকা ঃ

১. এই সময়ে তাঁহার আকার দেখিলে, তিনি অধিক দিন বাঁচিবেন, কিছুতেই এরূপ বোধ হইত না। কিন্তু কাশীতে গিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়, এবং চক্ষুর দোষ এককালে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ তাঁহার আকারের এত পরিবর্ত্ত হইয়াছিল যে, এক বৎসর পরে, কাশীতে গিয়া, আমি তাঁহাকে কোনও মতে চিনিতে পারি নাই। তিনি, তাহা বুঝিতে পারিয়া, আমায় বলিলেন, বাবা! তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না, আমি মদনের মা। এই কথা শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম, এবং বলিলাম, আপনি জুয়াচুরি করিয়া আমাকে বিলক্ষণ ঠকাইয়াছেন। তিনি, কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া, আমায় বলিলেন, বাবা! আমি কি জুয়াচুরি করিয়াছি। আমি বলিলাম, শুকনা হাড় ও কাণা চোখ দেখাইয়া আপনি বলিয়াছিলেন, আমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি অধিক দিন বাঁচিব না; সুতরাং, অধিক দিন, তোমার আমার ভার বহন করিতে হইবেক না। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে অন্ততঃ আর বিশ বৎসর আপনি বাঁচিবেন। তখন ইহা বুঝিতে পারিলে, আমি আপনাকে মাস মাস দশ টাকা দিতে সম্মত হইতাম না। এই কথা শুনিয়া, তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন। আঠার বৎসর হইল, তাঁহার সহিত এই কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন। এ দেশে থাকিলে, তিনি এত দিন জীবিত থাকিতেন, কোনও ক্রমে এরূপ প্রতীতি হয় না।

২. তর্কালঙ্কারের লিখিত শিশুশিক্ষা তিনভাগ; আমার লিখিত বেতালপঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ তিনভাগ।

৩. এই সময়ে, আমি ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে হেড রাইটার নিযুক্ত ছিলাম।

৪. এই সময়ে, আমি সংস্কৃত কালেজে আসিষ্টান্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলাম।

৫. এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কালেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

স্ত্রী শিক্ষা

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

['সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' (আশ্বিন, শকাব্দ ঃ ১৭৭২)]

এক বৎসরের অধিককাল গত হইল কন্যাসন্তানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই মহানগরীতে এবং বারাসতে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে শিক্ষা স্থান সংস্থাপিত হইয়াছে। এই শ্রেয়স্কর বিষয় সর্ব্বত্র প্রচারিত করিবার নিমিত্ত কএক জন মহাত্মা প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আপন আপন কন্যাসন্তানদিগকে তত্তৎ পাঠস্থানে নিয়োজিত করিয়াছেন। ঐ ভদ্র মহাশয়েরা সর্ব্বদাই মনের মধ্যে এইরূপ প্রত্যাশা করেন যে স্বদেশস্থ সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব কন্যাগণের অধ্যয়ন সম্পাদনে যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয় অদ্যাপি কেহই এই শ্রেয়স্কর বিষয়ে কিছুই উদ্‌যোগ করিতেছেন না। সকলেই কুসংস্কার ও ভ্রান্তি জালে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের ভাবি উপাদেয় ফল বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না, কেবল কুসংস্কারমূলক কতকগুলিন কুতর্ক ও অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উপস্থাপিত করিয়া এই মঙ্গল ব্যাপারের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন।

তাঁহারা কহেন

প্রথম। শিক্ষা কর্ম্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক স্ত্রীজাতির তাহা নাই সুতরাং কন্যাসন্তানেরা শিখিতে পারে না।

দ্বিতীয়। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখন নাই, এবং শাস্ত্রেও প্রতিষিদ্ধ আছে; অতএব লোকাচারবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ ব্যাপার কদাচ অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে না।

তৃতীয়। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতিবিয়োগ দুঃখের ভাজন হইয়া কষ্টে জীবনযাপন করিবেক অতএব এতাদৃশ দৃষ্টদোষদূষিত বিষয় জানিয়া শুনিয়া পিতা মাতা কেমন করিয়া প্রাণসমান স্বসন্তানকে এই দারুণ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন।

চতুর্থ। স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেক, বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পিতা মাতা ভর্ত্তা প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক, এবং পরিশেষে দুশ্চরিত্রা হইয়া স্বয়ং পতিত হইবেক ও স্বকীয় পবিত্র কুলকে পাতিত করিবেক; অতএব স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত, কদাপি জ্ঞানপথের সোপানপ্রদর্শন করা উচিত নয়।

পঞ্চম। এই সমস্ত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষ উল্লঙ্ঘন করিয়াও যদ্যপি স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহাতেই বা ফল কি? ইহারা চাকরী করিতে পারিবেক না, আদালতে গতায়াত করিয়া কোন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক না, কোন সাহেব শুভার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারিবেক না, এবং হাট বাজারে বসিয়া বা কোন দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারিবেক না; কুলের কামিনী অন্তঃপুরে বাস করে তাহার বিদ্যাশিক্ষায় কিছুই ইষ্টাপত্তি নাই, প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আমরা শাস্ত্র, ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে তাঁহাদিগের এই সমস্ত আপত্তির প্রত্যেকের সমর্থ উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদিগের প্রদত্ত উত্তর যদি অশাস্ত্রীয়, অন্যায্য, অযৌক্তিক ও পক্ষপাতমূলক বলিয়া পক্ষপাতবিহীন দূরদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বোধ করেন, তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি স্ত্রীশিক্ষার বিষয় আর কদাপি মুখেও আনিব না। আর যদি আমাদিগের উত্তর যথার্থ হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা

করেন, তবে অবিলম্বেই এই মহোপকারক বিষয়ের অনুষ্ঠানে দেশীয় ভদ্রলোকেরা প্রবৃত্ত হউন নতুবা আর যেন তাঁহারা আপনাদিগকে লোকসমাজে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় না দেন।

প্রথম আপত্তির প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা আপত্তিকারক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, স্ত্রীজাতি যে বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ নয় এরূপ সংস্কার তাঁহারা কি মূল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? আর কোথায় বা এমত দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করিয়াছেন, যে স্ত্রীজাতিরা যথা নিয়মে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, শিক্ষা উপকরণ সমুদায় উপস্থিত ছিল, বিচক্ষণ উপদেশক যথানিয়মে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই, স্ত্রীগণেরা সকলেই মূর্খ হইয়াছিল। বোধ করি আপত্তিকারক মহাশয়েরা এই প্রশ্নের কিছুই উত্তর দিতে পারিবেন না, এবং কোথাও এতাদৃশ উদাহরণ দেখাইতে পারিবেন না। অতএব তাঁহাদিগের এই আপত্তি কেবল অমূলক কল্পনা দ্বারা উদ্ভাবিত মাত্র। ভাল তাঁহারা একবার পক্ষপাতশূন্য চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন না কেন, স্ত্রীজাতিরা কেনই বা শিখিতে পারিবেক না। তাহারা কি মানুষ নয়? সচেতন জীবমধ্যে পরিগণিত নয়। তাহাতে কি বুদ্ধিবৃত্তি নাই? মেধা নাই? তর্কশক্তি নাই? সদৃশানুভূতি নাই? কেন! আমরা ত ভূয়োভূয় দর্শন করিতেছি শিক্ষাকার্য্যের উপযোগিনী যে যে শক্তিমত্তার আবশ্যক, স্ত্রীজাতির সে সমুদায়ই আছে কোন অংশের ন্যূনতা নাই; বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে, বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক? বরং কেহ কেহ বোধ করেন শৈশবকালে বালক অপেক্ষা বালিকারা স্বভাবতঃ ধীর ও মৃদু হয়, এ নিমিত্ত অধিকও শিক্ষা করিতে পারে। এ বিষয় আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এক স্থানে এক অপাদান হইতে এককালে বিদ্যারম্ভ করিয়া বালক অপেক্ষা বালিকারা অধিক শিক্ষা করিয়াছে। আপত্তিকারক মহাশয়েরা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখুন কত শত বিদেশীয় নারীগণ বিদ্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ত্রীজাতির শিক্ষাশক্তিমত্তার দেদীপ্যমান প্রমাণ পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অতএব আমরা ভরসা করি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা স্ত্রীজাতির শিক্ষা করণে শক্তি নাই বলিয়া আর অমূলক অকিঞ্চিৎকর বৃথা আপত্তি উত্থাপিত করিবেন না।

স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভ্যাস, ব্যবহার ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত করেন ইহা কেবল অবহুজ্ঞতা ও অদূরদর্শিত্ব নিবন্ধন, সন্দেহ নাই। কারণ আমরা অতি প্রাচীনকালের ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় কামিনীগণেরা নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন। মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী গুরুসন্নিধানে পাঠানুশীলনের প্রত্যূহ দর্শন করিয়া জনস্থানস্থিত ভগবান্ অগস্ত্য-ঋষির পুণ্যাশ্রমে পাঠার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মবিদ্বান্ যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করিতেন। বিদর্ভ রাজনন্দিনী গুণবতী রুক্মিণী শিশুপালের সহিত পাণিগ্রহণরূপ অনিষ্ঠাপাত দর্শন করিয়া স্বহস্তে সাঙ্কেতিক পত্র লিখিয়া দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। উদয়নাচার্য্যের নন্দিনী সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শিনী লীলাবতী শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় প্রস্তাবে স্বভর্ত্তা মণ্ডনমিশ্রের সহিত আচার্য্যের বিচারকালে মধ্যস্থতাবলম্বন ও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বোধ করি সকলেই জ্ঞাত আছেন, কর্ণাট-রাজমহিষী ও মহাকবি কালিদাসপত্নী এবং ভাবটদুহিতা অতিশয় পণ্ডিতা ছিলেন। আর বিশ্ব দেবী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরন্তনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে এমত পণ্ডিতা হইয়াছিলেন যে তাঁহার নিবন্ধ বচন সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রমাণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি আপত্তিকারক মহাশয়েরাও ঐ খনার অনেক বচন অবগত আছেন এবং তদনুসারে বিবাহাদি শুভকর্ম্মের দিন ও লগ্ন নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কিছু কাল হইল

হটী বিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমণী বারাণসীক্ষেত্রে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া ভূরি ভূরি ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া আরো কতকগুলি পণ্ডিতা, বনিতার নাম উল্লেখ করিতে পারি কেবল পাঠকবর্গেরা বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া বিরত হইলাম।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক মাত্রেরই বিদ্যানুশীলনের প্রথা প্রচলিত ছিল। যাঁহারা বিদ্যা দ্বারা খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া লোকসমাজে অত্যন্ত প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন তাঁহাদিগেরি নাম ঐতিহ্যক্রমে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। ইহাও অসম্ভাবনীয় নহে, যে অস্মদ্দেশে উত্তম ইতিহাসগ্রন্থ না থাকাতে, হয় ত অনেকানেক প্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীদিগেরও নাম কালক্রমে লোপ পাইয়া থাকিবেক। এস্থলে আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপে যে কএকজন প্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীর নাম উল্লেখ করিলাম এতদ্ব্যতিরিক্ত যে আর কোন স্ত্রীলোকই বিদ্যানুশীলন করিত না এমত কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। কারণ পুরুষ জাতির মধ্যে পুরাতন পণ্ডিতবর্গের নাম উল্লেখ করিতে হইলে আমরা ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসাদি কএক জন গ্রন্থকার ভিন্ন আর কাহারো নাম করিতে পারি না; ইহা বলিয়া কি এই স্থির করিতে হইবেক যে পূর্ব্বকালে সর্ব্বসাধারণ পুরুষেরা বিদ্যানুশীলন করিত না। ফলতঃ এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত কতিপয় পণ্ডিত পুরুষের নাম শ্রবণে যেমন প্রাচীনকালীন পুরুষসাধারণের বিদ্যাভ্যাস প্রথা স্থির হইতেছে, সেইরূপ পূর্ব্বকালের কতকগুলি বিদ্যাবতী কামিনীর নামপ্রাপ্তি দ্বারা স্ত্রীলোক সাধারণেরও তৎকালে বিদ্যানুশীলনের ব্যবহার অব্যাহতরূপে প্রচলিত ছিল স্থির করিতে হইবেক সন্দেহ নাই।

কিছু কাল হইল এ দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের প্রথা কিঞ্চিৎ স্থগিত হইয়াছে তাদৃশ প্রচরদ্রূপ নাই, ইহা আমরাও অস্বীকার করি না। ইহার কারণ কি? অন্বেষণ করিলে অতি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবেক। এই দেশ যখন দুরন্ত যবনজাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তৎকালে ঐ দুর্ব্বৃত্ত জাতির দৌরাত্ম্যে আমাদিগের সুখ সম্পত্তির একেবারেই লোপাপত্তি হইয়াছিল। কেহ ইচ্ছানুসারে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিত না। অগ্নিষ্টোম দর্শ, পৌর্ণমাস প্রভৃতি যাগব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। বসন্তোৎসব, কৌমুদী মহোৎসব প্রভৃতি উৎসব সকল একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেল। দুশ্চরিত্র যবনজাতির ভয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন ও বিদ্যানুশীলন সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইয়া গেল। সকলেই আপন আপন জাতি প্রাণ কুলশীল লইয়া শশব্যস্ত, স্ত্রীজাতিকে বিদ্যা দান করিবেক কি পুরুষদিগেরও শাস্ত্রালোচনা মাথায় উঠিল। তদবধি স্ত্রীদিগের অন্তঃপুরনিবাস ও বিদ্যাভ্যাস নিরাস হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদিগের আর সে দুরবস্থা নাই, অত্যাচারী রাজা নাই। শুভদিন পাইয়া সকল শুভকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতেছি। আমাদিগের লুপ্তপ্রায় অন্যান্য সদ্ব্যবহার সকল পুনরুদ্ধার করিতেছি। অতএব এমত সুখের সময়ে সংসার সুখের নিদানভূত আপন আপন পুত্র কলত্র কন্যাদিগকে কি বিদ্যারসের আস্বাদে বঞ্চিত রাখা উচিত? আমরা, যেমন হউক সাধ্যানুসারে আপন আপন পুত্রসন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছি। কন্যাদিগের কি অপরাধ যে তাহাদিগকে অজ্ঞানগ্রস্ত করিয়া চিরকাল দুরবস্থায় নিক্ষিপ্ত রাখিব।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়। আমরা পুরাণ ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র উদঘাটন করিয়া সকলের সমক্ষে দেখাইতে পারি "স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা করিতে নাই" এমত প্রমাণ কেহ একটাও দেখাইতে পারিবেন না, বরং পুত্রের মত কন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিধানই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন। যদি এই কর্ম্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইত তবে প্রাচীন মহাজনেরা কদাপি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতেন না।

আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে প্রাচীনব্যবহার ও শাস্ত্রবিধান দর্শাইলাম, এইক্ষণে আপত্তিকারক মহাশয়েরা অপক্ষপাতচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সমুচিত উত্তর হইল কি না?

বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ বিধবা হয়, এই আপত্তি শুনিয়া হাস্য করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সমুচিত উত্তরপ্রদান। কারণ বিদ্যাভ্যাসের সহিত বৈধব্য ঘটনার কিরূপে কার্য্যকারণ ভাব ঘটিতে পারে। পতির

মৃত্যু হইলে নারী বিধবা হয়, এই পতিমরণরূপ দুর্ঘটনা যদি স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাসরূপ কারণবশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে একজনের মাদক দ্রব্য সেবনে অন্য জনের মত্ততা অন্য জনের চক্ষুর্লৌহিত্য অপর ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রম ও তদিতরের বাক্যস্খলন সর্ব্বদাই সম্ভবিতে পারে। ফলতঃ বিদ্যার এমত মারাত্মক শক্তিও এ পর্য্যন্ত কেহই অনুভব করেন নাই। অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন করিতেছেন ও করিবেন, কেহই আপন পরিবারের সংহারক হন নাই এবং হইবেনও না। আর বিদ্যাভ্যাস করিলে নারী দৌর্ভাগ্য দুঃখভাগিনী হয়, ইহা আরও হাসিবার কথা। কারণ যাঁহারা বিদ্যাধনের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারাই এই সংসারে যথার্থ সৌভাগ্যশালী ও যথার্থ ধনবান্, তদ্ভিন্নেরা কেবল এই বিশ্বম্ভরার ভারস্বরূপ, জীবন্মৃত, একান্ত হতভাগ্য, ও নিতান্ত দরিদ্র। বিদ্যারূপ ধনশালী ব্যক্তিরা আপনার অবিনশ্বর নির্ম্মল সনাতন বিদ্যার প্রভাবে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় দুঃখাসম্ভিন্ন সুখাস্বাদ করিতেছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। ইতর ধনবানের সেরূপ সুখ ভোগ হওয়া সুদূরে পরাহত মনেরও বিষয় নয়। অতএব স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে বিধবা অথবা সৌভাগ্যবতী হইবে এই কথার উত্তর না দেওয়াই সমুচিত উত্তর।

যাহারা কহেন বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ মুখর দুশ্চরিত্র ও অহঙ্কারী হইবে তাহাদিগকে উত্তর প্রদান সময়ে কিছু হিত উপদেশ দান করা বিহিত বোধ হইতেছে। বিদ্যাভ্যাসের ফলে মনুষ্যজাতি বিনয়ী সচ্চরিত্র ও শান্ত-স্বভাব না হইয়া তদ্বিপরীত হইয়াছে ইহা যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনি আকাশপথে মনোহর উদ্যান মধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে উত্তানপাদ হইয়া গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য নাট্যক্রিয়াদি করিতেছে, ইহাও অহরহ দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, বিদ্যাবান্ মনুষ্যেরা যে দেশে বসতি করেন কিম্বা যে সমাজে উপবিষ্ট হইয়া স্বৈর আলাপ করেন, এই অসম্ভব আপত্তিকারকেরা সেই সেই দেশ ও তত্তৎসমাজের ত্রিসীমা দিয়াও কখন গতায়াত করেন নাই। বিদ্যাবান্ মনুষ্যের চরিত দর্শন করা দূরে থাকুক কখন শ্রবণও করেন নাই। বিদ্বজ্জনের মস্তক বিনয়ালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সর্ব্বদাই বিনম্র রহিয়াছে, ফলবত্তরুবর শিখরদেশে ফলের ভারে নিত্যই অবনত আছে। বিদ্যারসাস্বাদকের মুখে হিত-মিত ও মধুর বচন ভিন্ন কি কখন কর্কশ অপ্রিয় ও গর্হিত বাক্য নির্গত হইতে পারে? চন্দন কাষ্ঠ শত খণ্ড হইলেও কি তাহার অবয়বে মনোহর গন্ধ ভিন্ন দুর্গন্ধ নির্গীর্ণ হইতে পারে? আত্ম অপেক্ষায় স্বজাতীয় স্বদেশীয় লোকের অপকর্ষ এবং আপনার উৎকর্ষবোধ উদয় হওয়াতে মনুষ্যের মনে অহঙ্কার সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তির মনে এতাদৃশ ভাবের উদয় কদাপি হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই মনে মনে আপনাকে অকিঞ্চন ও অপর্য্যাপ্ত ও অকিঞ্চিৎজ্ঞানসম্পন্ন ভাবিয়া থাকেন। জ্ঞানরূপ মহাশৈলে যিনি যে পরিমাণে আরোহণ করেন তাঁহার নিকট ঐ মহাশৈল ততই উন্নত ও দুরারোহরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং আরূঢ় ব্যক্তির মনে মনে আপনাকে ততই তুচ্ছ বোধ হয়। মহার্ণব যে কিমাকার ও কি প্রকার বিস্তার তাহা সংযাত্রিকেরাই বিলক্ষণ অনুভূত আছেন, ইতর ব্যক্তির তাহা বুদ্ধিরও গোচর নয়। এই নিমিত্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মনের মধ্যে অহঙ্কার করিবেন কি আপনাদিগকে মৃত্তিকাবৎ তুচ্ছ পদার্থ বোধ করেন। সর্ব্বতত্ত্বদর্শী মহা পণ্ডিত সর্ আইজাক নিউটন মহাশয় অতিশয় বিনীত-বচনে কহিয়াছেন "আমি যে কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন ও পদার্থ গবেষণা করিলাম, ইহা কেবল বালকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপল সকল সঙ্কলন করিলাম মাত্র, জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সুশীলা বিনয়বতী ও লজ্জাবতী ইহাদের ত কথাই নাই। বিদ্যাভ্যাস করিলে নিতান্ত উদ্ধত অবিনীত ও চঞ্চল ব্যক্তিরাও একান্ত বিনীত শান্ত ও সুধীর হইবে সন্দেহ নাই। যাজ্রা করিলে যেমন মান নষ্ট হয়, জরার উদয়ে যেমন শরীরের লাবণ্য ভ্রষ্ট হয়, সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার ধ্বস্ত হয়, জ্ঞানালোক সঞ্চার হইলে সেইরূপ দুশ্চরিত্র দোষ নিরস্ত হয়। দুর্ব্বিনয় দোষ ও অধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ মহারোগের শান্তি নিমিত্ত বিদ্যাই একমাত্র মহৌষধ। হিতাহিত কার্য্যাকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশের নিমিত্ত

বিদ্যাই মহাগুরু স্বরূপ। শ্রদ্ধা শান্তি ও ধর্ম্মপথের পান্থগণের পথপ্রদর্শন নিমিত্ত একমাত্র সার্থ হইয়াছেন। অতএব বিদ্যালোকসম্পন্ন কি পুরুষ কি স্ত্রী কেহই দুশ্চরিত্র ও অধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারেন না, তাহা হইলে বিদ্যার মহিমা এতাদৃশ গুরুতররূপে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই অঙ্গীকার করিতেন না। সুতরাং বিদ্যাভ্যাস করিলে স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্র অহঙ্কৃত ও মুখর হইবে এ কথা কথাই নয়।

স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে কি ফল হইবে, এই পঞ্চম আপত্তিই প্রতিপক্ষগণের প্রধান আপত্তি বোধ হইতেছে। কারণ তাঁহাদিগের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যাবতীয় আপত্তি, বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা ও অনুৎসাহ সকলি এতন্মূলক উত্থিত হইয়াছে, এবং এরূপ হওয়াও নিতান্ত বিস্ময়াবহ নহে, যেহেতু প্রারিপ্সিত বিষয়ে প্রয়োজনাভাব দর্শন হইলে কাজে কাজেই তদ্বিষয়ে অরুচি, অনুৎসাহ ও পরাঙ্মুখতা জন্মিতে পারে। অতএব আমরা এই আপত্তির সবিস্তর উত্তর এবং স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাভ্যাস করাইলে যে যে মহোপকার দর্শিবে তাহা সপ্রমাণ উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের দেশস্থ লোকরা প্রায় সকলেই মনে করিয়া থাকেন, কতগুলি ধনোপার্জ্জন করা, সময়ে সময়ে সভা ও সমাজস্থলীতে অনর্গল বক্তৃতা করা, এবং রাজপুরুষগণের সন্নিধানে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, এই সকলই বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য ফল। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহারা নিতান্তই অদূরদর্শী ও অত্যন্ত ভ্রান্ত। বিদ্যা যে কি অদ্ভুত পদার্থ, এবং তাহার ফল যে কি উপাদেয় ও কত মহৎ তাহা কিছুই জানেন না। জানিলে কখনই এই সকল তুচ্ছ বিষয়কে বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া স্থান করিতেন না। যথার্থ বিদ্যা হইলে এই মনুষ্য আর এক প্রকার মনুষ্য হয়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সকল নৈসর্গিক দোষসমূহনির্ম্মুক্ত হইয়া কেবল গুণগ্রামে গুম্ফিত হয়। তাঁহার অন্তঃকরণে এমত কোন অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রস্ফুরিত হইতে থাকে যদ্দ্বারা সমস্ত অজ্ঞানতমোরাশি বিনাশিত হইয়া যায় এবং বিশ্বের সমুদায় তত্ত্ব তাঁহার নিকট স্ফুটরূপে অবভাসিত হইতে থাকে। দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া কেবল যথার্থ পথে পর্য্যটন ও তত্ত্বের অনুশীলনের প্রবৃত্ত হয়। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণগ্রাম তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া নিত্য অধিষ্ঠান করে। কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষা দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষবর্গ তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আশ্রয় না পাইয়া হতাশ হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে। শাঠ্য কাপট্য পৈশুন্য প্রভৃতি দস্যুগণের প্রবেশাবরোধ নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত নিত্যই বদ্ধকবাট হইয়া থাকে। তাঁহার মুখমণ্ডল এমত সৌম্য আকার ধারণ করে যে দর্শন মাত্রেই দর্শকগণের অন্তঃকরণে হর্ষ ও ভক্তির সঞ্চার হয়। তিনি দক্ষিণ হস্তে সত্য ও বাম হস্তে ন্যায় এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া অকুতোভয়ে সকল ব্যাপার সমাধান করিতে থাকেন। সংসারের সকল ব্যক্তিই তাঁহার আত্মীয়, একবারো কাহারো প্রতি অনাত্মীয় ও শত্রুভাব বুদ্ধির আবির্ভাব হয় না; সুতরাং বিবাদবিসম্বাদ কুতর্ক কলহ জিগীষা দম্ভ, তাঁহার চিন্তাপথে অবতীর্ণই হইতে পারে না। অধিক কি? এই দুঃখময় সংসার তাঁহার সন্নিধানে কেবল সুখের নিধানরূপে ভাসমান হইতে থাকে। অতএব এতাদৃশ বিদ্যাবান মহাপুরুষ কি তুচ্ছ ধনোপার্জ্জনকে পরম পুরুষার্থ বোধ করেন? লোকসমাজে বক্তৃতা করা কি তাঁহার পক্ষে শ্লাঘ্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? এবং রাজা কি রাজকীয় পুরুষ সমীপে সুখ্যাতিলাভকে তিনি গুরুতর লাভ বলিয়া বোধ করেন? বলন্টিন জামীরে ডুবাল নামক একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের চরিত অস্মদ্দেশীয় মথুরানাথ তর্কবাগীশ নাম পণ্ডিতের চরিত শ্রবণ করিলেই ইহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ডুবাল রাজপ্রসাদলাভের বিষয়ে এমত উদাসীন ছিলেন যে রাজবাটীর মধ্যে বহুকাল বাস করিয়াও রাজপরিবারের সকলকে চিনিতেন না। মথুরানাথের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপের রাজা সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে কএকবার আহ্বান করেন। নিস্পৃহ মথুরানাথ বিদ্যালোচনার ব্যাঘাতের আশঙ্কা করিয়া রাজসন্নিধানে গমনে অসম্মত হইলে রাজা স্বয়ং তাঁহার আশ্রমকুটীরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন, মথুরানাথ, যথার্থ বিদ্যাবান কিন্তু অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত।

রাজা তাঁহার সেই সাংসারিক দুরবস্থা দূর করিবার বাসনায় কিছু অর্থ প্রদান করিবার ছলে প্রশ্ন করিলেন। "আপনকার যদি কিছু অনুপপত্তি থাকে আজ্ঞা করিলে আমি তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি" মথুরানাথ শুনিয়া উত্তর করিলেন আমি চারি খণ্ড চিন্তামণি গ্রন্থের উপপত্তি করিয়াছি, আমার অনুপপত্তি কি? রাজা এই উত্তর শ্রবণে মথুরানাথকে একেবারে ধনতৃষ্ণাশূন্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অতএব যাঁহারা ধনোপার্জ্জনাদিই বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া বোধ করেন তাঁহাদিগকে অদূরদর্শী বলিতে পারা যায় কি না?

এতাদৃশ মহোপকারক ও মনুষ্যত্ব সম্পাদক বিদ্যানুশীলনে স্ত্রীজাতিকে নিযুক্ত করিলে এই সকল উপায়ে ফলের কি সমুদায় লাভ হইবেক না? যদিও সমুদায় না হয় কিয়দংশের কি লাভ হইবেক না? আর যদ্যপি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা নিতান্তই ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত লালায়িতচিত্ত হন, স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে তাঁহাদিগকে একবারেই যে নিরাশ করিবে এমত কদাপি সম্ভাবনীয় নহে। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি তাঁহারা অবশ্যই তাঁহাদের ধনোপার্জ্জনের মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাহারা অন্তঃপুরে বসিয়া নানাবিধ শিল্পকার্য্য ও কারুকর্ম্ম নির্ম্মাণ করিবে তদ্দ্বারা অনায়াসে অভিলষিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে। পুরুষেরা গৃহে বসিয়া যে সকল লেখা পড়া করেন স্ত্রীজাতিরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য দান করিতে পারিবে। গৃহস্থালী ব্যাপারের আয় ব্যয় বিষয়ক লিখন পঠন নির্ব্বাহার্থে বেতন দিয়া যে সমুদায় লোক নিযুক্ত করিতে হয় গৃহের গৃহিণী ও নন্দিনীরা অনায়াসে তৎসমুদায় সম্পাদন করিতে যে সমর্থা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং তাহারা স্বয়ং গ্রন্থাদির রচনা ও অনুবাদ করিয়া তদ্দ্বারা ভূরি ভূরি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থা হইবে। রাজদ্বারে অথবা বণিগ্‌জনের কর্ম্মালয়ে চাকরি করা বই কি অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় নাই? বোধ করি সকলেই অবগত থাকিবেন ফ্রান্সদেশীয় মেড্যাম ডি. ষ্টেল নামে এক পণ্ডিতা রমণী অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তত্তৎ বিষয়ে সেই সেই গ্রন্থ অদ্যাপি অতুৎকৃষ্টরূপে পরিগণিত আছে। তাঁহার ঐ সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইবামাত্রেই মুদ্রাকারকেরা যথেষ্ট অর্থ দানপূর্ব্বক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, এইরূপে তিনি অপর্য্যাপ্ত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। মিস্ এজওয়ার্থ নাম্নী ইংলণ্ডবাসিনী এক রমণী নানাবিধ পুস্তক রচনা করিয়া অনায়াসে অনেক ধন সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপে ইউরোপের যে সকল রমণীরা এক্ষণে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, এমত শত শত ব্যক্তির নাম আমরা উল্লেখ করিতে পারি। আর আর চিত্রকর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম ও অন্যবিধ কারুকর্ম্ম দ্বারা বিলাতের যে রমণী অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারেন এমত স্ত্রীলোকই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইউরোপের কি ধনী কি দরিদ্র সকল পরিবারের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু সন্তানগণকে প্রথমেই বিদ্যারম্ভার্থে প্রায় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন না। শিশুগণের জননী জ্যেষ্ঠভগিনী পিসী মাসী ইঁহারাই প্রথমে শিক্ষা দেন, এবং সেই অকৃত্রিম বাৎসল্য ও অনুপম স্নেহ সহকারে শিশুগণের চিত্তক্ষেত্রে যে সকল উপাদেয় উপদেশ বীজ বপন করা হয় সেই সকল বীজ অত্যল্পকাল মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া ইউরোপীয় জাতিকে এইরূপ বিদ্যাফলে ভূষিত করিতেছে যে এক্ষণে ভূমণ্ডলে বিদ্যা বিষয়ে উহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা তুল্যকক্ষ মনুষ্য আর পাওয়াই যায় না। অতএব অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে বাল্যকালে জননীর দত্ত উপদেশ ও গুরুমহাশয়ের উপদেশ এ উভয়ের কত ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। আমাদের দেশস্থ শিশুগণ পঞ্চমবর্ষ অতীত না হইলে পাঠশালায় পাঠার্থে নিযুক্ত হইতেই পারে না। আর ঐরূপ বালককে যখন গুরুর সন্নিধানে প্রথম উপস্থাপিত করা হয় তখন সে সেই অপরিচিত ভীষণাকার শিক্ষক মহাশয়কে ব্যাঘ্র অথবা মূর্ত্তিমান মৃত্যুরাজ বোধ করিয়া ভয়ে তাঁহার নিকটেই যাইতে চায় না, উপদেশ গ্রহণের ত কথাই নাই। কিন্তু সেই শিশুগণের জননী প্রভৃতিরা যদি স্বয়ং শিক্ষাদান করিতে পারিতেন তবে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করণের প্রয়োজন কি? তাহার পূর্ব্বেও

তাহারা জননীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া একবার তাঁহার সুধাসোদর পয়োধরের রসাস্বাদ ও একবার তাঁহার মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত অনুপম উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত। এবং তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহমিশ্রিত সুললিত উপন্যাস ছলে কত শত মহোপকারক বিষয়ের শিক্ষা লাভ শৈশবকালেই সম্পন্ন হইত।

আপত্তিকারক মহাশয়েরা মনোমধ্যে ভাবিয়া দেখুন, এতদ্দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাস না থাকাতে তাঁহাদের স্ত্রীপরিবারেরা কিরূপ দুরবস্থায় গৃহস্থাশ্রম যাত্রা সম্বরণ করিতেছে, এবং তাঁহারই বা স্বয়ং মূর্খ পরিবারবর্গ বেষ্টিত হইয়া কত কষ্টে কালহরণ করিতেছেন। যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় হইয়া বাস করিতে হয়, যাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতে হয়, এবং শাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি শরীরের অর্দ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়; সেই সহধর্ম্মিণী পশুর মত ঘোরতর মূর্খ, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর কষ্ট ঘটিতে পারে? গৃহের অবোধ স্ত্রীজাতিরা সর্ব্বদাই সংসারে সামান্য বিষয় লইয়া পরস্পর এমত ঘোরতর কলহ উত্থাপিত করে যে তন্নিমিত্ত তাহারাই কেবল স্বয়ং অশেষ ক্লেশ সহ্য করে এমত নহে, গৃহস্থ ব্যক্তিকেও সাতিশয় বিরক্ত করে। এবং কখন কখন সেই কন্দল অত্যন্ত অনর্থেরও হেতু হইয়া উঠে। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি এতদ্দেশে কি ধনাঢ্য কি দরিদ্র এমত পরিবারই নাই যাহার গৃহে সর্ব্বদা স্ত্রীজাতির নিরর্থক কন্দল উপস্থিত হয় না ও তজ্জন্য পরিবারের কর্ত্তাকে কষ্টভোগ করিতে হয় না। অতএব স্ত্রীজাতির এই প্রকার কুক্কুর কন্দল নিবারণের উপায় বিদ্যা শিক্ষা ভিন্ন আর কি আছে?

গৃহের স্ত্রীবর্গেরা অনেকেই এমন অবোধ যে, গৃহস্থের দুঃসময় দুরবস্থা ও অসঙ্গতির প্রতি একবারও নেত্রপাত করে না, কখন পুরোহিতের প্রতারণায় কখন বা প্রতিবেশিগণের কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া অশেষ ব্যয়ায়াসসাধ্য বৃথা ব্রতাদ্যনুষ্ঠানে সঙ্কল্পারূঢ় হয় এবং তজ্জন্য গৃহস্বামিকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে। বোধ করি ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা বিদ্যারূপ অলঙ্কার না থাকাতে সুবর্ণের অলঙ্কার ও সুচিক্কণ বসনাদিকে পরম পদার্থ বলিয়া গণ্য করে, এবং কোন প্রতিবেশিনীকে আপন অপেক্ষা উত্তম বেশ-ভূষায় ভূষিত ও সুসজ্জিত দেখিলে ঈর্ষ্যায় মনে মনে অত্যন্ত কাতর হয়, ও সেইরূপ বসনভূষণের নিমিত্ত আপন ভর্ত্তাকে প্রত্যহই বিরক্ত করিতে থাকে, তাহার অর্থ সামর্থ্য আছে কি না? একবারো বিবেচনা করে না। আমরা অবগত আছি অলঙ্কারাদি বিষয়ক ভার্য্যার নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইতে না পারিয়া অনেক ভদ্র ব্যক্তিকে অভদ্ররূপে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। যদি কোন পুরুষ অন্তঃকরণের দৃঢ়তা বশতঃ ভার্য্যার সেই নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘন করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাকে দাম্পত্যনিবন্ধনসুখে যাবজ্জীবন বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। কারণ, ভর্ত্তা বৈষয়িক সুখে নিধান স্বরূপ স্বকীয় প্রেয়সীর প্রার্থনা পরিপূরণে অসমর্থ হইয়া চিরকাল ক্ষোভে বিমনায়মান থাকেন। ভোগাভিলাষিণী পত্নীও সকল সুখের নিদানভূত প্রাণাধিক প্রিয়তমের নিকট প্রার্থনাভঙ্গ দুঃখে দুঃখিনী ও আপনাকে অভাগিনী জ্ঞান করিয়া চিরকাল অস্বচ্ছন্দচিত্তা হইয়া থাকে। সুতরাং দম্পতীর পরস্পর এইরূপ অসন্তোষ জন্মিলে আর সাংসারিক সুখের বিষয়ক কি রহিল? কিন্তু যদি ঐ অবোধ অবলাগণের শরীরে বিদ্যারূপ অলঙ্কার সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়, এবং যদি সেই বিদ্যারূপ অলঙ্কার প্রভাবে সামান্য অলঙ্কার সম্ভারকে শরীরের ভার ও অসার বলিয়া বোধ জন্মে, তাহা হইলে অস্মদ্দেশীয় জায়াপতীর ঐ অপরিহার্য্য দুঃখ কি একেবারে দূরীভূত হইবে না? এবং তাঁহারা স্বচ্ছন্দে কি প্রণয়সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন না?

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজনেরা আপন আপন গৃহকর্ম্ম সমাধা করিয়া মধ্যে মধ্যে অনেক অবকাশ পাইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকাতে ঐ অবকাশকাল ভদ্ররূপে অতিবাহিত করিতে পারে না। তখন কার্য্যান্তরে, অব্যাসক্ত অন্তঃকরণে নানা দুর্ম্মতি ও দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়। পঞ্জরবদ্ধ পক্ষির ন্যায় পর্য্যাকুলচিত্তে একবার দ্বারের কবাট উদঘাটন করিয়া রাজপথ অবলোকন করিতে থাকে, একবার গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পরপুরুষদিদৃক্ষায় ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে, একবার বা স্বৈর সখীর সঙ্গে হাস পরিহাস ও অসদ্বিষয়ক আলাপপ্রসঙ্গে নানা অসাধু কল্পনার উদ্ভাবন করিতে থাকে। কোন প্রকারেই অস্থির চিত্তকে

সুস্থির করিতে পারে না। এই প্রকারে অনেক রমণীর ব্যভিচার দোষ স্পর্শও হইয়া থাকে। এরূপ দুর্ঘটনা হওয়াও নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে। যেহেতু পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, কার্য্যান্তরে অবিনিয়োজিত সময় অতিশয় ভয়াবহ হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিত, এবং সেই শাস্ত্রানুশীলন রস আস্বাদন করিয়া সুখে কালযাপন করিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে কদাপি অন্তঃকরণে দুর্ম্মতি বা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইত না, এবং দুর্ব্বশ দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণ কখনই তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল চরিত্রকে সকলঙ্ক ও অপবিত্র করিতে পারিত না।

হায়! আমাদিগের সেই সৌভাগ্য ও সুখের দিন কবে সমাগত হইবে। এবং কবেই বা অস্মদ্দেশীয় হতভাগ্য নারীগণের সেই সৌভাগ্যসূচক শুভগ্রহের উদয় হইবেক। যখন আমরা দেখিতে পাইব, আমাদিগের স্ত্রীপরিবারেরা বৃথা কন্দল কলহ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্ক দ্বারা সুখে কালহরণ করিতেছে। সাবিত্রী পঞ্চমী অনন্ত পিপীতকী প্রভৃতি ব্রতোপবাসানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও তন্নামকীর্ত্তনেও বিলজ্জিত হইয়া ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে পারায়ণব্রতে দীক্ষিতা হইতেছে। স্বামিসন্নিধানে তুচ্ছ বসন ভূষণাদি প্রার্থনার কথা পরিহরণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ কাব্যালঙ্কার বিষয়ক প্রসঙ্গে স্বয়ং সুখিত ও প্রিয়তমকে সুখায়িত করিতেছে। কেহ বা করকমলে বিচিত্র তুলিকা ধারণ করিয়া চিত্রপটে বিবিধ জগতী পদার্থের চিত্র বিন্যাস করিতেছে। কেহ বা সূচী ও তন্তুসন্তান হস্তে লইয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কেহ বা পুত্র কন্যা প্রভৃতি শিশুসন্তানগণকে সন্নিধানে উপবেশিত করিয়া তাহাদিগের কোমল মানস ক্ষেত্রে নির্ম্মল উপদেশ বীজ সকল বপন করিতেছে। কেহ বা নানা দেশীয় ইতিহাস সন্দর্ভ সন্দর্শনপূর্ব্বক সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিয়া তদ্গতমনে নবীন ললিত সন্দর্ভ সঙ্কলিত করিতেছে। কেহ বা দৃষ্টি পথের পুরোভাগে বিচিত্র ভূচিত্র সকল সংস্থাপিত করিয়া ভূগোলের তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে। কেহ বা নিশাভাগে অনাবৃত উন্নত প্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল নভোমণ্ডলে দূরবীক্ষণ বিনিবেশিত করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির পরস্পরের অন্তর ও সঞ্চারাদি গবেষণা করিতেছে। তখন আমাদিগের কি সুখের অবস্থা উপস্থিত হইবে, এবং কত সুখেই বা এই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

হে করুণাময় জগদীশ্বর! আমাদিগের দেশীয় লোকের অন্তঃকরণ হইতে কুসংস্কার ও কুমতি দূর করিয়া সুমতি প্রদান করুন যাহাতে সকলেই একমনা, এককর্ম্মা ও এক উদ্‌যোগ হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায়ে আরোহণপূর্ব্বক আপন আপন নন্দিনী ও গৃহিণী প্রভৃতি স্ত্রীপরিবারকে বিদ্যাভ্যাস কার্য্যে নিয়োজিত করেন।

আমাদিগের বোধ হইতেছে এ দেশের হতভাগা সীমন্তিনীগণের দুরবস্থা দর্শনে করুণাময় বিশ্বকর্ত্তার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে এবং সেই দুরবস্থা একবারে দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্পূর্ণ অভিনিবেশও হইয়াছে। যেহেতুক তিনি এতদ্দেশীয় লোকসমূহকে স্ত্রীশিক্ষানুষ্ঠান বিষয়ে ব্যয়কাতর, অনুৎসাহী, অনুদ্যোগী ও সাহসবিহীন সুতরাং তদনুষ্ঠানে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া অতি দূর দেশ হইতে একজন উদারচিত্ত মহানুভব মহাপুরুষকে ঐ সৎকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত আনিয়া দিয়াছেন। এই মহাত্মা বিদ্যাদান বিষয়ে যেমন বদান্য তেমনি উৎসাহগুণসম্পন্ন, এ দেশের অবস্থানুসারে এক্ষণে যাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত আবশ্যক ইনি যথার্থতই সেইরূপ। বোধ করি উক্ত মহাত্মার নাম সকলেই অবগত আছেন। ইতি এক্ষণে আমাদের দেশে শিক্ষাসমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ। ইহাঁর নাম অনরেবল ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন। ইনি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত সাধন করিবার নিমিত্ত গত বর্ষে এই মহানগরীতে এক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। স্বয়ং আসিয়া সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করেন। এবং সেই বিদ্যালয়ের যখন যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়াদির আবশ্যক হয়, উক্ত মহাত্মা একাকী অকাতরে তৎসমুদায় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনার কালে আমরা মনে করিয়াছিলাম, এদেশের প্রাচীন লোকেরা প্রথমতঃ

এতৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না, কারণ তাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ বদ্ধমূল কুসংস্কারের একান্ত বিধেয়। ভদ্রাভদ্র কিছুই বিবেচনা করেন না কেবল গতানুগতিক ন্যায়ে পুরাতন পদবীর অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বাল্যাবধি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, ন্যায় নীতি পদার্থ-মীমাংসা প্রভৃতি পাঠ করিয়া সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নানাবিধ ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ দ্বারা নানা দেশের আচার ব্যবহার চরিত অবগত হইয়া অন্তঃকরণের কুসংস্কার দোষ শোধন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা স্বদেশের দুর্দ্দশা বিমোচন ও মঙ্গল সম্পাদন করিবার আকাঙ্ক্ষায় কথাপ্রসঙ্গে কতপ্রকার সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্কল্পে আরূঢ় হইয়া থাকেন। তাঁহার এই অবসর পাইয়া অবশ্যই আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া এক উদ্যমেই এই মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইবেন, এবং সাধ্যানুসারে ঐ বিদেশীয় বান্ধবের সাহায্য দান করিবেন। হা! আমরা কি দারুণ ভ্রমে পতিত ছিলাম, আমাদের সেই ফলোন্মুখী আশালতা কোথায় বিলীন হইয়া গেল। সভ্যাভিমানী নবীনতন্ত্রের লোকেরা আমাদিগকে হতাশ করিয়া দিয়াছেন। কথা কহিব কি? আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি, হস্তপাদাদি সকল উদরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম সভ্যাভিমানী নব্য সম্প্রদায়িক মহাশয়েরা স্বকীয় বিদ্যার প্রভাবে দেশের সকল প্রকার দুরবস্থা দূর করিবেন। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রদেশে প্রচারিত করিবেন, বাল্যপরিণয় প্রথা সুদূরপরাহত করিয়া দিবেন। বিধবাগণের দারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখ দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন। এবং সকল দুরবস্থার নিদানভূত যে জাত্যভিমান তাহাকে আর স্থান দিবেন না। এই সমুদায় মহৎ কার্য্য যাঁহাদের কৃতিসাধ্য ভাবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, সেই নবীন সম্প্রদায়িক মহাত্মারা প্রথম সংগ্রামের উপক্রমেই অর্থাৎ বালিকাবিদ্যালয়ের প্রারম্ভেই যেরূপ দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছেন, সেই এক আঁচড়েই তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, উৎসাহ, উদ্‌যোগ দেশোপকারিতা প্রভৃতি সমুদায় গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা এক প্রকার স্থির করিয়াছি, এ দেশের মৃত্তিকায় যথার্থ উৎসাহী ও যথার্থ হিতকারী মনুষ্য জন্মিতে পারে না। অতএব এ দেশ মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা অথবা বিধবা বিবাহ প্রভৃতি যে কিছু মহৎ কার্য্য যখন ঘটিবে, তাহা বিদেশীয় লোকের অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতির হস্ত দ্বারাই সম্পাদিত হইবে, দেশের লোক কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিবেন। বরং পারেন ত সাধ্যানুসারে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ত্রুটি করিবেন না। কি লজ্জার বিষয়! কি লজ্জার বিষয়! অনরবল বীটন মহাশয় যে আমাদিগের কন্যাসন্তানগণের শিক্ষার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন ইহা একব'রও কেহ মনে ভাবিলেন না, তিনি যে কেবল আমাদিগেরি হিত করিবার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে অশেষ আয়াস পাইতেছেন ইহা একবারও আলোচনা করিলেন না, তিনি যে নিতান্ত স্বার্থশূন্য কেবল আমাদেরি কন্যাগণের নিমিত্ত প্রতি মাসে সাত আট শত টাকা ব্যয় করিয়া যথার্থ মিত্রের কার্য্য করিতেছেন ও বহুসহস্র টাকা ব্যয় করিয়া উৎকৃষ্ট বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, ইহা একবারও বিবেচনা করিলেন না, কেবল অহরহ ঐ মহানুভাবের নিন্দাবাদ, অকীর্ত্তি রচনা ও মিথ্যাকলঙ্ক জল্পনা করিয়া আপন আপন ইংরাজি বিদ্যার পরিচয় দিলেন। কি লজ্জার কথা! কি লজ্জার কথা! এ দেশীয় লোকের ইউরোপীয় বিদ্যাধ্যয়ন ও সভ্যতার উদয় কেবল অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া কলাপেই পর্য্যবসিত হইল বীটন সাহেবের সহিত এ দেশের লোকেরা যে প্রকার অসদ্ব্যবহার করিলেন, শুনিয়া বিদেশীয় ভদ্র লোকেরা কি মনে করিতেছেন, আমরা বোধ করি তাঁহারা এ দেশকে অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড বলিয়া নিরন্তর ভর্ৎসনা করিতেছেন সন্দেহ নাই।

এ প্রস্তাব সময়ে আমরা বাবু রামচন্দ্র ঘোষাল, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু, বাবু গুরুচরণ যশ, বাবু রসিকলাল সেন, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, বাবু শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার গুণকীর্ত্তন না করিয়া লেখনী সঞ্চালন স্থগিত করিতে পারি না, যেহেতু উক্ত মহাশয়েরা যথার্থ মহানুভব ও যথার্থ উদার স্বভাবের

কার্য্য করিয়া দেশের নাম রক্ষা করিয়াছেন, এবং যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় স্ত্রীশিক্ষা ব্যবহার এদেশে পুনর্ব্বার প্রচরদ্রূপ হয় তবে এই উল্লিখিত মহাত্মারাই তাহার প্রথম প্রচারক অথবা পুনরুদ্ধারক বলিয়া দেশ বিদেশে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা পুণ্য কীর্ত্তি প্রশংসার পাত্র হইয়া জগদীশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদের অদ্বিতীয় আধার হইবেন।

আমাদের বোধ হইতেছে এই প্রসঙ্গ সময়ে আর কতকগুলিন মহাত্মারা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর ধন্যবাদের আস্পদ হইতে পারেন। বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র, বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র, বাবু নবীনকৃষ্ণ মিত্র, বাবু প্যারীচাঁদ সরকার ইঁহারা কলিকাতা নগরীর বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনার প্রায় সমকালেই স্বয়ং পরিশ্রম দান ও স্বয়ং অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া আপনাদিগের নিবাসস্থান বারাশতে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যালয় স্থাপনার পরে কতকগুলি ঘোর পাষণ্ড রাক্ষস লোকেরা এই সৎকর্ম্মানুষ্ঠান অসহমান হইয়া সেই সাধুগণের উপর দারুণ উপদ্রব ও ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তথাপি সেই সাধুগণ স্বাবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত না হইয়া বরং অধিকতর প্রয়াসে অকুতোভয়ে স্বকার্য্য সাধন করিতেছেন। ইঁহাদিগের অধিক ধনসম্পত্তি নাই, রাজকীয় কোন প্রধান পদে নিয়োগ নাই, বরং ইঁহাদিগের নামও কেহ জানেন না। এমত সামান্যাবস্থাপন্ন হইয়াও ইঁহারা কেবল আপন২ পরিশ্রম ও মনের দৃঢ়তা সহকারে এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার সমাধা করিতেছেন। অতএব ইঁহাদিগের নাম ও গুণগ্রাম পাষাণনিহিত রেখার ন্যায় সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণে চিরজাগরুক থাকা অত্যাবশ্যক।